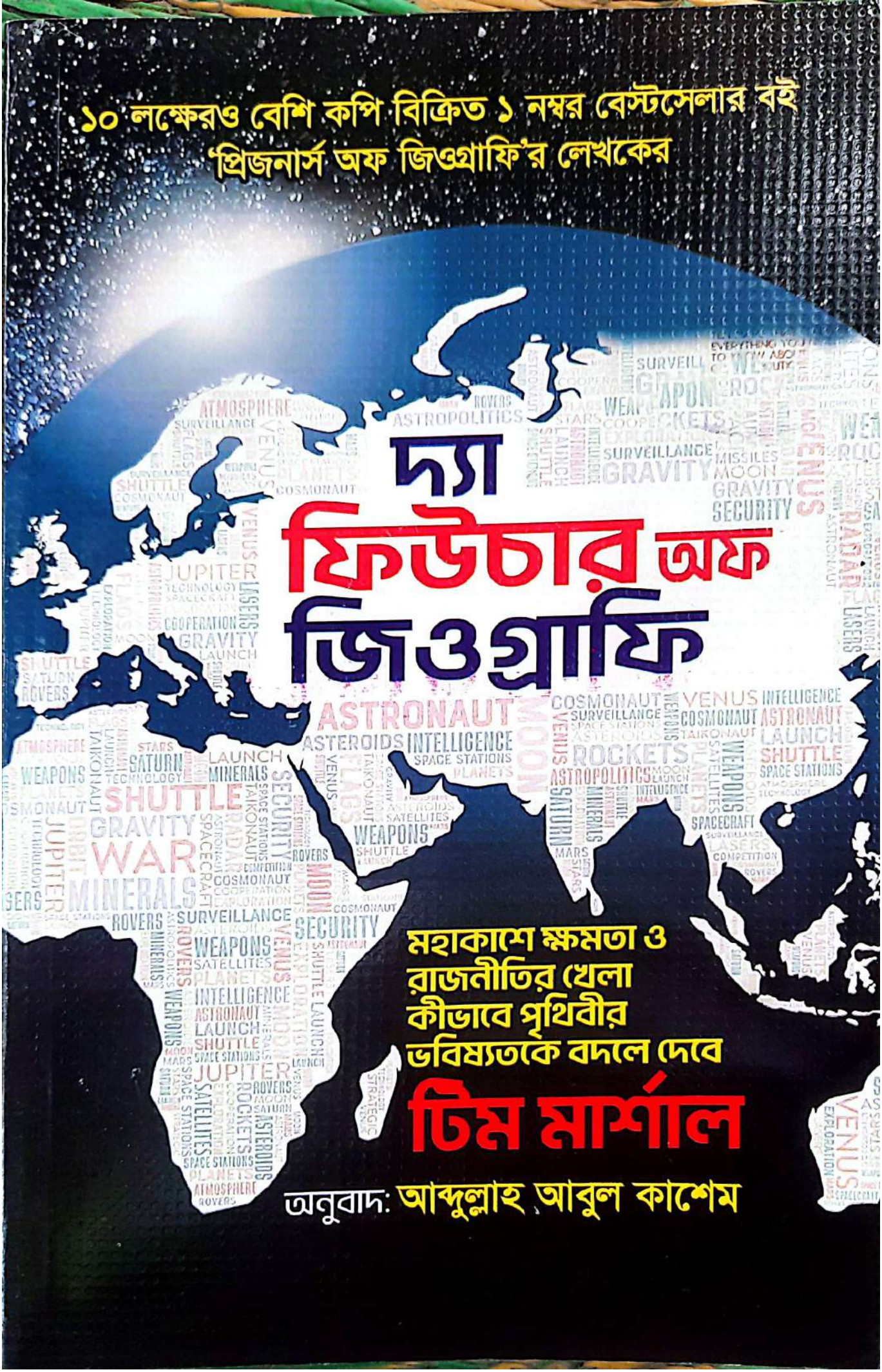
১০ লক্ষেরও বেশি কপি বিক্রিত ১ নম্বর বেস্টসেলার বই
'প্রিজনার্স অফ জিওগ্রাফি'র লেখকের



দ্যা ফিউচার অফ জিওগ্রাফি

মহাকাশে ক্ষমতা ও
রাজনীতির খেলা
কীভাবে পৃথিবীর
ভবিষ্যতকে বদলে দেবে

টিম মার্শাল

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আবুল কাশেম

দ্য ফিউচার অব জিওগ্রাফি

টিম মার্শাল

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ আবুল কাশেম

আমির বুক হাউজ

অনুবাদকের কথা

ভূগোল একসময় আমাদের শিখিয়েছিল—রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীর কোনো সীমা পর্যন্ত যেতে পারবে না। পরবর্তীতে তা বুঝিয়েছে—কোথায় তারা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। আর আজ, বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে, ভূগোল আমাদের সামনে ছুঁড়ে দিচ্ছে আরও গভীর এক প্রশ্ন—আগামী দিনে ক্ষমতার লড়াই ঠিক কোথায় কেন্দ্রীভূত হবে?

The Future of Geography বইটি সেই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার একটি মহৎ প্রয়াস। টিম মার্শাল এখানে আমাদের পরিচিত মানচিত্রের সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে যান—মহাকাশ, সাইবার জগৎ, প্রযুক্তি ও নতুন কৌশলগত ক্ষেত্রগুলোর দিকে। পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের পাশাপাশি এখানে আলোচনায় আসে স্যাটেলাইট, কক্ষপথ, ডিজিটাল অবকাঠামো ও অদৃশ্য সীমান্ত—যেগুলো আগামী দিনের বিশ্বরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই বই পড়তে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে—এটি আগের দুই বইয়ের স্বাভাবিক পরিণতি। *Prisoners of Geography* আমাদের দেখিয়েছিল রাষ্ট্রগুলো কীভাবে ভূগোলের জালে আটকে আছে, *The Power of Geography* বুঝিয়েছিল সেই ভূগোল কীভাবে শক্তির উৎসে রূপ নেয়, আর *The Future of Geography* স্পষ্ট করে দেয়—ভবিষ্যতের ক্ষমতা নতুন কোন ভৌগোলিক বাস্তবতায় গড়ে উঠতে চলেছে।

অনুবাদের সময় চেষ্টা করেছি মূল লেখকের বিশ্লেষণী ভাবধারা ও সহজ উপস্থাপন একসাথে ধরে রাখতে। বিষয়বস্তু তুলনামূলকভাবে নতুন ও জটিল—বিশেষ করে মহাকাশ ও প্রযুক্তিনির্ভর ভূ-রাজনীতির আলোচনা—তাই ভাষাকে সহজ, স্পষ্ট ও পাঠকবান্ধব রাখাই ছিল সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। যাতে পাঠক ভয় না পেয়ে ধীরে ধীরে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে পারেন।

এই বই কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা কূটনীতির শিক্ষার্থীদের জন্য নয়। যারা ভবিষ্যৎ বিশ্বব্যবস্থা, প্রযুক্তি ও ক্ষমতার সম্পর্ক, কিংবা আগামী দশকগুলোতে পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোর প্রতিযোগিতার রূপরেখা বুঝতে চান—তাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। সংবাদ শিরোনামের আড়ালে যে নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, তা বুঝতে এই বই সাহায্য করে।

অক্ষরবুনন প্রকাশনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা—বিভিন্ন মোটিভেশনাল বই ও ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো ধারাবাহিকভাবে বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় টিম মার্শালের জিওগ্রাফি সিরিজের এই বই *The Future of Geography* অনুবাদ করার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য একই সঙ্গে দায়িত্ব ও সৌভাগ্যের বিষয়।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি—যাঁর তাওফিক ও সহায়তা ছাড়া এই অনুবাদকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হতো না।

পাঠক, এই বই আপনাকে কেবল পৃথিবীর মানচিত্র নয়—আকাশের দিকেও তাকাতে শেখাবে। ভবিষ্যৎ কোথায় গড়ে উঠছে, ক্ষমতা কোন পথে সরে যাচ্ছে, আর আমরা কোন নতুন বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছি—সে বোঝাপড়ার যাত্রা শুরু হোক এই বইয়ের হাত ধরেই।

আব্দুল্লাহ আবুল কাশেম

সূচিপত্র

ভূমিকা ♣ ৯

পর্ব ১ : মহাকাশ অভিযানের সূচনা

১. আকাশের দিকে তাকানো ♣ ১৭
২. স্বর্গের পথে যাত্রা ♣ ৩৩

পর্ব ২ : বর্তমান বাস্তবতা

৩. মহাকাশ রাজনীতির যুগ ♣ ৫৯
৪. সিস্টেম বহির্ভূত শক্তিসমূহ ♣ ৭৮
৫. চীন : লং মার্চ থেকে মহাকাশ অভিযান ♣ ৯৯
৬. যুক্তরাষ্ট্র : ভবিষ্যতের পথে প্রত্যাবর্তন ♣ ১১৭
৭. রাশিয়া : পশ্চাদমুখী যাত্রা ♣ ১৩৭
৮. অন্যান্য অংশীদার রাষ্ট্র ♣ ১৫৫

পর্ব ৩ : ভবিষ্যৎ ও ইতিহাসের সংযোগ

৯. মহাকাশ যুদ্ধ ♣ ১৮৫
১০. আগামী দিনের পৃথিবী ♣ ২০৩

CamScanner

ভূমিকা

"আমার সব জায়গায় পৌঁছানো হয়নি,
কিন্তু কোথায় কোথায় যেতে চাই—তা আমার তালিকায় লেখা আছে।"

—সুসান সন্তাগ

আমরা পৃথিবীকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছি এবং উপলব্ধি করেছি যে এর পরিসর সীমিত। আজ, যখন আমাদের ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে, তখন আমরা নতুন করে উপলব্ধি করছি—আকাশে ভাসমান সেই বিশাল ও মনোমুগ্ধকর গোলকটি অর্থাৎ চাঁদ, আমাদের প্রয়োজনীয় অসংখ্য খনিজ ও উপাদানে সমৃদ্ধ।

চাঁদ কেবল একটি সম্পদের ভাণ্ডারই নয়; এটি ভবিষ্যতের মহাকাশযাত্রার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎক্ষেপণস্থল হিসেবেও কাজ করতে পারে। ঠিক যেমন আদিম মানুষ এক সময় সমুদ্র পাড়ি দিতে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাত্রা করত, তেমনি চাঁদ আমাদের পথ করে দেবে সৌরজগতের গভীরে প্রবেশ করার এবং সেখান থেকে আরও দূর মহাকাশে পৌঁছানোর।

অতএব, আমরা যে একটি নতুন স্পেস রেসে প্রবেশ করেছি, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর হাতেই যাবে লাভ ও কর্তৃত্বের অংশ। তবে আসল চ্যালেঞ্জ হলো—এই দৌড়ে যেন কোনো একক শক্তি নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিই বিজয়ী হয়, তা নিশ্চিত করা।

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মহাকাশ আমাদের জীবন ও চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এসেছে। আকাশ ও নক্ষত্র আমাদের প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছে, আমাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে রূপ দিয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মহাকাশ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন এটি ক্রমশ পৃথিবীর ভূগোলেরই এক সম্প্রসারিত রূপে পরিণত হচ্ছে। মানুষ তার প্রতিষ্ঠান,

রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইতিহাস, রাজনীতি ও সংঘাত—সবকিছুই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের মাথার অনেক ওপরে মহাকাশে। এর ফলাফল পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে পারে।

ইতোমধ্যেই মহাকাশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং সামরিক কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মহাকাশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন মহাকাশ মানবজাতির তীব্র প্রতিযোগিতার সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ময়দানে পরিণত হচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে মহাকাশ যে একটি বিশাল ভূরাজনৈতিক আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত বহুদিন ধরেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চাঁদে বিরল ধাতু ও পানির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে; ইলন মাস্কের স্পেসএক্সের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মহাকাশে পৌঁছানোর ব্যয় নাটকীয়ভাবে কমিয়ে এনেছে; আবার একই সঙ্গে পরাশক্তিগুলো পৃথিবী থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে নিজেদের উপগ্রহ ধ্বংস করার মাধ্যমে নতুন ধরনের অস্ত্রের পরীক্ষাও চালিয়েছে।

এই ঘটনাগুলোর প্রতিটিই আসলে একটি বৃহত্তর গল্পের অংশ—একটি এমন গল্প, যা ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করেছে।

এই গল্পটি ভালোভাবে বোঝার জন্য সাহায্য হবে যদি আমরা মহাকাশকে এমন একটি স্থান হিসেবে ভাবি যার নিজেরই ভূগোল আছে। এখানে রয়েছে ভ্রমণের সুবিধাজনক পথ বা "corridors," কিছু অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, সেখানে এমন জমি আছে যেখানে বসতি বা অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব এবং তবে কিছু বিপজ্জনক স্থানও আছে যেগুলো এড়িয়ে চলা জরুরি। গত কয়েক দশক ধরে এই সমস্ত ক্ষেত্র মানবজাতির সাধারণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতো—কোনো একক সার্বভৌম রাষ্ট্র এককভাবে এগুলো ব্যবহার বা অধিকার দাবি করতে পারত না।

কিন্তু সেই ধারণা– যা কিছুটা মহৎ হলেও সময়োপযোগী নয় এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন আন্তর্জাতিক নথিতে প্রতিষ্ঠিত– এখন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশই এখন সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। ইতিহাস প্রমাণ করে, যেসব সভ্যতা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, তারা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছে এবং অবশেষে অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

তবে এটা মোটেই নির্ধারিত নয় যে মহাকাশে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বই ঘটবে। সহযোগিতার বহু উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে এবং অনেক মহাকাশ-সংক্রান্ত প্রযুক্তি—যেমন চিকিৎসা, সাফ শক্তি (clean energy) ও দুর্যোগ মোকাবিলার প্রযুক্তি—সবার জন্য উপকারী হতে পারে। কিছু দেশ এমন উদ্যোগও নিয়েছে যা বৃহৎ অ্যাস্টেরয়েডকে, যা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে সক্ষম, তার পথ পরিবর্তনে সাহায্য করবে। আর এর চেয়ে সাধারণ সম্পদ কি হতে পারে! যেমনটি সায়েন্স-ফিকশন লেখক ল্যারি নিভেন বলেছেন, "ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে গেল কারণ তাদের কোনো মহাকাশ কর্মসূচি ছিল না।" সত্যিই, এমন আঘাতের শিকার হওয়া হবে সবচেয়ে ভয়ানক ও অপ্রিয় পরিস্থিতি।

আমরা আজ যেখানে পৌঁছেছি, সেখানে আসতে এক দীর্ঘ সময় লেগেছে। বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে আজকের মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সবই এক অতি ক্ষুদ্র কণায় সংকুচিত ছিল—একটি অবস্থায় যা কোনো কিছুর মধ্যেই অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত। মহাবিশ্ব সম্পর্কিত কিছু ধারণা বোঝা সত্যিই জটিল, আর এর মধ্যে 'অস্তিত্বহীনতা' (nothingness) হলো এমন একটি ধারণা যা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজও বিতর্ক করে চলেছেন। তারা কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম (quantum vacuum) ইত্যাদি তত্ত্বের দিকে তাকান, যেখানে মহাকাশের তরঙ্গ বা হেলনাগুলো কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনতে পারে। তবে যতই তত্ত্ব পড়ি, সত্যি বললে আমি এখনো সম্পূর্ণ বোঝার কাছাকাছি যেতে পারি না।

মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে—কিন্তু কী-এর মধ্যে? এর সীমার বাইরে কী আছে? আমি 'অস্তিত্বহীনতা' কল্পনা করতে পারি না। আমরা ধূসর প্রাচীর বা শূন্য কল্পনা করতে পারি, কিন্তু ধূসরও কিছু, শূন্যও কিছু। তারপর আমি হাল ছেড়ে দিই। সৌভাগ্যবশত, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং মহাবিশ্ববিদরা এই জটিল ধারণাগুলো বোঝার ক্ষেত্রে অনেক ধৈর্যশীল।

'অস্তিত্বহীনতা' থেকে সেই ক্ষুদ্র কণাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল—তবে এটি কোনো "ফ্ল্যাশ, ব্যাং, ওয়ালপ!" মুহূর্ত নয়, বরং 'ব্যাং, ওয়ালপ, ফ্ল্যাশ!' কারণ প্রথম আলো কণাগুলো বের হতে প্রায় ৩৮০,০০০ বছর লেগেছিল। এটি হলো কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, যা বিজ্ঞানীরা আধুনিক মহাকাশ টেলিস্কোপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন—প্রায় মহাবিশ্বের শুরুর দিকে পর্যন্ত। আপনি নিজেও এটি দেখতে পারেন, পুরোনো অ্যানালগ টিভির চ্যানেলে ধূসর ফাজ বা স্ট্যাটিকে।

মহাবিশ্ব প্রসারিত হয় এবং ক্রমে ঠান্ডা হয়ে আসে। মহাকর্ষের প্রভাবে গ্যাসের মেঘ জমে মণ্ডল তৈরি করে এবং এই মণ্ডলগুলো থেকে তারাগুলো জন্ম নেয়।

CamScanner

আমরা এখন জানি যে আমাদের সূর্য প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয়েছিল—মহাবিশ্বের তুলনায় এটি এখনো এক নতুন অতিথি মাত্র। সেই সময়ে নতুন নক্ষত্রটির চারপাশে গ্যাস ও ভারী ধ্বংসাবশেষের একটি বিশাল ডিস্ক ঘূর্ণায়মান হয়ে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ ও তাদের চন্দ্রকে গঠন করেছিল।

পৃথিবী হলো সূর্যের তৃতীয় গ্রহ। এটি বসবাসের জন্য আদর্শ একটি স্থান। আসলে আপাতত এটি একমাত্র আদর্শ স্থান, কারণ অন্য কোনো স্থানে থাকলে আমরা জন্মই পেতাম না। বিগ ব্যাং থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তা আমাদের চারপাশের ভূগোলকে রূপ দিয়েছে এবং আমাদেরকে সেই অবস্থায় নিয়ে এসেছে যেখানে আমরা আছি। পৃথিবী হলো গ্রহগুলোর 'গোল্ডিলক্স'—না খুব গরম, না খুব ঠান্ডা—যা জীবনযাত্রার জন্য নিখুঁত। শাব্দিকভাবে বললে পৃথিবীর অবস্থান, আকার এবং বায়ুমণ্ডলের সমন্বয় আমাদের নিরাপদ রাখে। এর আকার এমন যে, মহাকর্ষ বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে যথেষ্ট শক্তিশালী। অন্য কোনো স্থানে যেতাম, তবে হয় গরমে পোড়তাম, ঠান্ডায় জমে যেতাম বা অক্সিজেনের অভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না।

মহৎ আমেরিকান মহাবিশ্ববিদ কার্ল সাগান তার বই *Billions and Billions*-এ লিখেছেন, "অনেক মহাকাশচারী রিপোর্ট করেছেন যে দিনের আলোতে থাকা অর্ধগোলকের দিগন্তে তারা সূক্ষ্ম, পাতলা নীল আভা দেখেছেন—যা পুরো বায়ুমণ্ডলের পুরুত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে—এবং সঙ্গে সঙ্গে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, এর ভঙ্গুরতা ও ঝুঁকির কথা ভাবতে শুরু করেছেন। তারা উদ্বিগ্ন হয়েছেন। উদ্বিগ্ন হওয়ারই কারণ আছে।"

আমরা ভাবতে পারি যে, আমাদের উচিত পৃথিবীর এই মূল্যবান উপাদান ও পরিবেশের যত্ন আরও ভালোভাবে নেওয়া।

কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সবসময়ই ভ্রমণপ্রিয়, আর গত শতকে আমরা আমাদের গ্রহ থেকে অনেক দূরে ভ্রমণ শুরু করেছি। মহাকাশ হলো একটি বিশাল ক্যানভাস, যেখানে আমরা কেবল একটি ছোটো কোণেই আমাদের উপস্থিতির খসড়া আঁকতে পেরেছি। বাকিটা এখনো আমাদের হাতে রয়েছে, যা আমরা ধাপে ধাপে বিস্তারিতভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আঁকতে পারি। যদি আমরা মহাকাশযুগের পরবর্তী ধাপে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলকভাবে এগোতে চাই, তাহলে আমাদের মহাকাশকে তার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে বোঝা প্রয়োজন এবং উপলব্ধি করতে হবে এটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কী অর্থ বহন করে।

এই অধ্যায়গুলোতে আমরা সময়ের ধারায় ফিরে দেখব কীভাবে মহাকাশ আমাদের সংস্কৃতি ও ধারণাগুলোকে প্রভাবিত করেছে—প্রাথমিক সমাজব্যবস্থা— যেখানে ধর্মের

CamScanner

ওপর বড়ো মাত্রায় ভিত্তি করা ছিল– থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব পর্যন্ত। এরপর, শীতল যুদ্ধ মহাকাশ প্রতিযোগিতাকে ত্বরান্বিত করেছিল, যা মানুষের প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনে বিশাল উল্লম্ফ সৃষ্টি করেছিল এবং অবশেষে আমাদেরকে পৃথিবীর সীমাবদ্ধতা ভেঙে বাইরে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। একবার বাইরে পৌঁছে, আমরা সুযোগ, সম্পদ এবং কৌশলগত স্থান দেখতে শুরু করি, যা নিয়ে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব।

আমরা এখন অ্যাস্ট্রোপলিটিক্সের যুগে প্রবেশ করেছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো সর্বজনস্বীকৃত নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি; মহাকাশে মানব কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আইন না থাকায়, বিরোধের মঞ্চ তৈরি হয়ে যাচ্ছে—যার ব্যাপ্তি হতে পারে মহাজাগতিক।

আধুনিক যুগে, আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন এমন তিনটি প্রধান খেলোয়াড় : চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া। এরা স্বাধীন মহাকাশ অভিযানকারী দেশ এবং এদের পদক্ষেপ পৃথিবীর সকলের ওপর প্রভাব ফেলবে। প্রতিটি দেশের সেনাবাহিনীর একটি "স্পেস ফোর্স" রয়েছে, যা তাদের স্থল, জল এবং বায়ু বাহিনীর জন্য যুদ্ধ ক্ষমতা প্রদান করে। এছাড়া সব দেশই এই ক্ষমতাগুলো প্রদানের জন্য ব্যবহৃত স্যাটেলাইটগুলোকে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই শক্তিশালী করছে।

বাকি দেশগুলো জানে যে তারা এই বড়ো তিনটির সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করতে পারবে না, তবে তারা এখনো মহাকাশে তাদের অবস্থান এবং অংশগ্রহণের বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারে। তারা তাদের বিকল্পগুলো মূল্যায়ন করছে এবং প্রয়োজনে 'মহাকাশ ব্লক' আকারে জোটবদ্ধ হচ্ছে। যদি আমরা একযোগে, একটি একক গ্রহ হিসেবে এগোবার পথ খুঁজে না পাই, তবে অপরিহার্য ফলাফল হবে—মহাকাশের নতুন মঞ্চে প্রতিযোগিতা এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষ।

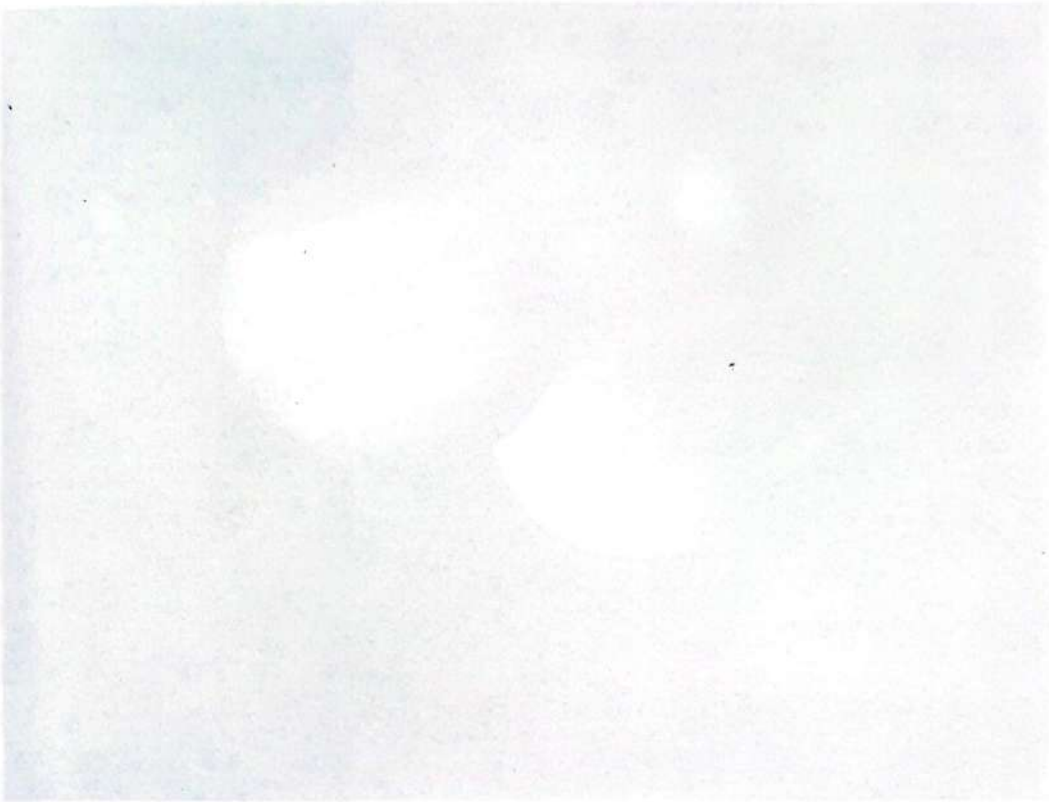
শেষে, আমরা দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাব, এটা দেখতে যে চন্দ্র, মঙ্গল এবং তার পরবর্তী স্থানগুলোতে মহাকাশ আমাদের জন্য কী সম্ভাবনা রাখে।

চাঁদ সাগরকে টানে, আর মানুষকে তার পৃষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট করে। নেকড়েরা রাতের আকাশে ঝুলন্ত রূপালী ডিস্কের দিকে মুখ তুলে হুল্লোড় করে। মানুষও চোখ তুলে আরও দূরের দিকে, অসীমের দিকে তাকায়। আমরা সবসময়ই তাই করেছি এবং আজও আমরা সেই পথে এগিয়ে চলছি।

CamScanner

পর্ব ১ : মহাকাশ অভিযানের সূচনা

- আকাশের দিকে তাকানো
- স্বর্গের পথে যাত্রা

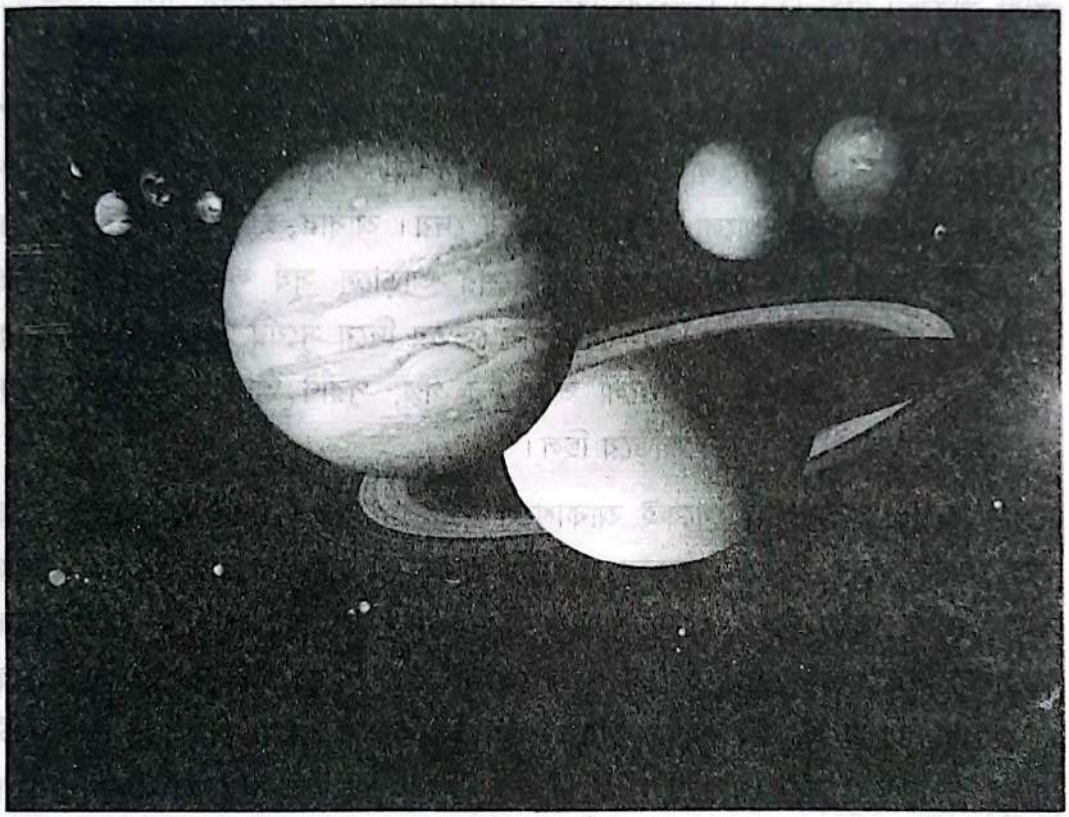


অধ্যায়-১

আকাশের দিকে তাকানো (LOOKING UP)

'আমাদের মনোযোগ কেবল পার্থিব বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হলো মানুষের চেতনার সীমানাকে সংকুচিত করা।'

— স্টিফেন হকিং



আমাদের সৌরজগত

তারাদের মিটমিটে আলো অসংখ্য গল্প শোনায়। মহাকাশে পা রাখার স্বপ্ন দেখারও বহু আগে, কৃত্রিম আলো আমাদের দৃষ্টিকে ম্লান করার আগেই, আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতাম—কেন কিছু আছে, শূন্যতার বদলে? মানব সভ্যতার বহু সাধনা ও প্রচেষ্টা জন্ম নিয়েছে তারকারাজি ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে।

সৃষ্টি, দেবতা এবং নক্ষত্রমণ্ডল সম্পর্কে প্রথম রেকর্ড করা বিশ্বাসগুলো নিশ্চয়ই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৌখিক গল্প বলার ঐতিহ্য থেকে এসেছে। প্রাচীন সব সভ্যতাই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে—কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তারা কারা, তাদের ভূমিকা কী এবং তাদের কেমন আচরণ করা উচিত। যদি দেবতা থেকে থাকে—আর যা দেখা যেত, তার ব্যাখ্যা এছাড়া আর কিই বা হতে পারে—তবে এটা বিশ্বাস করা যৌক্তিক ছিল যে তাদের কেউ কেউ উপরে স্বর্গে বাস করেন।

মানুষ যখন কোনো কিছুর দিকে তাকায়, তখন তাতে নানা রকম প্যাটার্ন বা নকশা খুঁজে পেতে ভালোবাসে—এটা মানুষের সহজাত প্রবণতা। আকাশের অসংখ্য আলোকবিন্দু, অর্থাৎ তারাগুলোকে মানুষ কল্পনায় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে এমন সব ছবি তৈরি করেছে, যেগুলো তারা পৃথিবীতে দেখে অভ্যস্ত এবং যেগুলো তাদের নিজ নিজ লোকগাঁথা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল খায়। যারা উষ্ণ অঞ্চলে বাস করত, তারা আকাশে বিছা কিংবা সিংহের মতো অবয়ব কল্পনা করত; আর যারা শীতপ্রধান এলাকায় থাকত, তারা সেখানে মুস বা হরিণজাতীয় প্রাণীর আকৃতি দেখতে পেত।

ফিনল্যান্ডে নর্দার্ন লাইটস বা মেরুপ্রভা পরিচিত 'ফক্স ফায়ার' বা 'শেয়ালের আগুন' নামে। একটি প্রাচীন উপকথা অনুযায়ী, এক জাদুকরী শেয়াল তার লেজ দিয়ে বরফ ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে সেই আলো আকাশে ছড়িয়ে দেয়। আবার আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে এমন লোককথা আছে যে, রাতের আকাশের আড়ালে সূর্য লুকিয়ে থাকে, আর তারাগুলো আসলে আকাশের ছিদ্র—যেগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো সামান্য করে বেরিয়ে আসে। এভাবেই তারাগুলো আমাদের গল্প, পুরাণ আর লোককথার সঙ্গে গভীরভাবে ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল।

মানুষ যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আকাশকে বিশ্লেষণ করার এবং তা বোঝার চেষ্টা করে আসছে, তার সম্ভাব্য সবচেয়ে পুরোনো প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে, শেষ বরফ যুগের শেষ প্রান্তে। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে ইতিহাসবিদ আলেকজান্ডার মার্শাক পশুর হাড়ের ওপর খোদাই করা বিভিন্ন চিহ্নকে চন্দ্র ক্যালেন্ডার বা চাঁদের পঞ্জিকা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। ওই হাড়গুলোর গায়ে আঠাশ ও উনত্রিশটি বিন্দুর ধারাবাহিক ক্রম দেখা যায়, যা চাঁদের মাসিক পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। লেট প্যালিওলিথিক বা শেষ প্রত্নপ্রস্তর যুগের নারী ও পুরুষরা আসলে ঠিক কতটা জ্ঞান রাখতেন, তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে এখনো বিতর্ক রয়েছে; তবে তারা যে তারকা ও আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন, তার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই আদিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শিকারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ যাত্রা কিংবা অভিবাসনের সময়—সম্ভবত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে—এই বহনযোগ্য

ক্যালেন্ডারগুলো ব্যবহার করতেন। সময় মাপার একটি পদ্ধতি তৈরি করা তাদের জন্য স্বাভাবিকভাবেই জরুরি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কখন মশার মৌসুম শুরু হবে, কিংবা কখন কোনো নির্দিষ্ট গাছের ফল পেকে যাবে—এসব জানার প্রয়োজন তাদের ছিল।

প্রায় ১২,০০০ বছর আগে শিকারী-সংগ্রাহক মানুষ যখন ধীরে ধীরে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল, তখন আকাশ পর্যবেক্ষণ আরও বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। প্রথম দিকের কৃষক ও পশুপালকদের জানতে হতো ঠিক কখন বীজ বুনতে হবে এবং ফসল কাটার সময় আর কতটা বাকি আছে। ইউরোপে আবিষ্কৃত ১০,০০০ বছরেরও বেশি পুরোনো কিছু নিওলিথিক গুহাচিত্রে নক্ষত্রমণ্ডলের চিত্র আঁকা আছে বলে ধারণা করা হয়। এখানেও এসব ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে প্রাণীর কিছু চিত্রের ভেতর নক্ষত্রমণ্ডলের বিন্যাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যারা নিয়মিত পরিষ্কার রাতে আকাশের দিকে তাকাতেন, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন যে আলোকবিন্দুগুলো—অর্থাৎ তারাগুলো—বিভিন্ন সময়ে আকাশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে দেখা দেয়, যদিও তখনো তারা হয়তো বুঝে উঠতে পারেননি যে ৩৬৫টি দিন ও রাতের ধারাবাহিকতাই এক বছরের সময়চক্র গঠন করে।

সে সময় গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধি সঠিকভাবে পরিমাপ করার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে আমরা তখনো অনেক দূরে ছিলাম। এমনকি যখন পাথরের বৃত্ত—স্টোন সার্কেল—নির্মাণের সূচনা হয়, তখনো সেগুলোর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রমাণ খুব একটা স্পষ্ট নয়।

এ পর্যন্ত জানা সবচেয়ে প্রাচীন পাথরের বৃত্তটি হলো বর্তমান মিশরের নুবতা প্লায়া (Nabta Playa)। একে মাঝে মাঝে 'সাহারার স্টোনহেঞ্জ' বলা হয়, যদিও এই তুলনাটি পুরোপুরি ন্যায্য নয়। কারণ এটি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত স্টোনহেঞ্জের তুলনায় প্রায় ২,০০০ বছর পুরোনো—অর্থাৎ আনুমানিক ৭,০০০ বছর আগে নির্মিত। স্থানটি ১৯৭০-এর দশকে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৯০-এর দশকে সম্পূর্ণভাবে খনন করা হয়। ধারণা করা হয়, আধা-যাযাবর পশুপালকরা এটি নির্মাণ করেছিল, যাতে তারা বুঝতে পারে কখন তাদের বসতি পরিবর্তনের সময় এসেছে। কিছু প্রমাণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই পাথরগুলো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নক্ষত্রের সঙ্গে—বিশেষ করে রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সিরিয়াসের সঙ্গে—সারিবদ্ধ ছিল। তবে তারা নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব পরিমাপ করতে পারত—এমন দাবির পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ধারণা মূলত কল্পনাপ্রসূত।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের স্টোনহেঞ্জ এবং অন্যান্য বহু পাথরের বৃত্তের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। স্টোনহেঞ্জের নির্মাণ শুরু হয়েছিল আনুমানিক ৫,০০০ বছর

আগে, এমন এক সময়ে যখন ওই অঞ্চলে কৃষিকাজ প্রায় ১,০০০ বছর ধরে মানুষের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে উঠেছিল। এটি মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, স্টোনহেঞ্জ শীত ও গ্রীষ্মকালীন অয়নান্তের সময় সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে সরলরেখায় সজ্জিত। তবে এর বাইরে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক অনেকটাই অনুমাননির্ভর। স্মৃতিস্তম্ভটির প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি বসতি থেকে প্রায় ৩৮,০০০টি 'বাতিল' পশুর হাড় পাওয়া গেছে, যা থেকে ধারণা করা হয় সেখানে বিশাল ভোজানুষ্ঠান আয়োজন করা হতো। তবে যারা ড্রুডদের এসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করতে চান, তাদের জন্য দুঃসংবাদ হলো—ব্রিটেনে ড্রুডদের আবির্ভাব ঘটেছিল এর প্রায় ২,০০০ বছর পরে। আজ যারা সাদা পোশাক পরে লাঠি হাতে স্টোনহেঞ্জে সমবেত হন, তাদের কাছে এই তথ্য কিছুটা হতাশাজনক হতে পারে।

প্রায় ৪,০০০ বছর আগে ফিরে তাকালে আমরা প্রথমবারের মতো লিখিত প্রমাণ পাই, যেখানে দেখা যায় মানুষ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিল এবং মহাজাগতিক গতিবিধি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে পূর্বাভাস দিতে পারছিল। এই অগ্রগতির পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল লিখন পদ্ধতি ও গণিতের বিকাশ।

খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৮০০ সালের দিকে ব্যাবিলনীয়রা তাদের পূর্বসূরি সুমেরীয়দের কাছ থেকে শেখা জ্ঞানের ভিত্তিতে নক্ষত্রমণ্ডলীর বিন্যাস অনুসারে রাশিচক্রের চিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করে। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করত যে দেবতারা আকাশের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ বা অন্যান্য ভবিষ্যৎ ঘটনার সতর্কবার্তা পাঠান। ব্যাবিলনীয় পুরোহিতরা কাদামাটির ফলকে মহাজাগতিক গতিবিধি নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করতেন এবং বারোটি চন্দ্র মাস নিয়ে গঠিত একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। শুরুতে এটি তুলনামূলক সহজ কাজ ছিল। তবে কয়েক প্রজন্ম ধরে তথ্য সংরক্ষণ এবং গণিতের উন্নতির ফলে তারা বুঝতে পারেন যে গ্রহগুলো প্রতি বছর একই পথে চলে না। তবু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি পুনরাবৃত্ত প্যাটার্ন বা ছক লক্ষ্য করা যায়, যা ব্যবহার করে ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট তারিখে কোনো গ্রহ আকাশের কোথায় থাকবে তা অনুমান করা সম্ভব হয়।

সময়কে সাত দিনের সপ্তাহে ভাগ করার ধারণাটিও ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকেই এসেছে। তারা আকাশে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ 'মহাজাগতিক বস্তু' লক্ষ্য করেছিল এবং বিশ্বাস করত প্রতিটি বস্তু একটি করে দিনের তত্ত্বাবধান করে। তাই তারা আঠাশ দিনের চন্দ্রচক্রকে চার ভাগে ভাগ করে নেয়। একই সময়ে মিশরীয়রা দশ দিনের সময়বিভাগ ব্যবহার করত—যদি সেটিই টিকে থাকত, তবে আজ আমাদের কর্মসপ্তাহ হতো অনেক বেশি দীর্ঘ। আর দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটির ধারণা? ব্যাবিলনীয়রা

বিশ্রামের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করেছিল, তবে সপ্তম দিনে বিশ্রামের ধর্মীয় ধারণার জন্য আমরা হিব্রু জনগোষ্ঠীর কাছেও ঋণী। পরে আরও অনেক সময় পর, শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলো আমাদের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি ছুটির দিন আদায় করে নেয়।

অ্যাসিরীয়, মিশরীয় এবং অন্যান্য সভ্যতাও জ্যোতির্বিদ্যায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছিল, কিন্তু তখনো মানবজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে মহাজাগতিক ঘটনাগুলো দেবতাদের ইচ্ছাতেই ঘটে। সে সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) ও জ্যোতিষশাস্ত্র (Astrology) একে অপরের থেকে আলাদা ছিল না। প্রাচীন গ্রিকরাও একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কসমোলজি বা বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে গ্রিকরা এমন প্রভাব রেখে গেছে, যা খুব কম সভ্যতাই পেরেছে। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে তারা পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের চিন্তার ধরনই পালটে দিয়েছিল।

গ্রিকরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্যাবিলনীয়দের জ্ঞান থেকে শিখে এসেছে। পিথাগোরাস ছিলেন তাদেরই একজন, যিনি এই জ্ঞান থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হন। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ সালের দিকে তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রভাত তারা ও সন্ধ্যা তারা নামে পরিচিত বস্তু দুটি আসলে ভিন্ন নয়—এটি একই গ্রহ, ভেনাস বা শুক্র। তিনি এবং তাঁর সমসাময়িকরা জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির ব্যবহার করে মহাজাগতিক নানা প্রশ্নের সমাধানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন।

এই ধারাবাহিকতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন হিপার্কাস। তাঁকেই সাধারণত অ্যাস্ট্রোল্যাব (astrolabe) বা 'স্টার টেকার'-এর উদ্ভাবক হিসেবে ধরা হয়। অ্যাস্ট্রোল্যাবকে বলা যায় প্রাচীন যুগের এক ধরনের 'স্মার্টফোন'—আজকের বহু ভোক্তা প্রযুক্তির মতোই বহুমুখী, তবে এতে নির্দিষ্ট সময় পর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই যন্ত্র প্রায় ২,০০০ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সাহায্যে জানা যেত আপনি পৃথিবীর কোথায় অবস্থান করছেন, তখন সময় কত, কখন সূর্য অস্ত যাবে, এমনকি এটি দিয়ে জ্যোতিষগত কোষ্ঠীও নির্ণয় করা হতো। অ্যাস্ট্রোল্যাব কাজ করত একাধিক স্লাইডিং প্লেটের মাধ্যমে, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অক্ষাংশের রেখা ও নির্দিষ্ট নক্ষত্রের অবস্থান চিহ্নিত থাকত। হেলেনিক গ্রিক অঞ্চল থেকে এটি আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছে। মুসলমানরা মক্কার দিক নির্ণয়ে এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন, আর কলম্বাস আমেরিকার দিকে যাত্রার সময় এটি সঙ্গে রেখেছিলেন।

অ্যারিস্টটল খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৩৫০ সালে রচিত তাঁর *অন দ্য হেভেনস* গ্রন্থে পৃথিবীকে গোল বলে বর্ণনা করার বহু প্রজন্ম আগেই গ্রিকদের মধ্যে পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত ছিল। অ্যারিস্টটল যুক্তি দেন, চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের ওপর যে ছায়া পড়ে, তা সবসময়ই গোলাকার। পৃথিবী যদি সমতল চাকতির মতো হতো, তবে সূর্যের আলো পাশ থেকে পড়ার কোনো এক পর্যায়ে সেই ছায়া রেখার মতো দেখাত। যেহেতু বাস্তবে এমনটি দেখা যায় না, তাই এই পর্যবেক্ষণ পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে।

অ্যারিস্টটল আরও উল্লেখ করেন যে তৎকালীন গণিতবিদরা 'স্টেড' (stades—যেখান থেকে 'স্টেডিয়াম' শব্দটির উৎপত্তি) এককে দূরত্ব পরিমাপ করতেন এবং তাঁদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি ছিল প্রায় ৪০০,০০০ স্টেড, অর্থাৎ আনুমানিক ৭২,০০০ কিলোমিটার। যদিও এই হিসাবে প্রায় ৩২,০০০ কিলোমিটারের ভুল ছিল, তবু চিন্তাগত দিক থেকে এটি ছিল এক বিশাল অগ্রগতি।

প্রায় একশো বছর পরে সাইরেনের এরাতোস্থেনিস পৃথিবীর পরিধি নির্ভুলভাবে নির্ণয়ের একটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি জানতেন, মিশরের সাইরেন (বর্তমান আসওয়ান) নামক স্থানে একটি কূপ রয়েছে, যেখানে প্রতি বছর গ্রীষ্মকালীন অয়নান্তের দিনে সূর্য ঠিক কূপের তলায় আলো ফেলে, কোনো ছায়া সৃষ্টি না করে। অর্থাৎ, সে সময় সূর্য থাকে একেবারে মাথার ওপর। একই দিনে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি হিসাব করেন যে দুই শহরের মধ্যে সূর্যের উচ্চতার পার্থক্য পৃথিবীর বক্রতার বরাবর প্রায় ৭.২ ডিগ্রি কোণের সমান—যা একটি পূর্ণ বৃত্তের প্রায় পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। এরপর তাঁর দরকার ছিল আলেকজান্দ্রিয়া ও সাইরেনের মধ্যকার দূরত্ব জানা। পেশাদার জরিপকারীদের সহায়তায় তিনি জানতে পারেন এই দূরত্ব প্রায় ৫,০০০ স্টেড। এসব তথ্য মিলিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, পৃথিবীর পরিধি আনুমানিক ৪০,২৫০ থেকে ৪৫,৯০০ কিলোমিটারের মধ্যে। আধুনিক হিসেবে পৃথিবীর প্রকৃত পরিধি প্রায় ৪০,০৯৬ কিলোমিটার—অর্থাৎ এরাতোস্থেনিসের হিসাব আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক ছিল।

মূলত গ্রিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল—মহাবিশ্বে একটি অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা বা নিয়ম রয়েছে এবং তা পর্যবেক্ষণ ও গণিতের মাধ্যমে আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এখান থেকেই জন্ম নেয় সেই চিন্তাধারা, যেখানে পৃথিবী ও প্রকৃতিকে 'দেবতা'র হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়। গ্রিকরা চাঁদের পরিধি, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব এবং চাঁদ থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিল। যদিও তারা ধারাবাহিকভাবে এসব দূরত্বকে বাস্তবের তুলনায় অনেক কম ধরে

নিয়েছিল, তবু গ্রহের গতিবিধি বোঝার জন্য তারা তাত্ত্বিক মডেল তৈরি করেছিল। তবে এসব মডেলের সবকটিতেই গ্রহগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে—এই বিশ্বাসটি রেনেসাঁ যুগ পর্যন্ত টিকে ছিল।

এই দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ক্লডিয়াস টলেমির (আনুমানিক ১০০–১৭০ খ্রিষ্টাব্দ) কাজে। তিনি ধ্রুপদী জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানকে সংকলিত ও সংক্ষেপ করেন এবং প্রাচীন নক্ষত্র-চিত্রগুলোকে ৪৮টি নক্ষত্রমণ্ডলে ভাগ করেন (বর্তমানে এই সংখ্যা ৮৮)। তিনি এগুলোর এমন নামকরণ করেন, যা আজও বহু ভাষায় ব্যবহৃত হয়—অ্যাকোয়ারিয়াস, পেগাসাস, টরাস, হারকিউলিস, ক্যাপ্রিকর্ন ইত্যাদি সবই তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। টলেমি তাঁর বইটির নাম দিয়েছিলেন *দ্য ম্যাথমেটিকাল কালেকশন*, তবে ইসলামি রেনেসাঁর সময় এটি তার আরবি নাম *আলমাজেস্ট* (Almagest) হিসেবেই বিশ্বজুড়ে পরিচিত হয়ে ওঠে। তবুও টলেমি তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই ভূকেন্দ্রিক ধারণা থেকে সরে আসতে পারেননি—তাঁর মতে পৃথিবীই মহাবিশ্বের কেন্দ্র, আর গ্রহগুলো তাকে প্রদক্ষিণ করে।

এই মডেলটি তৎকালীন তথ্য ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং প্রায় ১,৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রভাব বজায় রেখেছিল। তবে এই প্রচলিত ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমও ছিল। সামোসের অ্যারিস্টার্কাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০–২৩০) যুক্তি দিয়েছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে—এটি ছিল সূর্যকেন্দ্রিক বা হেলিওসেন্ট্রিক মহাবিশ্বের ধারণা। যদিও তাঁর এই মতকে সে সময়ের অধিকাংশ চিন্তাবিদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অ্যারিস্টার্কাস ও তাঁর সমসাময়িকরা চাঁদের দূরত্ব তুলনামূলকভাবে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তবে তারা সূর্যকে চাঁদের তুলনায় মাত্র বিশ গুণ দূরে ধরে নিয়েছিলেন—যা ছিল বাস্তবের তুলনায় বড়ো ধরনের অবমূল্যায়ন। তবুও সেটিও ছিল এক বিশাল দূরত্বের ধারণা। গ্রিক চিন্তাবিদরা সাধারণত সতর্কতার দিকেই ঝুঁকতেন। কিছু সমীকরণ মেনে নেওয়ার অর্থ হতো এমন এক বিপুল আয়তনের মহাবিশ্বকে স্বীকার করা, যার জন্য প্রয়োজনীয় কল্পনাশক্তি তখনো তাদের কাছে ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য ছাড়া আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টারাই প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে নির্মিত সবচেয়ে দ্রুতগামী মহাকাশযান দিয়েও সেখানে পৌঁছাতে প্রায় ১৮,০০০ বছর লাগবে। একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা এসব দূরত্ব কল্পনা করতে হিমশিম খাই। এই প্রেক্ষাপটে, গ্রিকরা যে সীমিত তথ্য ও উপকরণ ব্যবহার করে যা অর্জন করেছিল, তা মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক সাফল্য।

CamScanner

গ্রিক শক্তির পতনের পর রোমানদের সামনে জ্যোতির্বিজ্ঞান এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু তারা গণিতকে গ্রিকদের মতো আবেগ ও গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেনি। গ্রিকরা জ্যোতিষশাস্ত্রে আগ্রহী ছিল, কিন্তু রোমানরা প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল এই বিষয়ে—বিশেষ করে খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ সালে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রশ্ন তাদের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; বরং মঙ্গলের সঙ্গে শুক্রের অবস্থান কেমন—তা জানাই ছিল বেশি জরুরি, কারণ সম্রাটের ভাগ্য নাকি এর ওপর নির্ভর করত! পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন (পঞ্চম শতাব্দী) পর্যন্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। পরিহাসের বিষয় হলো, এই শাস্ত্র দিয়েই তারা নিজেদের পতন আগেভাগে দেখতে পায়নি।

এই সময়েই চীনে জ্যোতির্বিদ্যার দক্ষতা ক্রমশ বাড়ছিল এবং সময়কে ব্যবহারিক প্রয়োজনে ভাগ করার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছিল। গণিতবিদ জু চংঝি (৪২৯–৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) 'ক্যালেন্ডার অফ গ্রেট ব্রাইটনেস' বা 'মহান উজ্জ্বলতার পঞ্জিকা' প্রণয়ন করেন। এটি ৩৯১ বছরের একটি চক্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে বছরে ৩৬৫ দিন ধরা হয় এবং প্রতি ১৪৪ বছরে একটি অতিরিক্ত মাস যোগ করা হয়। জু স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন যে তাঁর এই ফলাফলগুলো 'আত্মা বা ভূতের কাছ থেকে নয়, বরং সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও নির্ভুল গাণিতিক হিসাব থেকে' পাওয়া।

জু চংঝির এই পদ্ধতির পেছনেও ছিল সেই একই মৌলিক নীতি, যা গ্রিক চিন্তাবিদদের চালিত করেছিল—অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে তখনো চিন্তাধারার ওপর 'দেবতা' ও 'ভূত'-এর প্রভাবই প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। মানুষের উপলব্ধিতে সত্যিকারের এক বড়ো বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যে প্রতিভার এক বিস্ফোরণ।

অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত, বর্তমান মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলো থেকে শুরু করে পর্তুগাল ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চলে ইসলামি সংস্কৃতি প্রথমে গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্ত করে এবং পরে 'ইসলামি শিক্ষার স্বর্ণযুগ' নামে পরিচিত সময়ে সেই জ্ঞানকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শেষ দিকে, আনুমানিক ৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে আল-বাত্তানি বছরের দৈর্ঘ্য পূর্ববর্তী হিসাবের তুলনায় মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রস্তাব করেন যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব স্থির নয়, বরং পরিবর্তিত হয়। এর ফলে এমন ধারণার জন্ম হয় যে গ্রহগুলো সম্ভবত নিখুঁত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে না। কিছু পণ্ডিত তখন এই বিশ্বাস নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন যে পৃথিবী সম্পূর্ণ স্থির; ধীরে ধীরে এটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে যে পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর

CamScanner

ঘোরে। নাসির আল-তুসির মতো অসাধারণ মেধাবী চিন্তাবিদ টলেমাইক পদ্ধতির সেই অংশগুলোর বিরোধিতা করেন, যেগুলো সুষম বৃত্তাকার গতির নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তবে এত কিছুর পরও তখনো কেউ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে—এই সূর্যকেন্দ্রিক মডেল গ্রহণ করার সাহস দেখাননি।

ইসলামি বিশ্বের এই 'স্বর্ণযুগ' যখন জ্ঞান ও অনুসন্ধানের আলোয় উজ্জ্বল, তখন ইউরোপ অবস্থান করছিল এমন এক সময়কালে, যাকে একসময় 'অন্ধকার যুগ' (Dark Ages) বলা হতো। আধুনিক ইতিহাসবিদরা অবশ্য এই শব্দটি এড়িয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ও কম অবমাননাকর 'আর্লি মিডল এজ' বা 'প্রারম্ভিক মধ্যযুগ' শব্দটি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এই সময়কালটি মোটামুটি পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত—রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে ইউরোপে নগরজীবনের পুনরুত্থানের সূচনা পর্যন্ত। এটি ছিল এমন এক যুগ, যেখানে সমাজ ও মহাবিশ্ব উভয় ক্ষেত্রেই একটি কঠোর শ্রেণিবিন্যাস কল্পনা করা হতো। মহাবিশ্বের কেন্দ্রে ছিল পৃথিবী, আর সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু তাকে প্রদক্ষিণ করত। তার ওপরে অবস্থান করতেন 'ঈশ্বর'; পৃথিবীতে ছিলেন রাজা, বিশপ, ব্যারন ও ভূমিদাসরা—এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থান ও ভাগ্য মেনে নেওয়ার কথা ছিল। যেহেতু ভূমিদাসদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানত না, তাই তারা এই ব্যবস্থার সঙ্গে আদৌ একমত ছিল কি না, তা জানা আজও সহজ নয়।

'অন্ধকার যুগ' শব্দটির প্রচলন ঘটে ইতালীয় পণ্ডিত পেত্রার্ক (১৩০৪–১৩৭৪)-এর লেখার মাধ্যমে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, গ্রিক ও রোমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের তুলনায় ইউরোপ তাঁর সময়কালে এক ধরনের অন্ধকারে বাস করছে। তাঁর মহাকাব্য *আফ্রিকা*-তে তিনি লিখেছিলেন, "এই বিস্মৃতির ঘুম চিরকাল স্থায়ী হবে না। যখন অন্ধকার কেটে যাবে, তখন আমাদের বংশধররা আবার সেই পূর্বের বিশুদ্ধ আলোর কাছে ফিরে যেতে পারবে।" পেত্রার্ক রেনেসাঁর এক সন্ধিক্ষণে বসবাস করতেন—একটি সময়, যাকে তিনি হয়তো সেই 'বিশুদ্ধ আলো' হিসেবেই কল্পনা করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাবিশ্বে মানবজাতির অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রে এই যুগটি নিঃসন্দেহে তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে ওঠে।

প্রারম্ভিক মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের হাতে জ্যোতির্বিদ্যার কোনো বড়ো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সহজে পাওয়া যেত না। দ্বাদশ শতাব্দীতে জেরার্ড অফ ক্রেমোনা (১১১৪–১১৮৭) এবং তাঁর মতো আরও কয়েকজন পণ্ডিতের কাজের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তাঁরা আরবি ভাষা থেকে ইউরোপীয় ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। জেরার্ড বিশেষভাবে টলেডো শহরে যান আরবি শেখার উদ্দেশ্যে,

যাতে তিনি টলেমির *আলমাজেস্ট* গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন—কারণ এর মূল গ্রিক সংস্করণটি তখন বহুদিন ধরেই হারিয়ে গিয়েছিল। এই অনুবাদ ছিল টলেডোর 'স্কুল অফ ট্রান্সলেটরস'-এর অধীনে সম্পাদিত প্রায় আশিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রথমদিকের একটি।

এই অনুবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ইউরোপে শিক্ষার পুনর্জাগরণ শুরু হয়, যা পরবর্তী রেনেসাঁর অন্যতম ভিত্তি গড়ে তোলে। এর ফলে জ্ঞানের দরজা নতুন করে খুলে যায়—প্রতিটি প্রজন্ম আগের প্রজন্মের অর্জনের ওপর দাঁড়িয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারে। এই ধারাবাহিক অগ্রগতিই শেষ পর্যন্ত ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হওয়া বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে, যেখানে জ্ঞান ও তথ্যের প্রবাহ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় দ্রুত হয়ে ওঠে। তবে এই পথ মোটেও সহজ ছিল না। মহাবিশ্বের পৃথিবীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত ছিল এবং কেউ যদি সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করত, তবে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করত।

ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে প্রাচীন গ্রিক ও ইসলামি স্বর্ণযুগের জ্ঞান ও দক্ষতার সমকক্ষ হতে পৌঁছাতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল। ১৫৪৩ সালের আগে ইউরোপ এই ক্ষেত্রে নতুন করে কোনো বড়ো দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেনি। ওই বছরই পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস তাঁর গ্রন্থ *সিক্স বুকস কনসার্নিং দ্য রেভোলিউশনস অফ দ্য হেভেনলি অরবস* প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি প্রস্তাব দেন যে, মহাবিশ্বের পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাটি ভ্রান্ত।

তবে কোপার্নিকাস তাঁর ভাষা নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি সরাসরি ঘোষণা না দিয়ে লিখেছিলেন—'যদি পৃথিবী গতিশীল হয়'। শুরুতে তাঁর তত্ত্বের সমালোচনা ছিল তুলনামূলকভাবে মৃদু। তিনি নিজে চার্চের একজন অনুগত সদস্য ছিলেন এবং লেখায় 'যদি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া, বইটি প্রকাশের মাত্র দুই মাস পরই তাঁর মৃত্যু হয়—যা পরবর্তীকালে তাঁর জন্য এক অর্থে সুবিধাজনকই হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় পক্ষের যাজকরাই তাঁর ধারণাগুলোকে গুরুত্বহীন প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। একই সঙ্গে 'বিজ্ঞান'-কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে চার্চের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

এর কিছু দশক পরে, ১৫৮৪ সালে ইতালীয় দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনো *অন দ্য ইনফিনিট ইউনিভার্স অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডস* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তিনি কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক ধারণাকে সমর্থন করেন এবং আরও এগিয়ে গিয়ে যুক্তি দেন যে মহাবিশ্ব অসীম, সেখানে অসংখ্য জগৎ রয়েছে এবং সেসব জগতে বুদ্ধিমান

প্রাণীর বসবাসও থাকতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয় এবং প্রায় আট বছর কারাবাসের পরও তিনি নিজের মত ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করা হয় এবং খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। যদিও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তাঁর এই করুণ পরিণতির পেছনে বিশ্বতত্ত্বের চেয়ে বরং 'ট্রান্সসাবস্ট্যানসিয়েশন'-এর মতো ক্যাথলিক ধর্মের মৌলিক মতবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলাই বেশি দায়ী ছিল।

এরপর ইতিহাসের মঞ্চে আসেন গ্যালিলিও গ্যালিলি—প্রথম ব্যক্তি যিনি সদ্য আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ ব্যবহার করে নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার লিখিত নথি সংরক্ষণ করেন। ১৬১০ সালে তিনি *দ্য স্টারি মেসেঞ্জার* প্রকাশ করেন, যা তাঁকে ইউরোপজুড়ে খ্যাতি এনে দেয়। তবে একই সঙ্গে এই বইটি পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করায় প্রায় তাঁর প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের গতিবিধি নিয়ে গ্যালিলিওর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ কোপার্নিকাসের সেই তত্ত্বের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। চার্চ এই ধারণাকে ধর্মদ্রোহিতা হিসেবে আখ্যা দিতে বেশি সময় নেয়নি। বলা হয়, এই বিশ্বাস বাইবেলের বিরোধী—বিশেষ করে *যোশুয়া* ১০:১২-১৩ পদের, যেখানে সূর্যকে থামতে বলা হয়েছিল : 'এবং সূর্য স্থির হলো, আর চাঁদ থেমে থাকল, যতক্ষণ না লোকেরা তাদের শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নিলো।' যদি ধর্মগ্রন্থে লেখা থাকে যে সূর্য থেমেছিল, তবে তা যে আদতে চলে—এ কথা বলার সাহসই বা কার?

পোপ আদেশ দেন এই তত্ত্ব নিষিদ্ধ করার। চার্চ বুঝতে পেরেছিল, এই বিপজ্জনক নতুন ধারণাগুলো সমাজের প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস, তার নৈতিক বৈধতা এবং শেষ পর্যন্ত চার্চের ক্ষমতার ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিতে পারে। যদি পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র না হয়—বরং যদি আদৌ কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রই না থাকে—তবে মানুষ কি আর এতটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে? এই বোধের অভিঘাত ফরাসি ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্লেজ পাসকাল (১৬২৩-১৬৬২) গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "অসীম মহাকাশের নীরবতা আমাকে আতঙ্কিত করে।"

গ্যালিলিও কিছু সময়ের জন্য বিতর্ক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। কিন্তু ১৬২৩ সালে নতুন পোপ আরবান অষ্টম নির্বাচিত হন, যিনি গ্যালিলিওকে আবার এই বিষয়ে লেখালেখি করতে উৎসাহিত করেন—মূলত পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার প্রত্যাশায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গ্যালিলিও ১৬৩২ সালে প্রকাশ করেন *ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চিফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস, টলেমাইক অ্যান্ড কোপার্নিকান*। বইটি অত্যন্ত

সূক্ষ্ম ও বুদ্ধিদীপ্তভাবে লেখা হলেও, শেষ পর্যন্ত এতে পৃথিবী গতিশীল—এই ধারণার পক্ষেই ওজন বেশি পড়ে।

পোপ এতে সন্তুষ্ট হননি। ফলস্বরূপ গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে প্রায় দুই মাসব্যাপী বিচার শুরু হয়। গ্যালিলিও দাবি করেন, তাঁর উদ্দেশ্য কোপার্নিকান মতবাদকে সমর্থন করা নয়, বরং কেবল এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এই অভিযোগে যে তিনি এমন একটি মতবাদ 'বিশ্বাস করেছেন ও ধারণ করেছেন, যা মিথ্যা এবং পবিত্র ও ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের পরিপন্থি—যে পৃথিবী ঘোরে এবং এটি মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়'। তাঁকে গৃহবন্দি করা হয় এবং এই অবস্থাতেই তিনি ১৬৪২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। শাস্তি হিসেবে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রতি সপ্তাহে একবার করে সাতটি অনুশোচনামূলক গীত (Seven Penitential Psalms) আবৃত্তি করতে।

বাস্তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। গ্যালিলিও যদি তাঁর সময়ের সবচেয়ে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী না হতেন, তবে সম্ভবত জিওর্দানো ব্রুনোর মতোই তাঁকেও একই নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিণতির মুখোমুখি হতে হতো।

জিওর্দানো ব্রুনো। তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার ৩৫৯ বছর পর, অর্থাৎ ১৯৯২ সালে, ভ্যাটিকান অবশেষে স্বীকার করে যে তাঁর বিচারের ক্ষেত্রে তারা ভুল করেছিল।

পোপের ক্রোধ সত্ত্বেও—যদিও ঈশ্বরের নয়—জ্ঞানের স্রোত তখন পুরোহিতদের ইচ্ছার বিপরীত দিকেই প্রবাহিত হচ্ছিল। আকাশ ও মহাবিশ্ব নিয়ে মানুষের অনুসন্ধান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসগুলোকে উলটে দিতে শুরু করে এবং বিশ্ব সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, পুরোনো দেবতা ও পুরোনো কর্তৃত্বগুলো ক্রমেই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছিল।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর মাত্র এক বছর পর জন্ম নেন আইজ্যাক নিউটন। তিনি এমন এক নতুন ধরনের টেলিস্কোপ উদ্ভাবন করেন, যা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় মহাকাশের গভীরে আরও স্পষ্টভাবে তাকানোর সুযোগ করে দেয়। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত তাঁর *প্রিন্সিপিয়া* গ্রন্থে তিনি গতি ও মহাকর্ষের সূত্র উপস্থাপন করেন, যা পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

নিউটনের আবির্ভাব ঈশ্বরকে 'সমাধিস্থ' করার জন্য ছিল না; বরং তাঁর কাছে এটি ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করার আরেকটি পথ। তিনি যত বেশি করে মহাবিশ্বের নিয়ম আবিষ্কার করতেন, ততই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে এই অসাধারণ নকশার পেছনে অবশ্যই একজন মহান নকশাকার আছেন। তাঁর ভাষায়,

CamScanner

"সূর্য, গ্রহ ও ধূমকেতুর এই সর্বাধিক সুন্দর ব্যবস্থা কেবল একজন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী সত্তার পরামর্শ ও শাসন থেকেই উদ্ভূত হতে পারে।"

নিউটন নিঃসন্দেহে একমত ছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে। গ্যালিলিও মহাকর্ষ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন—কথিত আছে, পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে বস্তু ফেলে তিনি তা যাচাই করেছিলেন। তবে নিউটনের সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল এই উপলব্ধি যে মহাকর্ষের নিয়ম সর্বজনীন : এটি শুধু পৃথিবীতেই নয়, মহাকাশের সর্বত্র একইভাবে কার্যকর। তাঁর আগের মহান চিন্তাবিদদের মতোই নিউটনও অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ ও গভীর চিন্তার সমন্বয়ের মাধ্যমে মানব ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক মুহূর্তে পৌঁছে যান।

কেন একটি আপেল সোজা নিচে মাটিতে পড়ে? কেন একটি কামানের গোলা গতি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা পথে নামতে শুরু করে? কোনো অদৃশ্য শক্তি তাদের নিচের দিকে টেনে আনে? নিউটনের সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্রের উত্তর ছিল—সব বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বল নির্ভর করে বস্তুর ভর ও তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর। সুতরাং, যদি কোনো আপেলকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত থেকে সামনের দিকে এত বেশি বেগে ছুড়ে দেওয়া হয় যে তা অবিরাম চলতে থাকে, তবে সেটি সরল রেখায় মহাকাশে হারিয়ে যাবে না। বরং সেটি পৃথিবীর চারপাশে একটি অবিরাম বক্র পথে 'পড়তে' থাকবে, কারণ 'গ্রাভিটি' বা মহাকর্ষ নামক সেই অদ্ভুত শক্তি তাকে পৃথিবীর কাছাকাছি ধরে রাখবে। 'গ্রাভিটি' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন *গ্রাভিটাস* থেকে, যার অর্থ 'ওজন'। নিউটনের মতে, এই মহাকর্ষ বলই ব্যাখ্যা করে কেন গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে নিয়মিতভাবে ঘুরে চলে এবং মহাকাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়ায় না।

মহাকাশ। যেখানে একটি বড়ো বস্তু যখন একটি ছোটো বস্তুর কাছাকাছি থাকে, তার মহাকর্ষীয় টান বা বল আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের ব্যাপারে কিছু বিজ্ঞানী সীমিত আপত্তি জানিয়েছিলেন, তারা মনে করতেন এটি যেন কোনো অতিপ্রাকৃত বা আদিম কুসংস্কারের মতো বিষয়। কিন্তু নিউটন নিজে তার তত্ত্বকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম ছিলেন এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে সন্তুষ্ট ছিলেন।

নিউটনের অবদান অসীম। কেউ কেউ তাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানকারী মনে করেন। ১৭২৭ সালে তার মৃত্যু হলে, তার মরদেহ এক সপ্তাহ ধরে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাখা হয়। বিখ্যাত ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ লিখেছিলেন—"খোদা বললেন, 'নিউটন হোক!' আর সব আলোকিত হয়ে গেল।"

এটি বিজ্ঞানের জন্য এক উত্তেজনাপূর্ণ সময় ছিল। প্রাচীন গ্রিক এবং ইসলামি বিশ্বের স্বর্ণযুগের মতো, তবে ভিন্ন কারণ হলো—জ্ঞান এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল যে প্রতিটি নতুন আবিষ্কার সংগঠিত ধর্ম এবং ক্ষমতার ওপর তাদের দাবিতে আরেকটি ফাটল তৈরি করছিল। 'যুক্তির যুগ' বা এজ অফ রিজনে, ধর্মগ্রন্থের বিরোধিতা করার জন্য একজন বিজ্ঞানীকে অনুশোচনামূলক গীত আবৃত্তি করতে বাধ্য করা অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'আকাশের দিকে তাকানো' মানুষের চিন্তা এবং জীবনযাপনের পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এটি আরও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথ খুলে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে, যদিও পুরোপুরি নয়, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলোতে খ্রিষ্টধর্ম তার উপাসনালয়ে পিছু হটছিল, আর বিজ্ঞান ইহজাগতিক ক্ষেত্র দখল করতে শুরু করেছিল।

এটি ছিল এক অলৌকিক এবং বিস্ময়ময় যুগ। তখন থেকে আমরা আরও অনেক কিছু শিখেছি। আজকের বিজ্ঞান আমাদের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে এমন অনেক কিছু দেখতে দেয় যা আগে কল্পনাও করা যেত না। আধুনিক স্পেস টেলিস্কোপ সময়ের গভীরে তাকিয়ে এমন আলো শনাক্ত করতে পারে যা ১৩ বিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় ধরে ভ্রমণ করছে।

১৯৩১ সালে জর্জেস লেমাত্রে প্রস্তাব করেছিলেন যে মহাবিশ্ব একটি একক ক্ষুদ্র কণার বিস্ফোরণ দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা তিনি 'প্রাইমেভাল অ্যাটম' বা আদিম পরমাণু হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। এই ধারণা ১৯২০-এর দশকে এডুইন হাবলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমর্থিত হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসনের বিশাল হুকার টেলিস্কোপের মাধ্যমে হাবল দেখেছিলেন, সমস্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ পৃথিবী থেকে সব দিকে দ্রুত গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। এর থেকে যৌক্তিকভাবে বোঝা যায় যে এই মহাবিশ্ব একসময় একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে জন্ম নিয়েছিল। এই তত্ত্বকে 'বিগ ব্যাং' বলা হয়। তখনকার প্রচলিত জ্ঞান 'স্টেডি স্টেট' বা স্থিতাবস্থা তত্ত্বকে সমর্থন করত—যা বলত মহাবিশ্ব সবসময় বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে গ্যালাক্সিগুলোর গতির নতুন পরিমাপ দেখায় যে মহাবিশ্বের জন্ম প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে। এটি মহাবিশ্বের রহস্য বোঝার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ বিপ্লব সৃষ্টি করে।

১৯৯০ সালে ১২-টনের হাবল স্পেস টেলিস্কোপ কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমাবদ্ধতা এবং বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে এটি মহাবিশ্বকে আরও স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। হাবল আমাদের অতীত, এমনকি আমাদের

CamScanner

জন্মের কাছাকাছি সময়ের আলো পর্যন্ত শনাক্ত করতে সক্ষম। এছাড়া আধুনিক ইনফ্রারেড টেলিস্কোপগুলো এমন আলোও ধরতে পারে যা মহাজাগতিক ধূলিকণার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে এবং যা মানব চোখ বা হাবলের মতো দৃশ্যমান আলোর টেলিস্কোপে দেখা যায় না। তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং গঠন পরিমাপের মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বের গল্প জানতে পারি।

এই সমস্ত আবিষ্কার 'কীভাবে?' এবং 'কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস থেকে উদ্ভূত। বিজ্ঞান প্রথম প্রশ্নের উত্তর চমৎকারভাবে দিতে পারে, কিন্তু যখন উত্তর পাওয়া যায়, তখন তা নতুন একটি 'কেন?' ছুঁড়ে দেয়। আমাদের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মহাবিশ্বের বিস্ময় ততই অটুট থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে, বিংশ শতাব্দীর তত্ত্ব এবং আবিষ্কার শুধু নতুন মাত্রা যোগ করেছে—যেমন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, যার উত্তর হয়তো কেবল তখনই পাওয়া যাবে যখন আমরা মহাকাশের ভৌত বাস্তবতা সরাসরি অন্বেষণ শুরু করব।

গত শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে মানুষ কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা ও স্থান-কালের তত্ত্বের অদ্ভুততার সঙ্গে পরিচিত হয়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রস্তাব করে যে ক্ষুদ্র কণাগুলোর রহস্যময় সাবঅ্যাটমিক জগৎ সম্পূর্ণভাবে দৈব বা র‍্যান্ডম দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। এটি নিউটন বা আইনস্টাইনের সার্বজনীন নিয়মের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হয়। এই বিতর্ক সংক্ষেপে স্পর্শ করা প্রয়োজন—কারণ এমনকি আমাদের সময়ের সেরা মস্তিষ্কের জন্যও এটি পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়।

কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্ট তত্ত্ব বলে যে কণাগুলো একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি যদি তারা কোটি কোটি কিলোমিটার দূরেও থাকে। মূল শব্দটি হলো 'তাৎক্ষণিকভাবে'। এটি বিজ্ঞানের সেই প্রথাগত ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না যেখানে নিয়ম সর্বত্র একরকমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন, আলোর গতির চেয়ে দ্রুত কিছুই ভ্রমণ করতে পারে না। তিনি কোয়ান্টাম এন্টাঙ্গেলমেন্টকে 'দূর থেকে ভুতুড়ে ক্রিয়া' (spooky action at a distance) হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবু, এটি সম্ভাবনা উন্মুক্ত রাখে যে নিয়মগুলো হয়তো সার্বজনীন নয়। যদি তাই হয়, হয়তো কোনো কিছু আলোর গতির চেয়ে দ্রুত ভ্রমণ করতে পারে—যা শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আইনস্টাইনের বিখ্যাত উক্তি ছিল—"ঈশ্বর মহাবিশ্ব নিয়ে পাশা খেলেন না।"

আইনস্টাইন নিউটনের সঙ্গে একমত ছিলেন যে স্থান তিন মাত্রার—উচ্চতা, প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য—নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে নিউটন মনে করতেন, মহাকাশের বস্তু এই মাত্রাগুলোকে

প্রভাবিত করে না; আইনস্টাইন বলেছিলেন, করে। তার 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' বা জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি চার-মাত্রিক স্থান-কাল বা স্পেস-টাইমের ধারণা যোগ করেছিল, যেখানে সময়কে চতুর্থ মাত্রা হিসেবে ধরা হয়েছে। বৃহৎ ভরের বস্তু স্পেস-টাইমকে বেঁকে দিতে পারে, এমনকি তার গতি বাড়াতে বা কমাতে পারে। মহাকাশকে একটি ফোম ম্যাট্রেস বা গদির মতো কল্পনা করুন—আপনার ওজনের নিচে একটি গর্ত বা নিম্ন অংশ তৈরি হবে। আইনস্টাইনের মতে, এই বক্রতা বা বিকৃতি হলই মহাকর্ষ।

আমাদের পূর্বপুরুষরা আকাশের দিকে তাকিয়ে এমন একটি মহাবিশ্ব দেখেছিলেন যা তারা বোঝেনি, কিন্তু তার শৃঙ্খলা ব্যবহার করে তারা জগতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা এখন অনেক বেশি জানি, তবুও এখনো অন্ধকার পদার্থ, ব্ল্যাক হোল, স্থান-কাল বক্রতা এবং শৃঙ্খলা ও আইনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে লুকানো অসীম রহস্যময় মহাবিশ্বের মুখোমুখি। নিউটন এটিই বোঝেছিলেন যখন বলেছিলেন– "আমরা যা জানি তা এক ফোঁটা জল, যা জানি না তা মহাসাগর।"

মহাকাশ ভ্রমণে কী সম্ভব এবং কী সম্ভব নয়, তার ওপর কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং স্পেস-টাইমের প্রভাব এখনো অজানা। ভবিষ্যতে এটি নতুন পথ খুলতে পারে। কারণ হাজার হাজার বছরের আবিষ্কারের পরও, উত্তরের চেয়ে প্রশ্নই বেশি। আরও অনেক প্রশ্ন বাকি আছে যা আমরা এখনো জানি না। সেই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত পৃথিবী থেকে দূরে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে। এবং সেই উত্তর খুঁজে বের করার, আরও শেখার, এমনকি সেখানে আমাদের নিজের পদচিহ্ন রাখার আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিরোধ্য।

CamScanner

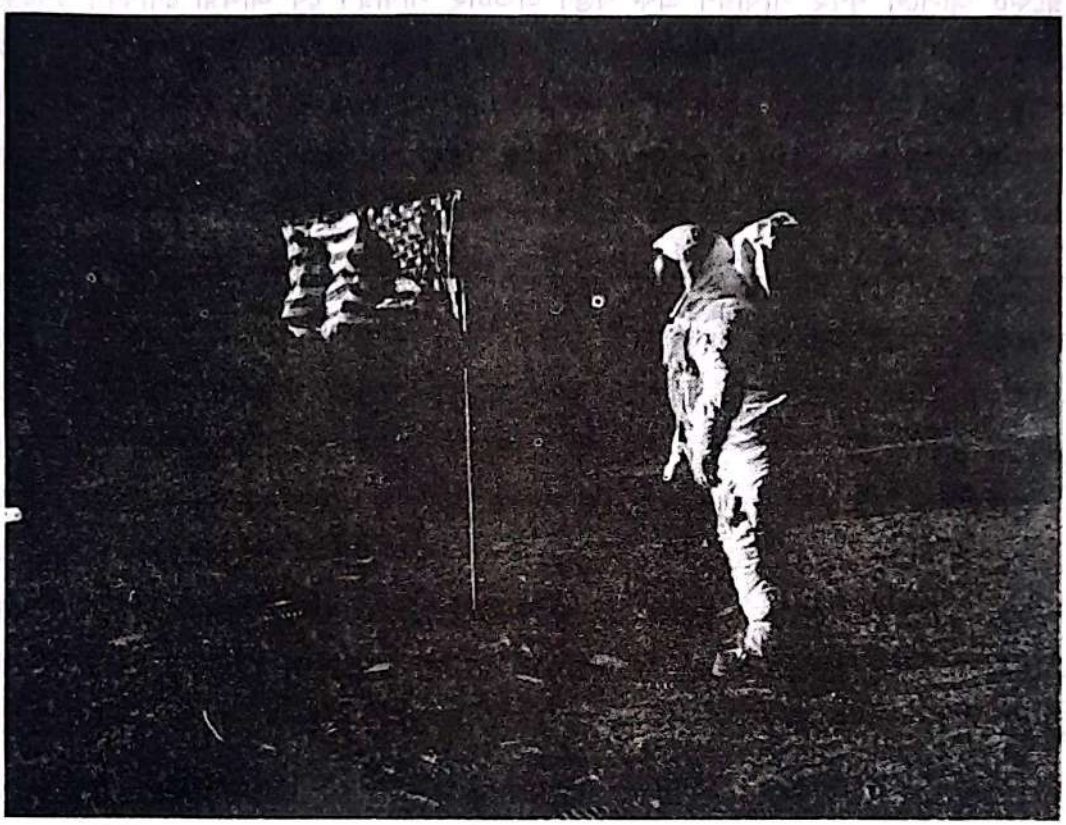
অধ্যায়-২

স্বর্গের পথে যাত্রা

(THE ROAD TO THE HEAVENS)

'আমি পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি—কী অপরূপ সুন্দর!'

— ইউরি গ্যাগারিন



১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই চাঁদের বুকে মার্কিন পতাকার পাশে মহাকাশচারী এডউইন অলড্রিন।

আমরা এক শতাব্দীরও কম সময় আগে প্রথমবারের মতো মহাকাশের সীমানা অতিক্রম করেছি। হাজার হাজার বছর ধরে চলা ধীরগতির অগ্রগতির পর, বিংশ শতাব্দীর সেই অলৌকিক ও বিস্ময়কর দশকগুলোতে হঠাৎ করেই অভূতপূর্ব দ্রুততা

দেখা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে চলমান সংঘাতই আমাদের সেই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। যে প্রযুক্তি আমাদের আকাশ ছুঁইয়েছিল, তার জন্ম হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের (Cold War) অস্ত্র প্রতিযোগিতার ভেতর থেকে।

মানব ইতিহাসের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে মহাকাশ ছিল একই সঙ্গে খুব কাছের, আবার ভীষণ দূরের এক জগৎ। ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ১৯৭৯ সালে যেমনটি বলেছিলেন, "মহাকাশ মোটেও দূরে নয়। আপনার গাড়ি যদি সোজা উপরের দিকে যেতে পারত, তাহলে সেখানে পৌঁছাতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগত।" ফর্মুলা ওয়ান-এর প্রকৌশলীরা তাদের গাড়ির ইঞ্জিনের শক্তি যতই বাড়ান না কেন, তারা কখনোই সেকেন্ডে ৭.৯ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করতে পারবেন না—যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ ছেড়ে কক্ষপথে পৌঁছানোর জন্য অপরিহার্য। অন্যদিকে, একটি রকেট ইঞ্জিন ঠিক এই কাজটিই করে।

রকেট আসলে খুবই সাধারণ এক বস্তু। এতটাই সাধারণ যে আমরা দোকান থেকে কিনে এনে জন্মদিন বা নববর্ষের আনন্দে বাড়ির উঠান থেকেই তা আকাশে ওড়াতে পারি। কিন্তু সেই একই রকেটের ভেতরে একজন মানুষকে বসিয়ে মহাকাশে পাঠানো এতটাই মারাত্মক জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ যে আজ পর্যন্ত মাত্র তিনটি দেশই তা সফলভাবে করতে পেরেছে।

মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধাগুলোর একটি হলো—এর পেছনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মূল ধারণাটাই ভয়ংকরভাবে সরল : একজন মানুষকে বিপুল পরিমাণ জ্বালানিভর্তি একটি ট্যাঙ্কের ওপর বসিয়ে দেওয়া, তারপর সেই জ্বালানিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। স্পেস শাটলের নভোচারী মাইক ম্যাসিমিনো তার স্মৃতিকথা *স্পেসম্যান*-এ এই বাস্তবতাকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। লঞ্চ প্যাডের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় উৎফুল্ল সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "এরা কি পাগল? ওরা কি বুঝতে পারছে না যে আমরা এমন একটা বিশাল বোমার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেলতে যাচ্ছি, যা আমাদের উড়িয়ে কয়েকশো মাইল ওপরে আকাশে নিয়ে যাবে?"

বাস্তবেও ঠিক তাই ছিল। শাটলের বাইরের জ্বালানি ট্যাঙ্কে থাকত প্রায় ৬,৫০,০০০ লিটার তরল অক্সিজেন এবং প্রায় ১৭ লক্ষ লিটার তরল হাইড্রোজেন। ইঞ্জিনগুলো এই জ্বালানি এমন দ্রুতগতিতে পোড়াত যে প্রতি দশ সেকেন্ডে একটি পারিবারিক সুইমিং পুল খালি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার তুলনা করা যায়।

এই মৌলিক প্রযুক্তিটি নবম শতাব্দীতে চীনা সন্ন্যাসীদের আবিষ্কৃত বারুদের—যার উপাদান ছিল সালফার, পটাশিয়াম নাইট্রেট ও কাঠকয়লা—চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়।

শুরুতে এই বারুদ ব্যবহার করা হতো আতশবাজি তৈরিতে। পরে চীনারা এটি থেকে 'ফ্লাইং ফায়ার ল্যান্স' বা 'উড়ন্ত আগুনের বর্শা' তৈরি করে। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীতে এক ব্যক্তি নাকি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারায় পৌঁছানোর চেষ্টাও করেছিলেন। চীনা কিংবদন্তি অনুযায়ী, ওয়ান হু নামের এক ব্যক্তি একটি বাঁশের চেয়ারের সঙ্গে সাতচল্লিশটি বারুদভর্তি রকেট বেঁধে নেন, নিজেকে সেই চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলেন এবং তার চাকরদের নীল সলতেটিতে আগুন ধরাতে বলেন। প্রবল বিস্ফোরণ ও ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে তিনি সামান্য ওপরের দিকে উঠেছিলেন। এরপর তাকে আর কখনো দেখা যায়নি—চেয়ারটিকেও না। ঘটনাটি যে বাস্তবেই ঘটেছিল, তার কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। তবে আশ্চর্যজনকভাবে, আজ চাঁদে ওয়ান হু-এর নামে একটি গর্ত বা ক্রেটার রয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রকেট তৈরির নানা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, যার সাফল্যের মাত্রা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তবে আধুনিক রকেট প্রযুক্তির বংশপরিচয়ের কথা বলতে গেলে মহাকাশযাত্রার ইতিহাসবিদরা সাধারণত তিনজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন : কনস্ট্যান্টিন সোলকোভস্কি (১৮৫৭–১৯৩৫), রবার্ট গডার্ড (১৮৮২–১৯৪৫) এবং হারমান ওবার্থ (১৮৯৪–১৯৮৯)। তিনজনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ মেধাবী ও পথিকৃৎ ছিলেন। আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট গডার্ড ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নবম শতাব্দীতে চীনাদের আবিষ্কৃত কঠিন জ্বালানির (solid fuel) পরিবর্তে তরল জ্বালানি ব্যবহার করে সফলভাবে মাটি থেকে রকেট উৎক্ষেপণ করেন। হারমান ওবার্থ ছিলেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী, যদিও নাৎসি জার্মানির হয়ে কাজ করার কারণে তার খ্যাতি কিছুটা কলঙ্কিত। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল 'ভারগেলটুংওয়াফ ২' (Vergeltungswaffe-2) বা ভি-২ রকেট, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে ব্যবহৃত হয়। মহাকাশ ভ্রমণের সময় মানুষের শরীর জি-ফোর্স ও ওজনহীনতার মতো শারীরিক চাপ সহ্য করতে পারবে কি না—এর তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রমাণের জন্য তিনি নিজের ওপরই চিকিৎসা ও শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তবে নিছক কল্পনাশক্তি ও দূরদৃষ্টির বিচারে বলা যায়, এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিলেন সোলকোভস্কি।

১৯০৩ সালে—প্রথম চালিত বিমান আকাশে ওড়ার প্রায় সাত মাস আগে—একজন প্রায় অজানা, স্বশিক্ষিত রাশিয়ান বিজ্ঞানী মহাকাশযাত্রার সম্ভাবনা নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক প্রমাণ প্রকাশ করেন। সেই বছরের শেষদিকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ইতিহাসে নিজেদের নাম স্থায়ী করে নেন, কিন্তু সোলকোভস্কি থেকে যান প্রায় অচেনা, যদিও তিনি ছিলেন সর্বকালের অন্যতম দূরদর্শী বিজ্ঞানীদের একজন।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের আঠারো সন্তানের মধ্যে পঞ্চম হিসেবে জন্ম নেওয়া সোলকোভস্কি শৈশবে গুরুতর অসুস্থতার কারণে মাত্র দশ বছর বয়সেই বধির হয়ে যান এবং তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। এরপর তিনি পাবলিক লাইব্রেরির বই পড়েই নিজেকে গড়ে তুলতে থাকেন। তার পাঠ্যতালিকায় ছিল পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণাত্মক বলবিদ্যার অসংখ্য গ্রন্থ, পাশাপাশি জুল ভার্নের সায়েন্স ফিকশন উপন্যাসও। তিনি নিজেই লিখেছিলেন, "বই ছাড়া আমার আর কোনো শিক্ষক ছিল না।"

তার প্রাথমিক লেখাগুলোতেই ছিল বিস্ময়কর সব দূরদর্শী ধারণা—সৌরশক্তি চালিত স্পেস স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা, মহাকাশযানের অভিমুখ নিয়ন্ত্রণের জন্য জাইরোস্কোপের নকশা, মহাকাশযানগুলোর একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার (ডকিং) জন্য এয়ারলক এবং চাপযুক্ত স্পেস স্যুট, যা কসমোনট বা নভোচারীদের তাদের যান ছেড়ে বাইরে কাজ করতে সাহায্য করবে। ১৮৯৫ সালেই তিনি 'স্পেস এলিভেটর' বা মহাকাশ লিফটের ধারণা উপস্থাপন করেন। একের পর এক এমন সব যুগান্তকারী কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯০৩ সালের সেই গবেষণাপত্র, যা পরে তাকে রাশিয়ায় বিখ্যাত করে তোলে। 'রিঅ্যাকশন মেশিনের সাহায্যে বিশ্ব মহাকাশ অন্বেষণ' (Exploration of the World Space with Reaction Machines) শিরোনামের এই লেখাতেই প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা হয় যে একটি রকেট বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করতে পারে। সোলকোভস্কি কক্ষপথে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুভূমিক গতিবেগ নির্ণয় করেন এবং দেখান যে তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেনের মিশ্রণে চালিত রকেট ব্যবহার করে এই গতি অর্জন করা সম্ভব। তার প্রস্তাবিত সূত্র—যা আজ 'সোলকোভস্কি রকেট সমীকরণ' নামে পরিচিত—রকেটের গতি, রকেট ও তার জ্বালানির পরিবর্তনশীল ভর এবং নির্গত গ্যাসের গতির মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। আধুনিক মহাকাশ ভ্রমণের ভিত্তি এই সমীকরণের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

সোভিয়েতরা ক্ষমতায় আসার পর সোলকোভস্কির মহাকাশ ভাবনাগুলোকে তার শুরুতে সন্দেহের চোখে দেখেছিল, কারণ তার চিন্তায় আধা-ধর্মতাত্ত্বিক প্রবণতা ছিল যা কমিউনিস্ট দর্শনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 'ঈশ্বর কি আছেন?' (Is There God?) প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "আমরা মহাজাগতিক ইচ্ছার অধীন এবং তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত... আমরা যেন মেরিওনেট বা যান্ত্রিক পুতুল।" বাস্তবে অবশ্য তিনি নিজেও কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলেন না। এক পর্যায়ে সোভিয়েত 'গোপন' পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারণার অভিযোগে তিনি মস্কোর কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কা কারাগারে কয়েক সপ্তাহ বন্দি থাকেন।

তবুও, রকেট শিল্পের প্রাথমিক বিকাশ শুরু হলে সোভিয়েতরা বুঝতে পারে যে একজন এমন পথিকৃৎকে নিজেদের বলে দাবি করার মধ্যে বড়ো ধরনের জনসংযোগ সুবিধা রয়েছে। ফলস্বরূপ, ১৯২৯ সালে সোলকোভস্কিকে বহু-ধাপবিশিষ্ট (মাল্টি-স্টেজ) রকেট বুস্টারের ধারণা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়।

নিজ দেশে সোলকোভস্কি কখনোই অবহেলিত ছিলেন না। বিশেষ করে তার জন্মভূমিতে তিনি নানা উপাধিতে পরিচিত—'মহাকাশযাত্রার জনক' থেকে শুরু করে 'রকেট বিজ্ঞানের জনক'। তার সাধারণ কাঠের বাড়িটি আজ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, আর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে 'স্টেট মিউজিয়াম অফ দ্য হিস্ট্রি অফ কসমোনটিক্স', যা তার নামেই প্রতিষ্ঠিত। চাঁদের উলটো পিঠে অবস্থিত একটি বিশাল গর্ত, যা সোভিয়েত মহাকাশযান 'লুনা-৩' আবিষ্কার করেছিল, তার নামকরণও করা হয়েছে সোলকোভস্কির নামে—যে মানুষটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, একদিন সায়েন্স ফিকশন বাস্তব বিজ্ঞানে রূপ নেবে।

জ্ঞানী সায়েন্স ফিকশন অনুরাগীরা এসব ইতিহাস ভালোভাবেই জানেন। কমিক বুক সিরিজ 'অ্যাসাসিনস ক্রিড'-এ একটি প্রধান চরিত্র সোলকোভস্কির 'দ্য উইল অফ দ্য ইউনিভার্স' থেকে পাঠ করে। 'স্টার ট্রেক : দ্য নেক্সট জেনারেশন'-এর একটি পর্বে তার নামে একটি মহাকাশযানের নামকরণ করা হয়েছে। সিড মেয়ারের দুটি ভিডিও গেমে তাকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, আর সাই-ফাই লেখক উইলিয়াম গিবসন একটি ছোটোগল্পে তার নাম উল্লেখ করেছেন। মেয়ার ও গিবসন নিঃসন্দেহে সোলকোভস্কির সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তিটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন : "পৃথিবী মানবজাতির দোলনা, কিন্তু কেউ চিরকাল দোলনায় থাকতে পারে না।" মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন, "সারা জীবন আমি স্বপ্ন দেখেছি—আমার কাজের মাধ্যমে মানবজাতি অন্তত সামান্য হলেও এগিয়ে যাবে।" বাস্তবে সেটাই ঘটেছিল।

তবে তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দেওয়া মোটেও সহজ ছিল না। সোলকোভস্কির সমীকরণ বাস্তবায়ন করতে হলে ত্বরণ সৃষ্টি করতে হয়, আর ত্বরণের জন্য প্রয়োজন জ্বালানি। আপনি যত বেশি ত্বরণ চাইবেন, তত বেশি জ্বালানি লাগবে। আবার যত বেশি জ্বালানি বহন করতে হবে, রকেট বা যানটি তত ভারী হয়ে উঠবে। এই দ্বন্দ্বই রকেট প্রকৌশলের মূল চ্যালেঞ্জ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে বহু বিজ্ঞানী এই সমস্যাটি সমাধান করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের বছরগুলোতে কিছু অগ্রগতি হলেও, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধই—তার সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুযুদ্ধ ও জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা—প্রযুক্তির অস্বাভাবিক দ্রুত বিকাশ ঘটায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপান—উভয় দেশই রকেটচালিত বিমান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। জাপান তো এমনকি রকেটচালিত কামিকাজি বোমারু বিমানও তৈরি করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত দিকনির্দেশনা দেয় জার্মান রকেট কর্মসূচি। এই কর্মসূচির তত্ত্বাবধানে ছিলেন ওয়ের্নর ভন ব্রাউন—একজন প্রুশিয়ান অভিজাত, যিনি হারমান ওবার্থের কাজ দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ওবার্থের মতোই ভন ব্রাউনও নাৎসি পার্টিতে যোগ দেন এবং এসএস-এর মেজর পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৪২ সালে ভন ব্রাউন ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার ওপরে সাব-অরবিটাল মহাকাশে প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের তদারকি করেন। তবে তার দল তখনো এমন কোনো রকেট তৈরি করতে পারেনি, যা কক্ষপথে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় গতিবেগ অর্জন করতে সক্ষম। তবুও, তার নির্মিত ভি-২ রকেট ঘণ্টায় প্রায় ৫,৩০০ কিলোমিটার গতিতে ৩২০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে গিয়ে পরে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারত। অ্যাডলফ হিটলার যখন এই সাফল্যের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি ভন ব্রাউনকে হাজার হাজার ওয়ারহেডবাহী রকেট তৈরির নির্দেশ দেন। ১৯৪৪ সালে প্রথম ভি-২ রকেটগুলো উৎক্ষেপণ করা হয়। শব্দের চেয়েও দ্রুত গতিতে চলার কারণে এগুলোকে প্রতিহত করা প্রায় অসম্ভব ছিল এবং উৎক্ষেপণের তিন মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে সেগুলো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানত।

হিটলারের তথাকথিত 'হাজার বছরের রাইখ' (Thousand Year Reich) যখন প্রতিষ্ঠার মাত্র বারো বছরের মাথায় ধসে পড়তে শুরু করে, তখন ভন ব্রাউন ও তার দল বাভারিয়ার দিকে যাত্রা করে এবং আমেরিকান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এটি তাদের জন্য একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ছিল, কারণ বিকল্প হিসেবে রাশিয়ানদের হাতে পড়ার ঝুঁকি ছিল। সে সময় উভয় পরাশক্তির গোয়েন্দা সংস্থাই নাৎসি জার্মানির গোপন অস্ত্র ও সেগুলো নির্মাণকারী বিজ্ঞানীদের খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তীতে যা 'অপারেশন পেপারক্লিপ' নামে পরিচিত হয়, তার আওতায় ভন ব্রাউনসহ প্রায় ১২০ জন জার্মান বিজ্ঞানীকে গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয় আমেরিকার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি উন্নত করার উদ্দেশ্যে। এসব বিজ্ঞানীর অতীত ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করা হয়। অনেকেই ছিলেন কট্টর নাৎসি, কিন্তু নুরেমবার্গ ট্রায়ালে বিচার ও ফাঁসির মুখোমুখি হওয়া তাদের কিছু সহকর্মীর বিপরীতে, এদের যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। ভি-২ রকেট নির্মাণে মূলত দাসশ্রমিকদের ব্যবহার করা হয়েছিল—যাদের ভন ব্রাউন ব্যক্তিগতভাবে বুখেনভাল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে বাছাই করেছিলেন। এই রকেটগুলোই শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার নিরপরাধ বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়।

CamScanner

হাসিখুশি ও বাকপটু ওয়ের্নর ভন ব্রাউন শেষ পর্যন্ত নাসার মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের পরিচালক এবং আমেরিকান মহাকাশ কর্মসূচির প্রকাশ্য মুখে পরিণত হন। শোনা যায়, নিজের তৈরি ভি-২ রকেট সম্পর্কে তিনি একবার রসিকতা করে বলেছিলেন—রকেটগুলো নিখুঁতভাবেই কাজ করেছিল, সমস্যা ছিল শুধু এই যে সেগুলো ভুল গ্রহে আঘাত হেনেছিল। তার এই নৈতিক উদাসীনতার সঙ্গে আমেরিকানদের মনোভাবেরও মিল ছিল। নিজেদের নতুন যুদ্ধ—স্নায়ুযুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার—জয়ের স্বার্থে তারা ভন ব্রাউনের অতীত মুছে দিয়ে এক ধরনের অনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছেছিল এবং সেই সমঝোতা কার্যকরও করেছিল।

রাশিয়ানরাও প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। তাদের নিজস্ব 'পেপারক্লিপ'-এর সংস্করণ ছিল 'অপারেশন ওসোয়াভিয়াখিম'। ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ২,২০০-এরও বেশি জার্মান বিজ্ঞানী এবং তাদের পরিবারকে জোরপূর্বক রাশিয়ায় নিয়ে যায়, রকেট কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করানোর জন্য। ততদিনে স্নায়ুযুদ্ধ কার্যত শুরু হয়ে গেছে।

এ সময়টা ছিল এমন এক যুগ, যখন সারা বিশ্বের মানুষ পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাশরুম-ক্লাউডের ছায়ায় বসবাস করত। পারমাণবিক হামলা থেকে বাঁচার আশায় শিশুদের 'ডাক অ্যান্ড কভার' মহড়া করানো হতো—মাথা নিচু করে নিজেকে ঢেকে রাখা শেখানো হতো—আর সাধারণ মানুষকে নিজ নিজ বাড়িতে বিমান-হামলা আশ্রয়কেন্দ্র (এয়ার-রেইড শেল্টার) তৈরি করতে উৎসাহিত করা হতো, যদিও বাস্তবে থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের ক্ষেত্রে এসবের কার্যকারিতা প্রায় শূন্য ছিল। ১৯৪৯ সালের আগস্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজাখস্তানের একটি দুর্গম পরীক্ষাগারে তাদের প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সাইবেরিয়ার উপকূল বরাবর উড়ে যাওয়া একটি মার্কিন গুপ্তচর বিমান তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন শনাক্ত করে এবং কয়েক সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান বিশ্ববাসীকে জানান যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন একটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ আর কেবল কল্পনা নয়, একটি বাস্তব সম্ভাবনায় পরিণত হয়। পরে উভয় দেশ যখন হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করে—যা সাধারণ পারমাণবিক বোমার চেয়েও বহু গুণ শক্তিশালী—তখন পারমাণবিক প্রলয়ের আশঙ্কা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

স্নায়ুযুদ্ধের অস্ত্রভাণ্ডারে প্রযুক্তিও ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রতিটি পক্ষই প্রযুক্তিগত সাফল্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইত যে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামরিক শক্তিই শ্রেষ্ঠ। ১৯৫০-এর দশকের মধ্যেই উভয় দেশ এমন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়, যেগুলো দিয়ে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানো

যেত—বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পরিমাপ করতে, রেডিও তরঙ্গের সঞ্চালন পরীক্ষা করতে এবং কক্ষপথে থাকা বস্তু ট্র্যাক করতে। অবশ্য এসব ক্ষেপণাস্ত্রের আরেকটি, আরও ভয়ংকর উদ্দেশ্যও ছিল।

সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সের্গেই কোরোলেভ। ১৯৩০-এর দশকে নির্মম নির্যাতনের মুখে তিনি মাতৃভূমির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কথা 'স্বীকার' করতে বাধ্য হন এবং তাকে সাইবেরিয়ার একটি কুখ্যাত ও নিষ্ঠুর গুলাগে—শ্রমশিবিরে—পাঠানো হয়। সেখানে তাকে অনাহারে রাখা হয়, তার দাঁত ভেঙে দেওয়া হয় এবং চোয়াল ভেঙে যায়। পরে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় তাকে মস্কোর একটি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনি রকেট নকশার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্নায়ুযুদ্ধের সময় তার ওপর একটিই নির্দেশ ছিল : "আমেরিকানদের হারাও—সবার আগে সেখানে পৌঁছাও।" তিনি সেই লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন মাত্র চার মাসের ব্যবধানে।

১৯৫৭ সালের অক্টোবরের শুরুর দিকে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের কয়েকজন শৌখিন রেডিও অপারেটর তাদের শর্ট-ওয়েভ রেডিওতে একটানা *বিপ বিপ বিপ* শব্দ শুনতে পান। কেউ কেউ সেই শব্দ রেকর্ড করেন, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমেরিকার টেলিভিশন ও রেডিও শ্রোতারা স্পুটনিক ১ (Sputnik 1)-এর সংকেত শুনতে থাকেন—পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকারী প্রথম মানবনির্মিত বস্তু। একটি অদৃশ্য সীমানা তখন অতিক্রম করা হয়ে গিয়েছিল। মহাকাশ যুগের সূচনা ঘটে।

স্পুটনিক ১ উৎক্ষেপণ করা হয় ৪ অক্টোবর, কাজাখস্তান থেকে। আকারে এটি একটি বিচ বলের চেয়ে খুব বেশি বড়ো ছিল না; ওজন ছিল মাত্র ৮৩.৬ কিলোগ্রাম। এর গোলাকার শরীর থেকে চারটি লম্বা অ্যান্টেনা বেরিয়ে ছিল, আর ভেতরে ছিল একটি থার্মোমিটার, কয়েকটি ব্যাটারি, একটি রেডিও ট্রান্সমিটার এবং যন্ত্রাংশ ঠান্ডা রাখার জন্য একটি ছোটো ফ্যান। এই সামান্য বস্তুটিই আমেরিকানদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

রাশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের জন্য এটি বিজয়ের প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়। প্রাভদা পত্রিকা ঘোষণা করেছিল, "All the world heard the announcement of the launching of the Artificial Moon।" সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই সাফল্যের খবর পান রাত প্রায় এগারোটায়, কিয়েভের মারিনস্কি প্রাসাদে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সময়। তার ছেলে সের্গেই স্মরণ করে বলেন, ক্রুশ্চেভকে জানানো হয় যে তার জন্য একটি ফোন এসেছে। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে দেখান যে 'তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে'। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর তিনি হাত তুলে উপস্থিত সবাইকে চুপ

করতে বলেন এবং ইউক্রেনীয় দলীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, "কমরেডরা, কিছুক্ষণ আগে পৃথিবী থেকে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।"

হোয়াইট হাউস প্রকাশ্যে এমন ভান করেছিল যেন তারা ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার স্পুটনিককে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, এটি নাকি "বাতাসে একটি ছোটো বল" মাত্র। তার এক উপদেষ্টা মন্তব্য করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র "মহাকাশে বাস্কেটবল খেলতে যাবে না", আর আরেকজন স্পুটনিককে আখ্যা দিয়েছিলেন "একটা বোকা খেলনা" হিসেবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মস্কোর এই সাফল্যের গভীর তাৎপর্য তাদের সবাইকে আতঙ্কিত করেছিল। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের শিরোনামগুলোই তার প্রমাণ—*নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন* একে বলেছিল "একটি গুরুতর পরাজয়", আর *দ্য রিপোর্টার* ঘোষণা করেছিল "জাতীয় জরুরি অবস্থা"। সেই 'বাতাসে ভাসমান ছোটো বল' আসলে যুক্তরাষ্ট্রের অপরাজেয়তার আত্মবিশ্বাসকে চূর্ণ করে দিয়েছিল।

স্পুটনিক ১-এর বাইরের আবরণ ছিল অত্যন্ত পালিশ করা অ্যালুমিনিয়ামের, যা এতটাই উজ্জ্বলভাবে চকচক করত যে আমেরিকানরা খালি চোখেই এটিকে নিজেদের মাথার ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেখতে পেত—প্রতি নব্বই মিনিটে একবার, দিনের পর দিন, প্রায় তিন মাস ধরে—শেষ পর্যন্ত এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করে পুড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। প্রতিবার তার আবির্ভাব আমেরিকানদের মনে করিয়ে দিত যে সোভিয়েতরা প্রযুক্তিগত দৌড়ে তাদের ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ কেবল স্যাটেলাইটটিকে ঘিরে ছিল না; তার চেয়েও বড়ো আতঙ্ক ছিল সেই বিশাল রকেটটি নিয়ে, যা এটিকে মহাকাশে পৌঁছে দিয়েছিল। রাশিয়ানরা যাকে 'ইস্কুস্তভেনি স্পুটনিক জেমলি'—অর্থাৎ 'পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ'—বলে অভিহিত করছিল, সেটিই খেলাটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। স্পুটনিকের আগে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করত, তারা সোভিয়েত পারমাণবিক বোমাবাহী বিমান প্রতিহত করতে পারবে। কিন্তু স্পুটনিককে যে বস্তু মহাকাশে নিয়ে গিয়েছিল, সেটি আসলে ছিল একটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র—আর এখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সেটি সরাসরি আমেরিকার ভূখণ্ডে পৌঁছাতে সক্ষম।

ইতিহাসবিদ ওয়াল্টার ম্যাকডুগাল পরে আমেরিকান সরকার ও জনগণের ওপর স্পুটনিকের খবরের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "কমিউনিস্টরা কি প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে? তারা কি এক অসীম নতুন সীমান্তে অগ্রগামী হয়ে উঠছে? এক অর্থে কি তারা ভবিষ্যৎ দখল করে নিচ্ছে? ... এর মানে কী—এই ভবিষ্যৎ কি কমিউনিজমের?" এখন 'লাল'রা—অর্থাৎ কমিউনিস্টরা—আর শুধু খাটের নিচে লুকিয়ে নেই; তারা যেন মানুষের মাথার ওপর দিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্পুটনিক উৎক্ষেপণের কয়েক দিনের মধ্যেই হোয়াইট হাউসের জন্য প্রস্তুত করা একটি 'গোপনীয়' মেমো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের প্রশাসন বিষয়টিকে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখছিল। 'সোভিয়েত স্যাটেলাইটের প্রতিক্রিয়া' শিরোনামের সেই মেমোতে বলা হয়েছিল, "বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর জনমতের মধ্যে এই আশঙ্কা স্পষ্ট যে সামরিক শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে," এবং শেষে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, "সাধারণ মানুষের কাছে সোভিয়েতদের বিশ্বাসযোগ্যতা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে।" কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েতরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে স্পুটনিক ২ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে। এর ভেতরে ছিল লাইকা নামের একটি কুকুর—মহাকাশে যাওয়া প্রথম প্রাণী, যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে ফিরে আসা প্রথম প্রাণী হতে পারেনি।

এই চাপের মুখে আইজেনহাওয়ার দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি আমেরিকান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের অনুমোদন দেন। স্পুটনিক ১ মহাকাশে পৌঁছানোর প্রায় দুই মাস পর, ভ্যানগার্ড টেস্ট ভেহিকল থ্রি বহনকারী একটি রকেট কেপ ক্যানাভেরাল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। কিন্তু সেটি মাত্র প্রায় এক মিটার ওপরে উঠেই আবার মাটিতে আছড়ে পড়ে বিস্ফোরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটনার সময়কার গোপনীয়তার বিপরীতে, এখানে সংবাদমাধ্যমকে আগেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ঘটনাটি ধারণ করার জন্য। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই ব্যর্থতার দৃশ্য সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়। গণমাধ্যম তখন 'কাপুটনিক' (Kaputnik) ও 'ফ্লপনিক' (Flopnik)-এর মতো বিদ্রূপাত্মক শিরোনামে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু করে। পরিস্থিতিকে আরও লজ্জাজনক করে তুলতে, সোভিয়েতরা তাদের তথাকথিত 'অনগ্রসর দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা কর্মসূচি'র আওতায় যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্যের প্রস্তাব পর্যন্ত দেয়।

আইজেনহাওয়ার এতে মোটেও সন্তুষ্ট হননি। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ কর্মসূচির বার্ষিক বাজেট যেখানে আগে প্রায় ৮৯ মিলিয়ন ডলার ছিল, সেখানে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০১ মিলিয়ন ডলারে। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারিতে ওয়ের্নর ভন ব্রাউনের নকশা করা জুনো-১ রকেট সফলভাবে মার্কিন এক্সপ্লোরার-১ স্যাটেলাইটকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। তবে ততক্ষণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতোমধ্যেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ 'প্রথম' অর্জন করে ফেলেছিল। এখন উভয় পক্ষই পরবর্তী সাফল্যের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

এরপরের কয়েক বছরে দুই পক্ষই কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করে, কিন্তু স্পুটনিক ১-এর মতো যুগান্তকারী কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট

CamScanner

আইজেনহাওয়ারের রেকর্ড করা ক্রিসমাস বার্তা একটি মার্কিন স্যাটেলাইট থেকে সম্প্রচারিত হয়—এটাই ছিল মহাকাশ থেকে মানুষের কণ্ঠস্বরের প্রথম সম্প্রচার। কয়েক সপ্তাহ পর সোভিয়েত ইউনিয়নের লুনা-১ প্রোব তার নির্ধারিত লক্ষ্য চাঁদে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে তার পাশ দিয়ে চলে যায় এবং পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। এটিও ছিল একটি 'প্রথম', যদিও সম্পূর্ণভাবে দুর্ঘটনাবশত।

এরপর ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে সোভিয়েতরা আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাসে আঘাত হানে, যখন লুনা-২ চাঁদের পৃষ্ঠে পৌঁছানো প্রথম মহাকাশযানে পরিণত হয়। এটি ছিল একটি 'হার্ড ল্যান্ডিং'—বৈজ্ঞানিক ভাষায় যা মূলত একটি বিধ্বস্ত অবতরণ বা ক্র্যাশ—তবু এটি তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল। মহাকাশযানটি চাঁদের বুকে রুপার প্যানেল ছড়িয়ে দেয়, যার ওপর সোভিয়েত প্রতীক খোদাই করা ছিল। সৌজন্যের নিদর্শন হিসেবে নিকিতা ক্রুশ্চেভ এর একটি প্রতিরূপ প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। একই বছরে লুনা-৩—আরেকটি কোরোলেভ নকশা—চাঁদের উলটো পিঠে পৌঁছে তার প্রথম ছবি পাঠায়। চাঁদের এই অদেখা দিকটি প্রায়ই সূর্যালোকে উদ্ভাসিত থাকে, কিন্তু বহু বছর পরে পিঙ্ক ফ্লয়েড তাদের বেস্ট-সেলিং এলপি অ্যালবামের নামকরণে এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতেই পেরেছিল।

১৯৬০ সালে আমেরিকানরা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য একটি টেলিভিশন ইনফ্রারেড অবজারভেশন স্যাটেলাইট—টায়রস (TIROS)—উৎক্ষেপণ করে। কয়েক দিনের মধ্যেই এটি মাদাগাস্কারের উপকূলে সৃষ্ট একটি ঘূর্ণিঝড় শনাক্ত ও ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়। এর মধ্য দিয়েই টায়রস আধুনিক বৈশ্বিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থার একটি প্রোটোটাইপে পরিণত হয়। যদিও এটি কেবল বড়ো আকারের আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারত, তবুও মস্কোকে অস্বস্তিতে ফেলবার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট ছিল।

সেই বছরের শেষের দিকে স্পুটনিক-৫ দুটি কুকুর—বেলকা ও স্ট্রেলকাকে—মহাকাশে নিয়ে যায় এবং সৌভাগ্যক্রমে তাদের জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে। কিছুদিন তারা সেলিব্রিটি হিসেবে আলোচনায় ছিল। এরপর স্ট্রেলকা জনজীবন থেকে অবসর নেয় এবং তার ছয়টি বাচ্চা হয়, যাদের একটির নাম ছিল পুশিনকা—রুশ ভাষায় যার অর্থ 'ফ্লাফি'। ক্রুশ্চেভ পরে স্মরণ করেছিলেন যে ১৯৬১ সালে মার্কিন ফার্স্ট লেডি জ্যাকুলিন কেনেডির সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি স্ট্রেলকার খোঁজ নিয়েছিলেন। উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে তিনি পুশিনকাকে সোভিয়েত পাসপোর্টসহ হোয়াইট হাউসে পাঠিয়ে দেন। প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, "মিসেস কেনেডি এবং আমি

বিশেষভাবে 'পুশিনকা'-কে পেয়ে আনন্দিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তার ফ্লাইটটি তার মায়ের ফ্লাইটের মতো নাটকীয় ছিল না, তবে এটি ছিল দীর্ঘ পথের যাত্রা এবং সে তা খুব ভালোভাবেই সামলেছে। আপনার ব্যস্ত জীবনে এসব বিষয় মনে রাখার জন্য আমরা দুজনেই কৃতজ্ঞ।" পুশিনকা এবং কেনেডি পরিবারের একটি কুকুর, চার্লি, একে অপরের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে, যার ফল হিসেবে চারটি বাচ্চার জন্ম হয়। জন এফ. কেনেডি মজা করে তাদের 'পাপনিকস' (pupniks) বলে ডাকতেন। স্নায়ুযুদ্ধের চরম উত্তেজনার মধ্যে এই ধরনের বিরল সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্তগুলো সত্যিই স্বস্তিদায়ক ছিল।

তবে জয়ের জন্য তখনো একটি মহাকাশ প্রতিযোগিতা বাকি ছিল। বেলকা ও স্ট্রেলকার জবাবে আমেরিকানরা সামনে আনে হ্যাম নামের একটি শিম্পাঞ্জিকে—যে ১৯৬১ সালের ৩১ জানুয়ারি মহাকাশে পাঠানো প্রথম হোমিনিড বা নরবানরে পরিণত হয়। কিন্তু হ্যামকে খুব কম মানুষই মনে রেখেছে, কারণ মহাকাশে পাঠানো দ্বিতীয় হোমিনিডটিই হয়ে ওঠেন ইতিহাসের প্রথম মানুষ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমেরিকানরা তাদের প্রকল্পের নাম রেখেছিল 'ম্যান ইন স্পেস সুনেস্ট' (Man in Space Soonest), সংক্ষেপে MISS—আর সত্যিই তারা সেই সুযোগটি মিস করেছিল।

১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল সিনিয়র লেফটেন্যান্ট ইউরি আলেক্সেয়েভিচ গ্যাগারিন ভস্তক-১ রকেটের দিকে এগিয়ে যান। লঞ্চ প্যাডে নিয়ে যাওয়া গাড়িটি তিনি ডান পাশের পেছনের চাকায় প্রস্রাব করার জন্য থামান—একটি কাজ যা আজও রাশিয়ান কসমোনটরা তাকে সম্মান জানাতে প্রতীকীভাবে অনুসরণ করে থাকেন। (নারী ক্রু সদস্যরা এ ক্ষেত্রে বোতল থেকে তরল ছিটিয়ে দেন।) এরপর গ্যাগারিন ক্যাপসুলে ওঠেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। কোনো কাউন্টডাউন ছিল না—সের্গেই কোরোলেভ এগুলোকে আমেরিকান রীতি বলে মনে করতেন। মস্কো সময় সকাল ৯টা ৭ মিনিটে শুধু একটি বোতাম টিপে দেওয়া হয়। গ্যাগারিন চিৎকার করে ওঠেন, "পোয়েখালি!"—অর্থাৎ, "চলো যাই!"—এবং তিনি ছুটে যান আকাশে, পৃথিবীর কঠোর বন্ধন ছিঁড়ে প্রবেশ করেন সেই স্থানে, যাকে কবি ও পাইলট জন গিলেস্পি ম্যাগি বলেছিলেন "মহাকাশের উচ্চ, অনধিকার প্রবেশ্য পবিত্রতা।" সেই মুহূর্তে তিনি মানব ইতিহাসে নিজের নাম চিরস্থায়ী করে ফেলেন।

এই ফ্লাইটটি মোট ১০৮ মিনিট স্থায়ী হয় এবং গ্যাগারিন পৃথিবীকে একবারের একটু বেশি প্রদক্ষিণ করেন। পুনঃপ্রবেশের সময়, প্রায় সাত কিলোমিটার উচ্চতায় তিনি ক্যাপসুল থেকে ইজেক্ট করেন এবং ভলগা অঞ্চলের একটি গ্রামীণ এলাকায় অবতরণ করেন। কয়েক মিনিট পর আন্না তাখতারোভা নামের এক নারী এবং তার পাঁচ বছর

বয়সি নাতনি, যারা তখন আলু রোপণ করছিলেন, দেখতে পান উজ্জ্বল কমলা রঙের স্যুট ও সাদা হেলমেট পরা এক মানুষ তাদের দিকে হেঁটে আসছে। পরে গ্যাগারিন স্মরণ করেছিলেন, "যখন তারা আমাকে স্পেস স্যুট পরা অবস্থায়, পাশে প্যারাসুট টানতে টানতে আসতে দেখল, তারা ভয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। আমি তখন বললাম, ভয় পেও না, আমি তোমাদের মতোই একজন সোভিয়েত নাগরিক—আমি শুধু মহাকাশ থেকে নেমে এসেছি, আর এখন মস্কোতে ফোন করার জন্য একটি টেলিফোন খুঁজছি!"

গ্যাগারিন রাতারাতি বিশ্বব্যাপী সেলিব্রিটি, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের হিরো' এবং স্নায়ুযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট ব্লকের জন্য এক বিশাল প্রচারণামূলক সম্পদে পরিণত হন। তখন তার বয়স মাত্র সাতাশ বছর। তিনি ছিলেন আকর্ষণীয়, সহজে আপন করে নেওয়া যায় এমন মানুষ এবং সবসময় মুখে লেগে থাকত হাসি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি জন্মেছিলেন একটি ছোটো যৌথ খামারের কৃষক পরিবারে। সেখান থেকে উঠে এসে তিনি হন ফাইটার পাইলট, তারপর কসমোনট এবং শেষ পর্যন্ত মহাকাশে যাওয়া প্রথম মানুষ। পুঁজিবাদী পশ্চিমের ওপর সোভিয়েত ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য এর চেয়ে শক্তিশালী প্রতীক আর কী হতে পারত?

সোভিয়েত কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত প্রায় ২০০ জন ফাইটার পাইলটের মধ্য থেকে গ্যাগারিনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। উৎক্ষেপণের ঠিক আগে এই সংখ্যা কমিয়ে দুজনে নামানো হয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জার্মান তিতভ—দক্ষতা ও যোগ্যতায় গ্যাগারিনের সমান হলেও তার একটি 'দুর্বলতা' ছিল : তিনি এসেছিলেন একটি সচ্ছল, সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ক্রুশ্চেভ 'যৌথ খামার থেকে মহাকাশে'—এই গল্পটির প্রচারণামূলক মূল্য ভালোভাবেই বুঝতেন। তাই শেষ পর্যন্ত কৃষকের ছেলে গ্যাগারিনই ভস্তক-১-এ চেপে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে মহাকাশে পাড়ি জমান। রেড স্কোয়ারে বিজয় মিছিলে অংশ নেওয়ার আগে গ্যাগারিনের বাবা-মাকে অনুষ্ঠানে সাধারণ পোশাক পরতে বলা হয়েছিল—যাতে সেই গল্পটি আরও নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

আমেরিকায় ভোরের দিকে এই খবরটি ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দেশের সংবাদকক্ষগুলো মন্তব্যের জন্য নাসায় ফোন করতে শুরু করে। নাসার পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার জন 'শর্টি' পাওয়ারস ঘুম থেকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলায় বিরক্ত হয়ে এক রিপোর্টারের দিকে চিৎকার করে বলেন, "এসব কী হচ্ছে! আমরা তো সবাই এখানে ঘুমাচ্ছি!" এই মন্তব্য থেকেই জন্ম নেয় সেই বিখ্যাত শিরোনামটি—"সোভিয়েতরা মহাকাশে মানুষ পাঠিয়েছে। মুখপাত্র বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ঘুমাচ্ছে।"

এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি 'ওয়েক-আপ কল'—একটি তীব্র সতর্কবার্তা। মাত্র কয়েক মাস আগে, নিজের অভিষেক ভাষণে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা যেকোনো মূল্য দেব, যেকোনো বোঝা বহন করব, যেকোনো কষ্ট সহ্য করব, যেকোনো বন্ধুকে সমর্থন করব এবং যেকোনো শত্রুর বিরোধিতা করব—আমাদের স্বাধীনতার টিকে থাকা ও সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য।" গ্যাগারিনের ফ্লাইটের আগে নাসার জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ এই 'মূল্যের' অংশ ছিল না; কিন্তু এখন সেটিই বাস্তব হয়ে উঠল।

১৯৬১ সালের ৫ মে, গ্যাগারিনের অবতরণের ঠিক তিন সপ্তাহ পর, অ্যালান শেপার্ড ইতিহাসে প্রথম আমেরিকান এবং মহাকাশে ভ্রমণকারী দ্বিতীয় মানুষ হিসেবে নিজের নাম লেখান। তবে কেনেডি এখানেই থেমে থাকতে চাননি। তিনি ও ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে কেবল চাঁদ প্রদক্ষিণ করা বা একটি স্পেস স্টেশন নির্মাণ করা আমেরিকান প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও নেতৃত্ব প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়। সত্যিকারের প্রমাণ দিতে হলে আমেরিকানদের চাঁদের মাটিতে নামাতে হবে এবং সারা বিশ্বকে দেখাতে হবে যে তারাই এটি করেছে। সেই মাসেই কংগ্রেসে দেওয়া এক ভাষণে কেনেডি এই লক্ষ্য স্পষ্ট করে বলেন, "যদি আমরা কেবল অর্ধেক পথ যাই, অথবা অসুবিধার মুখে আমাদের লক্ষ্য ছোটো করে নিই, তবে আমার বিচারে আদৌ না যাওয়াই ভালো।"

তিনি এই উদ্যোগের সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের সম্পর্কও খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেন। কেনেডি বলেন, "বর্তমানে বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতা ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে, তাতে যদি আমরা জয়ী হতে চাই, তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে মহাকাশে ঘটে যাওয়া নাটকীয় সাফল্যগুলো—যেমনটি ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক করেছিল—মানুষের চিন্তাভাবনার ওপর এই অভিযানের গভীর প্রভাব আমাদের বুঝতে সাহায্য করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি, এই জাতির উচিত এই লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা—এই দশক শেষ হওয়ার আগেই চাঁদে মানুষ অবতরণ করানো এবং তাকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা। এটি কেবল একজন মানুষের চাঁদে যাওয়া হবে না; যদি আমরা এই সিদ্ধান্তটি দৃঢ়ভাবে নিই, তবে এটি হবে একটি পুরো জাতির যাত্রা।"

পরের বছর টেক্সাসের হিউস্টনে দেওয়া তার বিখ্যাত 'আমরা চাঁদে যেতে চাই' (We choose to go to the Moon) বক্তৃতায় সেই সময়ের চেতনাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল : "আমরা এই দশকে চাঁদে যেতে চাই এবং অন্যান্য কাজগুলো করতে চাই—এই কারণে নয় যে সেগুলো সহজ, বরং এই কারণে যে সেগুলো কঠিন।" এই ঘোষণার পর ওয়ের্নর ভন ব্রাউন পুরোদমে কাজে নেমে পড়েন।

অন্যদিকে, সের্গেই কোরোলেভও ইতোমধ্যেই ব্যস্ত ছিলেন। স্পুটনিক ১-সহ অসংখ্য সাফল্যের পরও সোভিয়েত রকেট কর্মসূচির প্রধান নকশাকার হিসেবে তার ভূমিকা দীর্ঘদিন জনসাধারণের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে একটি রুটিন অস্ত্রোপচারের সময় জটিলতার কারণে তার মৃত্যুর পরেই কেবল তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়। চিকিৎসকেরা শ্বাসনালি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গুলাগে বন্দিজীবনের সময় তার গলা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে সেটি সম্ভব হয়নি। কোরোলেভকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় এবং তার ছাই ক্রেমলিনের দেওয়ালে স্থাপন করা হয়। ইউরি গ্যাগারিন সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শোকবার্তা পাঠ করেছিলেন।

দুই বছর পর, তিনিও পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। মহাকাশে নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি একবার বলেছিলেন, "আমি সারাজীবন মহাকাশে উড়ে বেড়াতে পারতাম।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত উড়ানই তার জীবন কেড়ে নেয়। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে, মিগ-১৫ ফাইটার জেটের পরীক্ষামূলক পাইলট হিসেবে উড়তে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনায় নিহত হন। হাজার হাজার মানুষ রেড স্কয়ারে তার শেষকৃত্যে অংশ নেয় এবং তার ছাই কোরোলেভের সমাধির পাশেই সমাহিত করা হয়।

কেনেডির ঐতিহাসিক বক্তৃতা এবং কোরোলেভের মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের 'প্রথম'-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখে—যার প্রতিটিতেই রাশিয়ান প্রকৌশল দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট ছিল। ১৯৬২ সালে সম্পন্ন হয় প্রথম দ্বৈত-ক্রু মহাকাশযাত্রা। ১৯৬৩ সালে ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা মহাকাশে যাওয়া প্রথম নারী হন। ১৯৬৫ সালে আলেক্সি লিওনভ ইতিহাসের প্রথম স্পেসওয়াক বা মহাকাশে হাঁটা সম্পন্ন করেন। তবে লিওনভের এই অভিযান ছিল অত্যন্ত নাটকীয়। মহাকাশযানের বাইরে থাকার সময় তার স্পেসস্যুট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়, ফলে ক্যাপসুলে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের শ্বাসরুদ্ধকর উৎকণ্ঠার পর তিনি স্যুট থেকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন বের করে দেন, যাতে এক মিটার চওড়া এয়ারলকের ভেতর দিয়ে নিজেকে ঢোকাতে পারেন। এক বছর পর, লুনা-৯ চাঁদে প্রথম সফল 'সফট ল্যান্ডিং' করে এবং চাঁদের পৃষ্ঠের প্রথম ক্লোজ-আপ ছবি পৃথিবীতে পাঠায়।

কেনেডির ১৯৬১ সালের বক্তৃতার জবাবে নিকিতা ক্রুশ্চেভ কখনোই প্রকাশ্যে নিশ্চিত বা অস্বীকার করেননি যে মস্কো চাঁদের দৌড়ে আছে কি না। কিন্তু গোপনে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন—আমেরিকানরা যদি বলে থাকে যে তারা "এই দশক শেষ হওয়ার আগেই" চাঁদে যাবে, তবে সোভিয়েতদের অবশ্যই তাদের আগেই সেখানে পৌঁছাতে হবে। লক্ষ্য নির্ধারিত হয় ১৯৬৮ সাল। তবে সের্গেই কোরোলেভ—তাদের প্রধান নকশাকার ও প্রেরণার উৎস—ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

তার মৃত্যুর পর একের পর এক প্রযুক্তিগত বিপর্যয় দেখা দিতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ছিল ১৯৬৭ সালে সোয়ুজ-১ মিশনে ভ্লাদিমির কোমারভের মৃত্যু। নানা সমস্যার কারণে মিশনটি বাতিল করা হলেও, অবতরণের সময় প্রধান প্যারাসুটটি কাজ করেনি এবং রিজার্ভ প্যারাসুটটি প্যাঁচিয়ে যায়। ফলস্বরূপ, সোয়ুজ-১ প্রচণ্ড গতিতে মাটিতে আছড়ে পড়ে এবং বিস্ফোরিত হয়। এই ত্রুটিগুলো চিহ্নিত ও সংশোধন করতে প্রকৌশলীদের প্রায় আঠারো মাস সময় লেগেছিল; তার আগে কোনো মানবচালিত মিশন আবার উড়তে পারেনি।

নাসাও নিজেদের ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হয়। ১৯৬৭ সালে একটি স্থলভিত্তিক পরীক্ষার সময় অ্যাপোলো-১ ক্যাপসুলে আগুন লাগার ফলে ভার্জিল গ্রিসম, এড হোয়াইট ও রজার চ্যাফি প্রাণ হারান। সেখানেও শনাক্ত করা ত্রুটিগুলো ঠিক করতে প্রায় দুই বছর লেগে যায়।

তবুও, প্রথম মানবচালিত চন্দ্রাভিযানের দৌড় থেমে থাকেনি। সোভিয়েতরা জানত যে নাসা তাদের স্যাটার্ন-৫ রকেট ও লুনার ল্যান্ডিং ভেহিকল নিয়ে গুরুতর সমস্যায় পড়েছে এবং তারা ধরে নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত সময়সীমা মিস করবে ও ১৯৭০ সালের আগে চাঁদে নামার চেষ্টা করবে না। নাসার ভেতরেও অনেকেই একই আশঙ্কা করতেন। অন্যদিকে, আমেরিকানরা জানত না যে কোরোলেভের মৃত্যুর পর সোভিয়েত কর্মসূচি কতটা বিপাকে পড়েছে। তাদের আশঙ্কা ছিল, সোভিয়েতরা ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'লঞ্চ উইন্ডো' কাজে লাগাবে—যার পর ১৯৬৯ সালের অনেকটা সময় চাঁদের ফ্লাইটের জন্য অনুকূল অবস্থান আর থাকবে না।

লঞ্চ উইন্ডোটি এল এবং চলে গেল—সোভিয়েতদের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ ছাড়াই। কিন্তু সেই একই মাসে তিনজন আমেরিকান ইতিহাস গড়েন চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে। অ্যাপোলো-৮ মিশনে ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান, জিম লাভেল ও বিল অ্যান্ডার্স চাঁদকে দশবার প্রদক্ষিণ করেন। এই যাত্রার সময় অ্যান্ডার্স তোলেন বিখ্যাত 'আর্থরাইজ'-পৃথিবী উদয়ের ছবি। পরে তিনি বলেছিলেন, "আমরা চাঁদ আবিষ্কার করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আবিষ্কার করেছি পৃথিবীকে।" শূন্যে ভেসে থাকা আমাদের নীল গ্রহটি, তার পাতলা বায়ুমণ্ডল দিয়ে নিজেকে রক্ষা করছে—এই দৃশ্যটি যারা দেখেছিলেন, তাদের অনেকের ওপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলেছিল। অনেকে মনে করেন, এটি নবীন পরিবেশবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ক্রিসমাস ইভে, পৃথিবীতে ফেরার আগে, এই তিন নভোচারী একটি সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচারে অংশ নেন এবং বাইবেলের জেনেসিস গ্রন্থ থেকে পর্যায়ক্রমে

পাঠ করেন : "এবং ঈশ্বর বললেন, আলো হোক; এবং আলো হলো এবং ঈশ্বর আলো দেখলেন যে তা ভালো; এবং ঈশ্বর আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন।"

বিভিন্ন সূত্রের মতে, এই সম্প্রচারটি বিশ্বজুড়ে প্রায় এক বিলিয়ন—অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ—মানুষ দেখেছিল। সংখ্যাটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এমন এক বিস্ময়কর ঘটনার জন্য এটি ছিল বিপুল দর্শকসংখ্যা। মানুষ চাঁদে গিয়ে ঘুরে এসেছে। এবার সামনে ছিল মূল লক্ষ্য। সময় দ্রুত এগিয়ে চলছিল।

"টি মাইনাস দশ, নয়, আট, সাত..." দিনটি ছিল ১৬ জুলাই ১৯৬৯। অ্যাপোলো-১১-এর কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে। কোরোলেভ ঠিকই বলেছিলেন—কাউন্টডাউন ছিল একেবারেই আমেরিকান ঢং। কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, একটি আমেরিকান-জার্মান ঢং। ১৯২৯ সালে ফ্রিট্জ ল্যাং-এর চলচ্চিত্র *ফ্রাউ ইম মন্ড* (চাঁদে নারী)-এ উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের কাউন্টডাউন দেখানো হয়েছিল—"নখ ১০ সেকুন্ডেন" ("আরও দশ সেকেন্ড") থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত "জেটজট!" ("এখন!") পর্যন্ত। অনুমান করা কঠিন নয় ছবিটি কে দেখেছিলেন—তরুণ ওয়ের্নহার ভন ব্রাউন, যিনি এই ধারণাটি দারুণ পছন্দ করেছিলেন। টেলিভিশনের যুগে আমেরিকানদের নাটকীয়তা ও জাঁকজমকের অনুভূতির সঙ্গে এটি চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছিল।

মানুষবাহী রকেট উৎক্ষেপণের মতো এতটা নাটকীয় দৃশ্য খুব কমই আছে। মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন 'বাজ' অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স যখন কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চ কমপ্লেক্সে উৎক্ষেপণের মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তারা ঠিক কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন—তা খানিকটা বোঝার জন্য স্পেস শাটলের নভোচারী মাইক ম্যাসিমিনোর স্মৃতিকথার দিকে তাকানো যেতে পারে। তিনি সেই মুহূর্তটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"উৎক্ষেপণের ছয় সেকেন্ড আগে আপনি প্রধান ইঞ্জিনগুলো জ্বলে ওঠার গভীর গুঞ্জন অনুভব করবেন। পুরো কাঠামোটি এক মুহূর্তের জন্য সামনের দিকে হেলে পড়ে। এরপর শূন্য সেকেন্ডে সেটি আবার সোজা হয়ে যায়, আর ঠিক তখনই সলিড রকেট বুস্টারগুলো জ্বলে ওঠে—এবং আপনি যাত্রা শুরু করেন। তখন আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে আপনি নড়ছেন। এটা এমন কিছু নয় যে মনে হবে, 'ওহ, আমরা কি রওনা দিয়েছি?' না, এটা একেবারে ধড়াম!—আর তারপর আপনি আর সেখানে নেই। আমার মনে হয়েছিল, যেন কোনো বিশাল সায়েন্স ফিকশন দানব নিচে নেমে এসে আমার বুক চেপে ধরে আমাকে আকাশের দিকে, আরও ওপরে, আরও ওপরে ছুড়ে মারছে। পুরো অভিজ্ঞতাটিকে সংক্ষেপে বলা যায় 'নিয়ন্ত্রিত সহিংসতা'—মানুষের তৈরি শক্তি ও গতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী।"

স্যাটার্ন-৫ ছিল এযাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী উৎক্ষেপণ যান। এই বিশাল রকেটটির ছিল তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপের ইঞ্জিন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১১১ মিটার লম্বা রকেটটি মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে শুরু করে এবং প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮,০০০ কিলোগ্রাম জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলতে থাকে। লঞ্চ টাওয়ার অতিক্রম করার আগেই এর গতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে যায়। উৎক্ষেপণের প্রায় আড়াই মিনিট পর, ৬৮ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে প্রথম ধাপের জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। তখন সেটি খসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ধাপটি তার ইঞ্জিন চালু করে।

এর ছয় মিনিট পর স্যাটার্ন-৫ প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে যায় এবং কক্ষপথের গতির দিকে দ্রুত ত্বরান্বিত হতে থাকে। দ্বিতীয় ধাপটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় ধাপ দায়িত্ব নেয় এবং নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন 'বাজ' অলড্রিনকে ঘণ্টায় প্রায় ২৮,০০০ কিলোমিটার গতিতে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে বহির্মুখী যাত্রার বাকি অংশে সময় লেগেছিল তিন দিনের একটু বেশি। এই সময়ে তারা পথ ঠিক আছে কি না তা যাচাই করতে ব্যবহার করেছিলেন দুটি যন্ত্র—একটি ছিল গ্যালিলিওর যুগ থেকে পরিচিত টেলিস্কোপ, আর অন্যটি ছিল নাবিকদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যবহৃত সাক্সট্যান্ট। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কমান্ড মডিউলের কম্পিউটারটি আধুনিক একটি পকেট ক্যালকুলেটরের চেয়েও কম শক্তিশালী ছিল।

চাঁদে অবতরণের মুহূর্তটি ছিল ভীষণ রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপূর্ণ। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যখন 'ঈগল' লুনার মডিউলটি চাঁদের পাথরে ভরা পৃষ্ঠে নামিয়ে আনেন, তখন তাদের ট্যাঙ্কে মাত্র পনেরো সেকেন্ডের জ্বালানি অবশিষ্ট ছিল। অবতরণের চার ঘণ্টা পর আর্মস্ট্রং 'সি অব ট্র্যাঙ্কুইলিটি' বা প্রশান্তির সাগরের বুকে তার ছোট্ট পদক্ষেপ রাখেন—যা মানব ইতিহাসে এক বিশাল লাফ হিসেবে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

২১ জুলাই ১৯৬৯—এই তারিখটি মানবজাতির ইতিহাসের অন্যতম অবিশ্বাস্য মুহূর্ত হিসেবে সুদূর ভবিষ্যতেও স্মরণ করা হবে, বহু যুদ্ধ, বিপ্লব, শেয়ারবাজার ধস কিংবা মহামারির স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার অনেক পরেও। নীল আর্মস্ট্রং নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেও জানতেন যে তিনি একা নন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ইউরি গ্যাগারিন, কনস্তানতিন সোলকোভস্কি, রবার্ট গডার্ড, হারমান ওবার্থ, সের্গেই কোরোলেভ, ভার্নার ভন ব্রাউন এবং তাদেরও আগের যুগের মহান বিজ্ঞানীদের কাঁধের ওপর।

শীতল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই সাফল্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কেও আর্মস্ট্রং পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছিলাম যে এটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিন লাখ বা চার লাখ মানুষের কাজের চূড়ান্ত পরিণতি এবং পুরো জাতির আশা ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি মূলত এই ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছিল।"

এই বিশাল সাফল্যের পেছনে ছিলেন অসংখ্য নাম না-জানা নায়ক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অসাধারণ গণিতবিদ ক্যাথরিন জনসন, যিনি অ্যাপোলো ১১-এর চাঁদে অবতরণের জন্য নিখুঁত ট্র্যাজেক্টোরি বা গতিপথ গণনা করেছিলেন। ছিলেন মার্গারেট হ্যামিল্টন, যিনি 'সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং' শব্দগুচ্ছটির প্রবর্তন করেন এবং কমান্ড মডিউল ও লুনার মডিউল নিয়ন্ত্রণকারী প্রোগ্রামগুলো লিখেছিলেন।

আর্মস্ট্রং আরেক অর্থেও জানতেন যে তিনি একা নন—সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনো প্রতিযোগিতায় ছিল। অন্তত একটি যন্ত্র চাঁদের পৃষ্ঠে পাঠিয়ে সেখান থেকে নমুনা ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা হিসেবে, অ্যাপোলো ১১-এর উৎক্ষেপণের কয়েক দিন আগেই তারা একটি মনুষ্যবিহীন যান উৎক্ষেপণ করেছিল।

তবে কয়েক মাস ধরেই সোভিয়েত নেতৃত্ব জানত যে চাঁদে প্রথম মানুষ নামানোর তাদের স্বপ্ন প্রায় নিশ্চিতভাবেই শেষ হয়ে গেছে—বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা আমেরিকানদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, এমনকি সেই বছরের দুটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের আগেই, যা তাদের স্যাটার্ন-৫-এর প্রতিদ্বন্দ্বী বিশাল এন-১ (N1) রকেটকে ঘিরে ঘটেছিল।

প্রথম বিপর্যয়টি ঘটে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সোভিয়েত কাজাখস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম লঞ্চ সেন্টার থেকে রকেটটি এবং তার সঙ্গে থাকা মনুষ্যবিহীন ল্যান্ডিং মডিউল উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি প্রায় দুই মিনিট ওপরে উঠেছিল, ১৪ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে গতি কমে যায় এবং এরপর উৎক্ষেপণ স্থান থেকে কিছুটা দূরে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপর জুলাইয়ের শুরুতে, অ্যাপোলো ১১-এর উৎক্ষেপণের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে, সোভিয়েতরা আবার চেষ্টা করে। মধ্যম সারির কর্মকর্তারা সম্ভাব্য একাধিক সমস্যার বিষয়ে শীর্ষ নেতাদের সতর্ক করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের চুপ থাকতে বলা হয়। মস্কোর পলিটব্যুরোকেও শোনানো হয়েছিল ঠিক সেটুকুই, যা এর জ্যেষ্ঠ সদস্যরা শুনতে আগ্রহী ছিলেন।

এইবার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রকেটটি মাটি থেকে মাত্র ১০০ মিটার ওপরে উঠেই যেন মাঝ আকাশে থমকে যায়। এরপর সেটি কাত হয়ে নিচে আছড়ে

পড়ে এবং ভয়ংকর বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়। লঞ্চ কমপ্লেক্সের বেশিরভাগ অংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, আর প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে থাকা টেকনিশিয়ানদের আবাসিক এলাকার জানালাগুলো পর্যন্ত বিস্ফোরণের অভিঘাতে উড়ে যায়।

এমনকি যদি অ্যাপোলো ১১ মিশন ব্যর্থও হতো, তাতেও ইউএসএসআর কোনো বাস্তব সুবিধা অর্জন করতে পারত না। এন-১ রকেটের লঞ্চ প্যাড পুনর্নির্মাণ করতেই তাদের এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যেত। তবে তাদের হাতে তখনো ছিল প্রোটন-কে (Proton K) রকেট এবং একটি লুনা মডিউল, যা চাঁদে অবতরণ করতে এবং সেখান থেকে আবার উড্ডয়ন করতে সক্ষম ছিল। এতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, চাঁদের মাটি সংগ্রহের জন্য একটি ড্রিলিং কিট এবং একটি ক্যামেরা সংযোজন করা সম্ভব ছিল। চাইলে তারা অ্যাপোলো ১১-এর আগেই এটি উৎক্ষেপণ করে চাঁদ থেকে তথ্য ও নমুনা ফিরিয়ে আনতে পারত। এটি হয়তো চাঁদে প্রথম মানুষের অবতরণের মতো ঐতিহাসিক 'হোম রান' হতো না, কিন্তু আমেরিকানদের আসন্ন সাফল্যের প্রভাব কিছুটা হলেও ম্লান করে দিতে পারত।

এই কৌশলের অংশ হিসেবেই কেপ কেনেডি থেকে অ্যাপোলো ১১ উৎক্ষেপণের ঠিক তিন দিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাইকোনুর থেকে লুনা-১৫ উৎক্ষেপণ করে। আমেরিকানরা তখন জানত না এই উৎক্ষেপণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, কিন্তু সোভিয়েতরা জানত যে প্রতিযোগিতা এখনো চলছে। যাত্রাপথে লুনা-১৫ একাধিক প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে সময় নষ্ট করে। টেকনিশিয়ানরা বুঝতে পারেন, এর নির্ধারিত অবতরণ-গতিপথ এটিকে দুর্গম ও বিপজ্জনক ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। দু'বার তারা অবতরণ প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেয়, আর সেই ফাঁকেই অ্যাপোলো ১১ চাঁদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যখন শেষ পর্যন্ত লুনা-১৫ অবতরণ করানোর মতো আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন, ততক্ষণে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন তাদের মুনওয়াক বা চাঁদে হাঁটা সম্পন্ন করেছেন। তারা ২২ কিলোগ্রাম চাঁদের মাটি ও পাথর সংগ্রহ করেছেন, আমেরিকান পতাকা স্থাপন করেছেন, আনুমানিক ৬৫ কোটিরও বেশি মানুষের সামনে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং নিরাপদে তাদের মহাকাশযানে ফিরে এসেছেন। অ্যাপোলো ১১ চাঁদ থেকে উড্ডয়নের মাত্র দুই ঘণ্টা আগে, লুনা-১৫—যা তখন চাঁদের কক্ষপথে তার বাহান্নতম প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করছিল—অবতরণ শুরু করে।

এই নাটকীয় মুহূর্তগুলোতে ব্রিটেনের জড্রেল ব্যাংক অবজারভেটরির বিজ্ঞানীরা একটি রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে উভয় মিশনের ট্রান্সমিশন পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মস্কো থেকে ছড়ানো গুজব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, লুনা-১৫ হয়তো অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জড্রেল ব্যাংকে সংরক্ষিত রেকর্ডিংগুলোতে সেই মুহূর্তটি স্পষ্ট শোনা যায়, যখন এর উদ্দেশ্য আর সন্দেহের ঊর্ধ্বে চলে যায়। চিরাচরিত ব্রিটিশ ভঙ্গিতে একজন বিজ্ঞানী উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠেন, "এটি নামছে! ... আমি বলছি, এটি সত্যিই সর্বোচ্চ পর্যায়ের নাটক।"

কিন্তু বাস্তবে সেটি অবতরণ নয়, প্রায় সরাসরি বিধ্বস্ত হওয়াই ছিল। যানটি সঠিকভাবে নয়, একটি কোণে হেলে নামতে থাকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এর শেষ ট্রান্সমিশনের সময় লুনা-১৫ চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার ওপরে ছিল। সম্ভবত ঘণ্টায় প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার গতিতে এটি কোনো পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে। দুর্ঘটনাস্থলটি ছিল 'সি অব ক্রাইসিসেস' বা সংকটের সাগর এলাকায়। এর অল্প সময় পরই আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চাঁদ থেকে উড্ডয়ন করেন। তারা রেখে আসেন একটি স্মারক মেডেল, যেখানে ইউরি গ্যাগারিনসহ মহাকাশ প্রতিযোগিতায় প্রাণ হারানো অন্যান্য কসমোনট ও নভোচারীদের নাম খোদাই করা ছিল।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি চাঁদে অবতরণের জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে ঠিক ২,৯৮২ দিন পার হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের ১৬১ দিন আগেই তারা লক্ষ্য পূরণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

প্রতিযোগিতার এখানেই ইতি ঘটে। আমেরিকানরা জিতে যায়, আর সোভিয়েতরা তখন এমন ভান করতে শুরু করে যেন এটি আদৌ কোনো প্রতিযোগিতাই ছিল না। ক্রেমলিন ব্যঙ্গভরে দাবি করে যে শ্রমজীবী মানুষের চ্যাম্পিয়ন ইউএসএসআর কখনোই জনগণের অর্থ এমন ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক 'পার্শ্বপ্রদর্শনীতে' নষ্ট করত না। পিপলস রিপাবলিক অব অ্যাঙ্গোলা, রিপাবলিক অব কিউবা এবং ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনামের মতো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মিত্র রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশে রেডিও মস্কো প্রচার করেছিল, অ্যাপোলো ১১ নাকি ছিল 'উন্নয়নশীল বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের কাছ থেকে লুট করা সম্পদের নিকৃষ্ট অপচয়'।

স্পষ্ট বিপরীত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, পশ্চিমা বিশ্বের কিছু বিশ্বাসপ্রবণ মহলে এই বক্তব্য ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল—সোভিয়েত যুগের অবসান পর্যন্ত।

এর অবসান ঘটে গ্লাসনস্ত, অর্থাৎ উন্মুক্ততার যুগ শুরু হওয়ার পর। তখন আমেরিকান অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দলকে মস্কো এভিয়েশন ইনস্টিটিউটে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের সেই লুনার ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট দেখানো হয়, যা সোভিয়েতরা

কসমোনটদের সবার আগে চাঁদে পাঠানোর লক্ষ্যে তৈরি করেছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রথম পাতায় শিরোনাম করে লেখে : "এখন সোভিয়েতরা স্বীকার করল চন্দ্র প্রতিযোগিতা।" মজার ব্যাপার হলো, ১৯৬৪ সালেই একই পত্রিকা লিখেছিল—"এখনো সময় আছে, যা এক জাতির দৌড়ে পরিণত হয়েছে তা বন্ধ করার।"

১৯৬৯ সালের পর সোভিয়েত নেতৃত্ব ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত নয়। কসমোনট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাতিল করা হয়, তবে রকেট প্রকৌশলীদের কাজ চালু রাখা হয়। ১৯৭০-এর দশকে চাঁদে অবতরণের চেষ্টা চালিয়ে গেলে কেবল এটিই প্রমাণ হতো যে তারা সব সময় পিছিয়ে ছিল এবং তাদের প্রযুক্তি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। প্রাভদার সাংবাদিক ইয়ারোস্লাভ গোলভানভ পরে মন্তব্য করেছিলেন, "শুরুতে গোপনীয়তা প্রয়োজন ছিল, যাতে কেউ আমাদের টপকে যেতে না পারে। কিন্তু পরে, যখন তারা আমাদের টপকে গেল, তখন গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়েছিল যাতে কেউ জানতে না পারে যে আমাদের টপকে যাওয়া হয়েছে।"

আমেরিকানরা মোট ছয়টি মনুষ্যবাহী মিশনে বারো জন নভোচারীকে চাঁদের পৃষ্ঠে নামিয়েছিল। অ্যাপোলো ১৭ ছিল শেষ মিশন, যা ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে পৃথিবীতে ফিরে আসে। তারপর থেকে আর কেউ চাঁদে যাননি। পুরো মহাকাশ কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার থেকে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছিল। একই সময়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছিল পুরোদমে, বড়ো বড়ো শহরে দাঙ্গা হচ্ছিল, আর ধীরে ধীরে চাঁদে অবতরণের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহও কমে আসছিল।

এরপর আমেরিকান ও সোভিয়েত নেতারা—নিক্সন ও ব্রেজনেভ—মহাকাশ বাজেট কমিয়ে দেন। শীতল যুদ্ধের সাময়িক উষ্ণতার সময় দুই দেশ যৌথভাবে একটি অ্যাপোলো মহাকাশযানের সঙ্গে একটি সয়ুজ ক্রাফ্ট যুক্ত করার পরিকল্পনা করে। ১৯৭৫ সালে সেই ঐতিহাসিক মিলন ঘটে। দুই দেশের ক্রু একে অপরের মহাকাশযানে প্রবেশ করে উপহার বিনিময় করে, এমন একটি এয়ারলকের মাধ্যমে, যা শতাব্দীর শুরুতে সোলকোভস্কির নকশা করা এয়ারলক থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। এরপর উভয় দেশই তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে স্পেস শাটল ও কক্ষপথে স্থায়ী স্পেস স্টেশন নির্মাণের দিকে।

আর চাঁদ? সেটি তো এখনো সেখানেই আছে। সেখানে এখনো পড়ে আছে আমেরিকানদের রেখে যাওয়া তিনটি যান—মুন বাগি—এ ছাড়া চাঁদের মাটি ও পাথরের নমুনা সংগ্রহের জন্য জায়গা করে দিতে ফেলে আসা নানা যন্ত্রপাতি এবং টেলিভিশন সরঞ্জাম। হয়তো একদিন সেগুলো চাঁদের কোনো জাদুঘরের অংশ হবে।

পৃষ্ঠজুড়ে ছড়িয়ে থাকা আরও অসংখ্য বস্তুসহ। সেখানে কয়েকটি মার্কিন পতাকাও রয়েছে, আর আছে অ্যাপোলো ১১ মিশনের একটি ফলক, যাতে লেখা আছে : "এখানে পৃথিবী গ্রহের মানুষ প্রথম চাঁদে পা রেখেছিল। জুলাই ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। আমরা সমস্ত মানবজাতির জন্য শান্তির উদ্দেশ্যে এসেছি।"

সেখানে একটি হাতুড়ি ও একটি পালকও পড়ে আছে। অ্যাপোলো ১৫-এর নভোচারী ডেভিড স্কট ষোড়শ শতাব্দীর গ্যালিলিওর সেই বিখ্যাত পরীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, যেখানে ইতালীয় বিজ্ঞানী পিসার হেলানো টাওয়ার থেকে ভিন্ন ভরের দুটি বস্তু ফেলেছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে। স্কট বলেছিলেন, গ্যালিলিও চাঁদে অবতরণের পথপ্রদর্শকদের একজন। তিনি যখন চাঁদের পৃষ্ঠে একসঙ্গে একটি পালক ও একটি হাতুড়ি ফেললেন, টেলিভিশনের দর্শকেরা দেখলেন—দুটিই একই গতিতে নিচে পড়ছে। পালকটি এসেছিল 'ব্যাগিন' নামের একটি বাজপাখির পালক থেকে, যা এয়ার ফোর্স একাডেমির মাসকট।

আর সেখানে পড়ে আছে দুটি গলফ বল। অ্যাপোলো ১৪ মিশনের সময় অ্যালান শেপার্ড একটি গলফ ক্লাবের মাথা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটিকে একটি যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে শট খেলেছিলেন এবং সেই অভিনব কাণ্ডের মাধ্যমে ইতিহাসে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। এসব বস্তু মহাকাশ অভিযানের রোমান্টিক দিকটির কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে চাঁদে ফেলে আসা প্রায় একশটি প্রস্রাব ও মলের ব্যাগ সে রকম আবেগ জাগায় না। ভবিষ্যতের কোনো চাঁদ জাদুঘরে হয়তো এক-দুটি রাখার জায়গা মিলতে পারে, কিন্তু সবগুলোর জন্য নয়।

তাহলে ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও চাঁদে অবতরণ আসলে কী অর্জন করেছিল? এর একটি সুস্পষ্ট ভূ-রাজনৈতিক দিক রয়েছে। মহাকাশ প্রতিযোগিতা ছিল শীতল যুদ্ধের দীর্ঘ সময়জুড়ে চলা বড়ো বড়ো লড়াইগুলোর একটি। যে ব্যবস্থা সেই লড়াই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও অর্থ জোগান দিয়েছিল, সেটিই অপর ব্যবস্থাকে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক আঘাত করেছিল। বলা হয়, শীতল যুদ্ধ 'একটি গুলিও না ছুড়ে' জয় করা হয়েছিল। বিশ্বজুড়ে সৃষ্ট অসংখ্য ছায়াযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এটি পুরোপুরি সত্য না হলেও, আরেকটি শট—'মুনশট'—নিশ্চয়ই নিজের ভূমিকা রেখেছিল।

এ ছাড়া রয়েছে বৃহত্তর মহাকাশ প্রতিযোগিতার ভিত্তি গড়ে দেওয়া বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলো—উভয় পক্ষের অর্জিত অগ্রগতি। চাঁদে যাওয়া ও ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৌশল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান, টেলিযোগাযোগ, মাইক্রোটেকনোলজি এবং সৌরশক্তি প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। আধুনিক বহনযোগ্য পানি বিশুদ্ধকরণ ব্যবস্থার শিকড় নাসার উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সঙ্গে

যুক্ত। বিশ্বজুড়ে দমকলকর্মীদের ব্যবহৃত হালকা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাস্ক ও তাপ-প্রতিরোধী পোশাকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ল্যাপটপ কম্পিউটার, তারবিহীন হেডসেট, এলইডি বাতি কিংবা মেমরি-ফোম ম্যাট্রেস—এসবের উৎসও মহাকাশ প্রতিযোগিতার বিজ্ঞানেই নিহিত, কোথাও সরাসরি, কোথাও পরোক্ষভাবে।

তবে তারবিহীন হেডসেট বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাস্ক ইতিহাসের তুলনায় ছোটোখাটো বিষয় মাত্র, আর শীতল যুদ্ধও একদিন হয়তো কেবল একটি পাদটিকায় পরিণত হবে। অনুমান করা হয়, এখন পর্যন্ত প্রায় ১১০ (১১,০০০ কোটি) বিলিয়ন মানুষ পৃথিবীর বুকে হেঁটেছে। তাদের প্রায় সবাই বিস্ময়ের চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু সেখানে হেঁটেছেন মাত্র বারোজন। আর্মস্ট্রংয়ের সেই পদচিহ্ন, যে স্থানকে অলড্রিন বলেছিলেন "মহিমান্বিত নির্জনতা" (magnificent desolation), যুগের পর যুগ মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

পর্ব ২ : বর্তমান বাস্তবতা

- মহাকাশ-রাজনীতির যুগ
- সিস্টেম বহির্ভূত শক্তিসমূহ
- চীন : লং মার্চ থেকে মহাকাশ অভিযান
- যুক্তরাষ্ট্র : ভবিষ্যতের পথে প্রত্যাবর্তন
- রাশিয়া : পশ্চাদমুখী যাত্রা
- অন্যান্য অংশীদার রাষ্ট্র

CamScanner

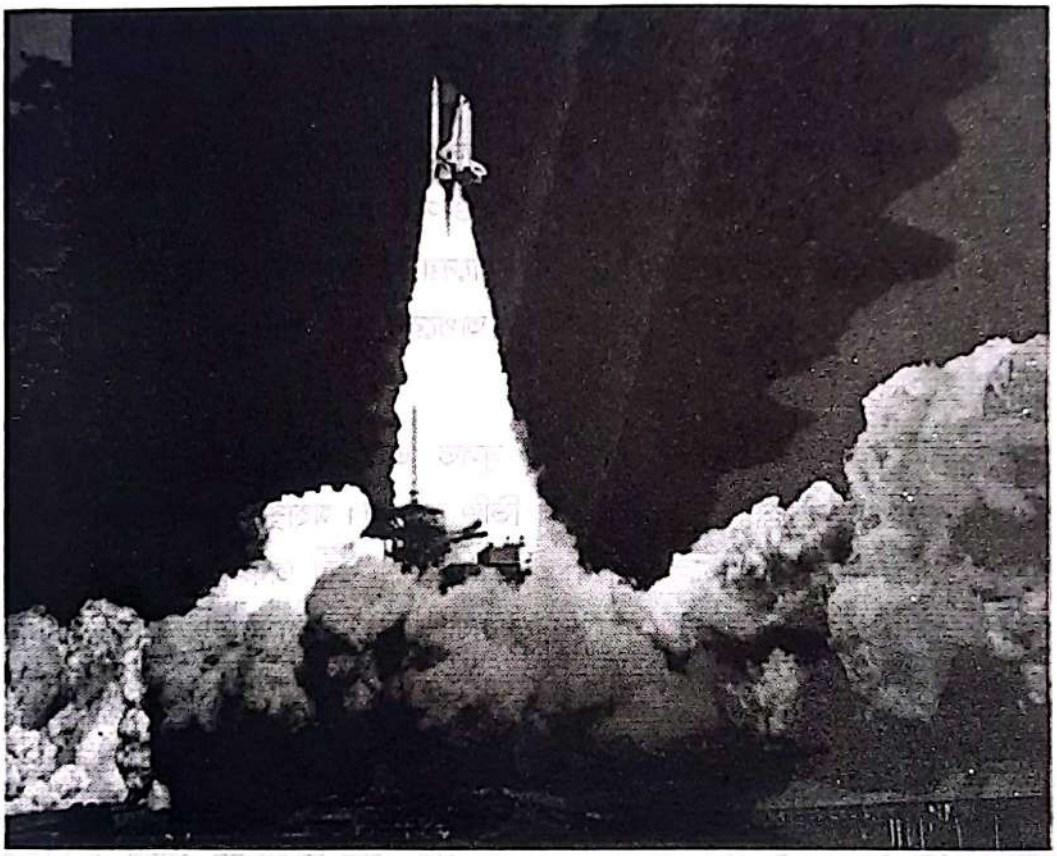
অধ্যায়-৩

মহাকাশ-রাজনীতির যুগ

(THE ERA OF ASTROPOLITICS)

"প্রথম দুয়েক দিন আমরা আমাদের দেশগুলোকে চিনে নিয়েছিলাম। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনে চোখ পড়ল মহাদেশগুলোর দিকে। আর পঞ্চম দিনে উপলব্ধি করলাম— পৃথিবী আসলে একটাই।"

— সুলতান বিন সালমান আল-সৌদ, নভোচারী



১৬ নভেম্বর ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেস শাটল আটলান্টিস উড্ডয়ন করছে।

আমাদের অনেকেই এখনো মহাকাশকে 'অনেক দূরের কিছু' এবং 'ভবিষ্যতের বিষয়' বলে মনে করি। কিন্তু এটি এখন 'বর্তমান' এবং 'বাস্তবতা'— মহাশূন্যের সীমানা এখন আমাদের হাতের নাগালে।

'স্পেস রেস' বা মহাকাশে দৌড় ছিল মূলত উপরে ওঠা এবং বাইরে যাওয়ার বিষয়। এখন আমরা সেই স্থানকে নিজের করে নেওয়ার চেষ্টা করছি। যেহেতু আরও নতুন নতুন দেশ মহাকাশে প্রবেশ করছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার আপডেট সংস্করণ পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে। এর অনিবার্য অর্থ হলো 'প্রভাব বলয়' (spheres of influence) তৈরি হওয়া এবং এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর দাবি জানানো, কারণ পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জোট এবং সংঘাতগুলো মহাকাশেও ছড়িয়ে পড়ছে। সামরিক এবং বেসামরিক—উভয় পক্ষই এখন স্যাটেলাইট বেল্ট থেকে শুরু করে চাঁদ এবং তারও বাইরের সুযোগগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে।

এটি অ্যাস্ট্রোপলিটিক্স বা মহাকাশ-রাজনীতির যুগ।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মহান ভূ-রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা—যেমন অ্যাডমিরাল আলফ্রেড থায়ের, যিনি নৌশক্তির তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন এবং হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার, যিনি স্থলশক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন—কোনো রাষ্ট্র কী অর্জন করতে পারবে আর কী পারবে না এবং সেই সক্ষমতা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করবে, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সব সময়ই স্থান, দূরত্ব ও সরবরাহব্যবস্থার মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতেন। উপত্যকা, নদী ও পাহাড় আমাদের সামনে এমন ভৌগোলিক বাস্তবতা তৈরি করে, যার ভেতর দিয়েই আমরা একে অপরের সঙ্গে বাণিজ্য করি এবং কখনো কখনো সংঘাতে জড়াই।

'অ্যাস্ট্রোপলিটিক্স' বা মহাকাশ-রাজনীতি মূলত এই একই নীতিগুলো মহাকাশে প্রয়োগ করে। ভূ-রাজনীতির মতোই এর ভিত্তি ভূগোল। মহাকাশ কোনো বৈশিষ্ট্যহীন শূন্যতা নয়। সেখানে চলাচলের পথে তীব্র বিকিরণে ভরা অঞ্চল রয়েছে, অতিক্রম করার জন্য রয়েছে বিপুল দূরত্বের মহাজাগতিক 'মহাসাগর', আবার এমন 'সুপারহাইওয়ে'ও আছে, যেখানে গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে মহাকাশযানের গতি বাড়ানো যায়। সামরিক ও বাণিজ্যিক সরঞ্জাম মোতায়েনের জন্য কৌশলগত করিডোর রয়েছে, আর রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নানা অঞ্চল। এসব কারণেই বড়ো শক্তিগুলোর দৃষ্টি এখন মহাকাশের দিকে, যেখানে তারা নিজেদের প্রভাব ও সুবিধা প্রতিষ্ঠা ও ধরে রাখার চেষ্টা করবে।

দেশগুলো যখন মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসছে। মহাকাশে কোন কৌশলগত অবস্থানগুলো সবচেয়ে মূল্যবান? কোন গ্রহ বা উপগ্রহে পানি কিংবা খনিজ সম্পদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে? সেগুলোর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব কেমন? এমন কোনো বাসযোগ্য গ্রহ কি আছে, যেখানে মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলতে পারে?

মহাকাশ-রাজনীতি বুঝতে হলে প্রথমেই মহাকাশের ভূগোল বোঝা জরুরি।

এই ভূগোলের সূচনা হয় পৃথিবীতেই, কারণ মহাকাশে যাওয়ার প্রথম ধাপ হলো ওপরে ওঠার পথ তৈরি করা। অ্যাপোলো যুগের পর থেকে উৎক্ষেপণের খরচ ও প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অনেকটাই কমেছে বটে, কিন্তু আপনি যদি একটি 'মহাকাশচারী জাতি'—বা এমনকি একটি কোম্পানি—হতে চান, তবে বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান থাকা অপরিহার্য। পাশাপাশি, হয় নিজস্ব রকেট উৎক্ষেপণ সক্ষমতা থাকতে হবে, নয়তো পৃথিবীর এমন কোনো ভৌগোলিকভাবে উপযুক্ত স্থানে প্রবেশাধিকার প্রয়োজন, যেখানে অন্য কোনো দেশ আপনাকে উৎক্ষেপণের সুযোগ দিতে রাজি।

এই কারণেই মহাকাশের ভূগোলের আলোচনা আক্ষরিক অর্থেই শক্ত মাটি—টেরা ফার্মা—থেকে শুরু হয়। প্রথমে দেখতে হয়, কোনো কোনো স্থান রকেট উৎক্ষেপণের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এগুলোকে সমুদ্রযাত্রার জন্য ব্যবহৃত বন্দরগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। উৎক্ষেপণের জন্য সবচেয়ে কার্যকর অবস্থান হলো সেই জায়গা, যেখানে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে দ্রুততম সময়ে মহাকাশে প্রবেশ করা যায়। এতে জ্বালানির খরচ কমে। এই সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বিষুবরেখার কাছাকাছি, যেখানে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি সর্বোচ্চ—প্রায় ঘণ্টায় ১,৬৬৯ কিলোমিটার।

এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার লঞ্চ কমপ্লেক্স ব্যবহার করে, যা তাদের ভূখণ্ডের মধ্যে বিষুবরেখার যতটা সম্ভব কাছে অবস্থিত এবং যেখানে ঘূর্ণন গতি প্রায় ১,৪৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন দক্ষিণ আমেরিকার ফ্রেঞ্চ গায়ানা ব্যবহার করেছে, আর রাশিয়া ব্যবহার করে কাজাখস্তানের উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলো। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে, তাই রকেট সাধারণত পূর্বমুখী করে উৎক্ষেপণ করা হয়, যাতে পৃথিবীর ঘূর্ণন থেকে অতিরিক্ত গতি পাওয়া যায়—এতে জ্বালানি ও সময় দুটোই সাশ্রয় হয়। একই সঙ্গে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে রকেটের বুস্টারগুলো যেন জনবসতিহীন এলাকায় পড়ে। এ কারণেই বিশ্বের বহু উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি অবস্থিত।

আদর্শ পরিস্থিতিতে একটি দেশ এতটাই বড়ো ও সম্পদসমৃদ্ধ হওয়া উচিত যে দক্ষ জনশক্তি, প্রকৌশল জ্ঞান, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং বিরল মৃত্তিকা ধাতু (রেয়ার আর্থ মেটালস)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের জন্য তাকে বাইরের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এমন দেশের জনগণকে মহাকাশ কর্মসূচির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মূল্যবোধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। দেশটি যত বড়ো হবে, তার নিজস্ব ভূখণ্ড থেকে আকাশের তত বেশি অংশ দৃশ্যমান হবে, ফলে স্যাটেলাইট ও মহাকাশযান—বন্ধুত্বপূর্ণ হোক বা শত্রুভাবাপন্ন—ট্র্যাক করা ততটাই সহজ হবে।

এই বিষয়গুলো মাথায় রাখলে সহজেই বোঝা যায়, কেন বর্তমানে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া মহাকাশে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে উল্লেখযোগ্য সামরিক ও বেসামরিক উপস্থিতি গড়ে তুলেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে পারত, তবে তারাও এদের কাতারে শামিল হতে পারত। ভারতের ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা বিদ্যমান।

গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণের পথ নির্ধারণের পর এবার আমরা মেঘের স্তর ভেদ করে ওপরে উঠছি এবং খুব দ্রুত বাণিজ্যিক বিমানগুলোর স্বাভাবিক সর্বোচ্চ উচ্চতা—প্রায় ১২ কিলোমিটার—অতিক্রম করে যাচ্ছি। আরও প্রায় ৬০ কিলোমিটার ওপরে উঠলে আমরা মহাকাশের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। নাসার সংজ্ঞা অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ওপরে শুরু হয় মহাকাশ; এর নিচের সবকিছুই পৃথিবীর অংশ। তবে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা ফেডারেশন অ্যারোনটিক ইন্টারন্যাশনাল, যারা মহাকাশযাত্রার রেকর্ড অনুমোদন করে, তারা মহাকাশের শুরু নির্ধারণ করেছে ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায়। এই সীমারেখাটিই পরিচিত কারমান লাইন নামে—যে বিন্দুতে একটি যান ধীরে ধীরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে শুরু করে।

এখান থেকেই আমরা প্রবেশ করি সিসলুনার স্পেসে—পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী অঞ্চল, যার বিস্তার প্রায় ৩,৮৫,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ভাষা থেকে, যার অর্থ 'চাঁদের এই পাশে অবস্থিত'।

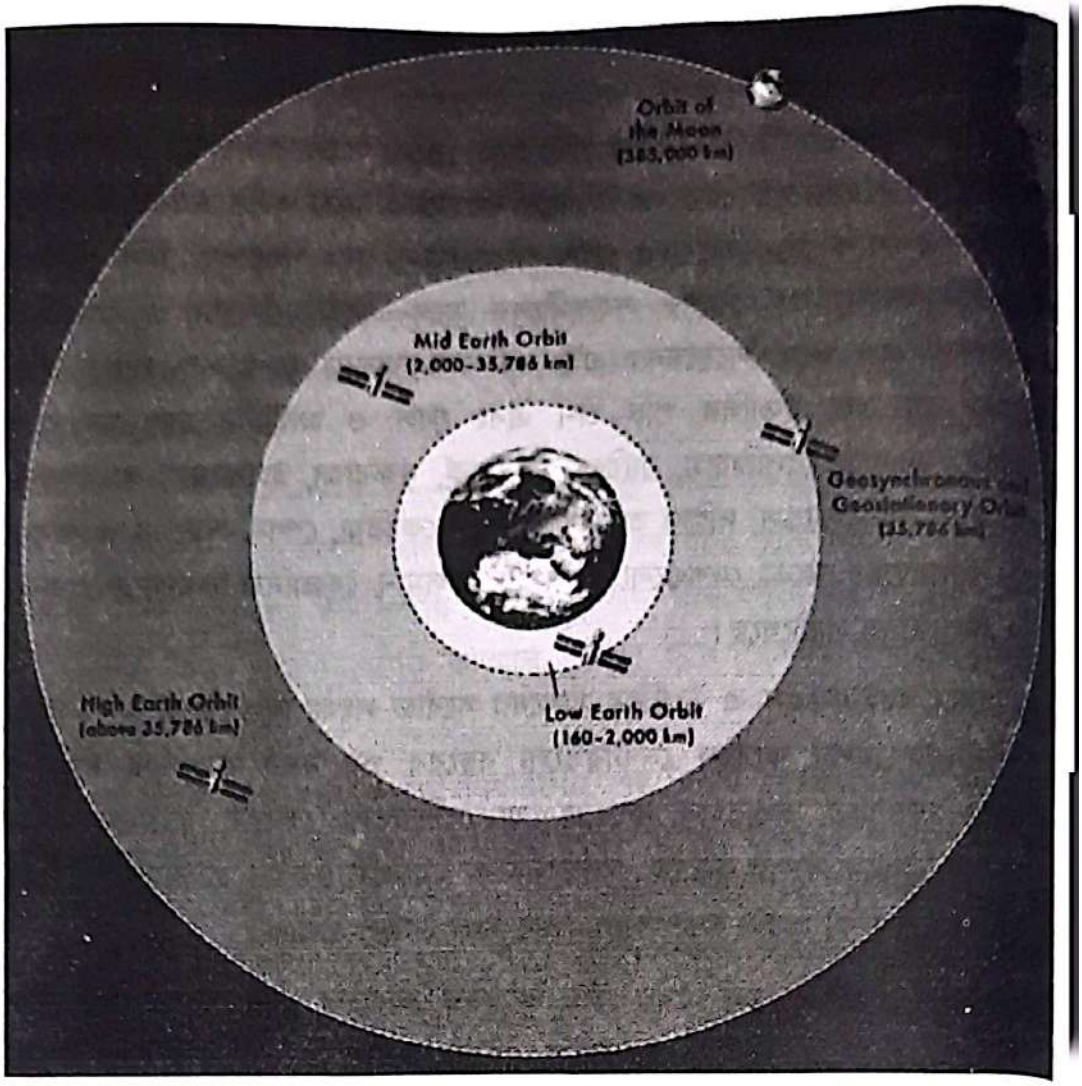
আপনি যখন লো আর্থ অরবিট বা নিম্ন পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছান—যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার থেকে ২,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত—তখন সেখান আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন বা আইএসএস-এর এক ঝলক দেখা যেতে পারে। এটি গড়ে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পর থেকে এই অঞ্চল অনেক বদলে গেছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দিক থেকে।

১৯৯৩ সালে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন অতিক্রম করে একটি যৌথ মহাকাশ স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ, জাপান ও কানাডার মহাকাশ সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি হয়। ১৯৯৮ সালে রাশিয়া প্রথম মডিউলটি উৎক্ষেপণ করে, আর দুই বছর পর সেখানে বসবাসের মতো পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি হয়। এরপর থেকে ১৬০ জনেরও বেশি আমেরিকান এবং পঞ্চাশের বেশি রাশিয়ান নভোচারী, অন্যান্য বহু দেশের সহকর্মীদের সঙ্গে একই বাসস্থান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ভাগ করে নিয়েছেন। এই তালিকায় রয়েছে জাপানের এগারো জন, কানাডার নয় জন, ইতালির পাঁচ জন এবং ফ্রান্স ও জার্মানির চার জন করে নভোচারী। এ ছাড়া বেলজিয়াম, ব্রাজিল, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য, ইসরায়েল, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, সুইডেন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলোও সেখানে চলমান বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার জন্য মানুষ পাঠিয়েছে।

একই সময়ে আইএসএস-এ উপস্থিত মানুষের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল তেরো জন। মস্কো ও হিউস্টনের মিশন কন্ট্রোল সেন্টারগুলো বছরের পর বছর ধরে এই নারী ও পুরুষদের যাতায়াত তত্ত্বাবধান করেছে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাশিয়ান সয়ুজ ক্যাপসুলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন হলো সহযোগিতার মাধ্যমে মহাকাশে কী অর্জন করা সম্ভব—তার এক উজ্জ্বল প্রতীক।

দুঃখজনকভাবে, আইএসএস এখন তার কার্যকর জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩১ সালে এটিকে অবসর দেওয়া হবে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের এক নির্জন অঞ্চল—'পয়েন্ট নিমো' নামে পরিচিত স্থানে—নিয়ন্ত্রিতভাবে আছড়ে ফেলা হবে, যেখানে এটি চিরনিদ্রায় যাবে সমুদ্রের গভীরে।

তবে চারপাশে এত বেশি যান দ্রুতগতিতে ছুটে বেড়ায় যে আপনি চাইলে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনটিকেও মিস করে যেতে পারেন। লো আর্থ অরবিট বা নিম্ন পৃথিবীর কক্ষপথ আসলে এক ধরনের অত্যন্ত মূল্যবান 'রিয়েল এস্টেট', কারণ এখানেই পৃথিবীর অধিকাংশ কার্যকর স্যাটেলাইট অবস্থান করে। স্যাটেলাইট ছাড়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক কিংবা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) কার্যত অচল হয়ে পড়ত। এই স্যাটেলাইটগুলোকে যদি জ্যাম করা হয়, স্পুফ করে বিভ্রান্ত করা হয় বা সরাসরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তার ফল হবে ভয়াবহ—আপনার মুদি সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ডেলিভারি ভ্যান আর আপনাকে খুঁজে পাবে না, জরুরি সেবা পথ হারাবে, সমুদ্রগামী জাহাজ দিকভ্রষ্ট হবে এবং যুক্তরাজ্যের মতো একটি প্রধান শিল্পোন্নত অর্থনীতি প্রতিদিন আনুমানিক এক বিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতির মুখে পড়বে।



পৃথিবীর চারপাশে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহগুলো যেখানে কাজ করে সেই কক্ষপথগুলো (স্কেল অনুযায়ী নয়)।

আধুনিক জীবনে স্যাটেলাইটগুলোর গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। সামরিক ক্ষেত্রেও এগুলো এখন আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার মূল চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক স্যাটেলাইট আকার ও ওজনে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। একদিকে আছে রুবিকস কিউবের মতো ছোটো, মাত্র ১.৩৩ কিলোগ্রাম ওজনের স্যাটেলাইট, আবার অন্যদিকে আছে এক হাজার কিলোগ্রামেরও বেশি ওজনের বিশাল স্যাটেলাইট—যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পের প্রধান ভরসা হিসেবে কাজ করে আসছে। অধিকাংশ স্যাটেলাইটেই সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহের জন্য সোলার প্যানেল থাকে এবং তীব্র তাপমাত্রা থেকে সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ রক্ষার জন্য বিশেষ তাপ-নিরোধক প্যানেল যুক্ত থাকে। প্রতিটি স্যাটেলাইটেরই একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা, উচ্চতা ও দিকনির্দেশনা

সহ নানা পরিমিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কম্পিউটার এবং একটি প্রপালশন বা চালিকাশক্তির ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়, যাতে নির্ধারিত কক্ষপথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেও তারা নিজেদের অবস্থান সংশোধন করতে পারে।

স্যাটেলাইটগুলো সাধারণত উল্লম্বভাবে উৎক্ষেপিত রকেটের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে কক্ষপথে পৌঁছে। জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য এই ধাপটি যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা হয়। কক্ষপথে পৌঁছানোর পর অধিকাংশ স্যাটেলাইট পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলাচল করে, অর্থাৎ পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিক অনুসরণ করে। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অভিমুখী কক্ষপথে তুলনামূলকভাবে কম স্যাটেলাইট পাঠানো হয়, কারণ উৎক্ষেপণের ভৌগোলিক দিকের কারণে এতে বেশি জ্বালানি ব্যয় হয়।

যেসব স্যাটেলাইট মেরু কক্ষপথে অবস্থান করে, সেগুলো মূলত মানচিত্র প্রণয়ন, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারি বা রিকনেসান্সের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের স্যাটেলাইট একটি পূর্ণ কক্ষপথ সম্পন্ন করতে সাধারণত প্রায় নব্বই মিনিট সময় নেয়। পৃথিবী ও স্যাটেলাইট উভয়ই ভিন্ন দিকে ঘুরতে থাকায়, স্যাটেলাইটটি ধীরে ধীরে পৃথিবীর পৃষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড অংশে পর্যবেক্ষণ করে—যেন একটি বিশাল, ফ্যাকাশে নীল কমলালেবু। এই পদ্ধতিতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পুরো পৃথিবীর পৃষ্ঠের মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়।

পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরা সাধারণ কক্ষপথের স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে নব্বই মিনিট থেকে দুই ঘণ্টা সময় নেয়, যা নির্ভর করে তারা পৃথিবী থেকে কতটা দূরে তার ওপর। প্রতিবার তারা টার্গেট এলাকার ওপর মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করে। তারা সাধারণত দলবদ্ধভাবে বা 'কনস্টেলেশন' (নক্ষত্রমণ্ডল)-এর মতো কাজ করে একটি 'জাল' তৈরি করতে এবং প্রায়শই একে অপরের সাথে, পাশাপাশি গ্রাউন্ড স্টেশনগুলোর সাথে যোগাযোগ করে স্থায়ী কভারেজ তৈরি করে। আমেরিকার গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (GPS) এটি অর্জনের জন্য গ্রহের চারপাশে সমানভাবে বিচরণ করা কমপক্ষে চব্বিশটি স্যাটেলাইট ব্যবহার করে।

লো আর্থ অরবিট বা নিম্ন পৃথিবীর কক্ষপথ হলো স্যাটেলাইট ইমেজিং বা ছবির জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অঞ্চল-পৃথিবীর পৃষ্ঠের তুলনামূলক কাছে থাকায় এটি পরিষ্কার ছবি তুলতে পারে। সামরিক মানের স্যাটেলাইট ক্যামেরা যে বিশদ বিবরণ ধরতে পারে তা চিত্তাকর্ষক। একটি বেসামরিক আবহাওয়া স্যাটেলাইটের রেজোলিউশন হতে পারে ১ কিলোমিটার, যার অর্থ আপনি ১ কিলোমিটারের চেয়ে ছোটো কিছু দেখতে পাবেন না—যা সমুদ্রের তাপমাত্রা মাপার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু কোনো ভবন থেকে

জেসন বোর্নকে বেরিয়ে আসতে শনাক্ত করার জন্য খুব একটা ভালো নয়। ৫ মিটারের ওপরে যেকোনো কিছুকে লো রেজোলিউশন বা নিম্ন মানের ধরা হয়। আধুনিক হাই-এন্ড সামরিক স্যাটেলাইটের রেজোলিউশন ০.১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করা হয়, তাই এখন আপনি শনাক্ত করতে পারবেন জেসন বো কোন ব্র্যান্ডের সানগ্লাস পরে আছেন। নিরাপত্তার কারণে এই প্রযুক্তির বাণিজ্যিক বিক্রি অনুমোদিত নয়। যদি কোনো স্যাটেলাইট নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে সেটি শনাক্ত করা, বা সেটি কখন মাথার ওপরে আছে তা জানা তাদের জন্য খুব দরকারি যারা নজরদারিতে থাকতে পছন্দ করেন না। কিছু স্যাটেলাইট খালি চোখে দেখা যায়; অন্যদের অবস্থান জানতে ভেতরের খবর প্রয়োজন।

কৌশলগতভাবে, লো আর্থ অরবিট একটি সম্ভাব্য 'চোক পয়েন্ট' (choke point) বা কৌশলগত সংকীর্ণ পথ। পৃথিবীতে আমরা এগুলোর সাথে পরিচিত, উদাহরণস্বরূপ সুয়েজ খাল এবং হরমুজ প্রণালী- এমন জায়গা যেখানে সমুদ্রপথ সংকীর্ণ এবং সহজেই অবরুদ্ধ করা যায়। এটি পুরোপুরি সঠিক উপমা নয়, তবে এটি একটি দরকারি উপমা। মহাকাশে যাওয়ার জন্য যেমন আপনাকে আপনার উৎক্ষেপণ সাইটগুলো রক্ষা করতে হবে, তেমনি লো আর্থ অরবিটে স্যাটেলাইট দ্বারা প্রদত্ত যোগাযোগের লাইনগুলোতে আপনার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে হবে এবং মহাজাগতিক 'মহাসাগরে' যাওয়ার পথে এর মধ্য দিয়ে চলাচল করতে সক্ষম হতে হবে।

আমরা যখন ওপরের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখব, আমাদের ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট বা বিকিরণ বলয়ে বেশিক্ষণ অবস্থান করা এড়াতে হবে—পৃথিবী থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি ডোনাট-আকৃতির এলাকা যেখানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আটকে থাকা উচ্চ-শক্তির কণা রয়েছে। বিকিরণের ঘনত্ব পরিবর্তিত হয়, তবে কিছু জায়গায় এটি এত বেশি যে তা মহাকাশযানের ইলেকট্রনিক্স নষ্ট করে দিতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে মানবদেহের কোষের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে দিতে পারে।

প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার ওপরে আমরা মিডিয়াম আর্থ অরবিট বা মধ্যম পৃথিবী কক্ষপথে প্রবেশ করি, যা প্রায় ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বারো ঘণ্টা বা তার বেশি সময় নেয়। এদের অনেকেই পৃথিবীতে অবস্থান করে এবং নেভিগেশন পরিষেবা প্রদান করে। এই যন্ত্রগুলো পারমাণবিক ঘড়ি বহন করে যা পরমাণুর কম্পন অনুযায়ী সময় পরিমাপ করে। এদের পৃথিবীর পারমাণবিক ঘড়ির সাথে মিল রেখে চালানো হয়। যা এতটা

নির্ভুল যে, বলা হয় লক্ষ লক্ষ বছরেও এদের এক সেকেন্ড এদিক-সেদিক হবে না। স্যাটেলাইটটি একটি রেডিও সংকেত (আলোর গতিতে) পৃথিবীতে থাকা একটি রিসিভারে পাঠায়, যার মধ্যে আপনার স্মার্টফোন বা গাড়ির স্যাট-ন্যাভ (sat-nav) সিস্টেমও অন্তর্ভুক্ত। এটি আপনি চলাফেরা করার সময় আপনার অবস্থান নির্ণয় করে, যাতে আপনার গাড়ি জানে সে কোথায় আছে এবং অন্য কোথাও কীভাবে যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই।

আরও ওপরে হাই আর্থ অরবিট বা উচ্চ পৃথিবীর কক্ষপথ, যা পৃথিবী থেকে ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার দূরে জিওসিঙ্ক্রোনাস (ভূ-সমলয়) এবং জিওস্টেশনারি (ভূ-স্থির) কক্ষপথ দিয়ে শুরু হয়। এদের মধ্যে একমাত্র আসল পার্থক্য হলো জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথের একটি স্যাটেলাইট গ্রহটিকে যেকোনো কোণে প্রদক্ষিণ করতে পারে, যখন একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট সর্বদা বিষুবরেখা অনুসরণ করে।

লো আর্থ অরবিট বা নিম্ন পৃথিবীর কক্ষপথ যোগাযোগ স্যাটেলাইটের জন্য কঠিন এলাকা কারণ তারা এত দ্রুত চলে যে গ্রাউন্ড স্টেশনগুলোর পক্ষে তাদের ট্র্যাক করা কঠিন, কিন্তু এখানে ওপরে স্যাটেলাইটের গতি পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির সাথে মিলে যায় এবং তাই এটি সব সময় একই ভূখণ্ডের ওপরে থাকে। আপনি যদি পৃথিবী থেকে এটি দেখতে পেতেন তবে এটি স্থির মনে হতো। একটি মাত্র যন্ত্র পৃথিবী পৃষ্ঠের ৪২ শতাংশ পর্যন্ত দেখতে পারে। টিভি, রেডিও এবং কিছু দূরপাল্লার আবহাওয়া স্যাটেলাইটের পাশাপাশি সামরিক যোগাযোগ এবং ইন্টারসেপ্ট (আড়ি পাতা) স্যাটেলাইটগুলো এখানে থাকে। এটি তুলনামূলক ব্যস্ত, তবে লো আর্থ অরবিটের চেয়ে অনেক কম। সিগন্যাল বা সংকেতের হস্তক্ষেপের কারণে সেখানে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক 'স্লট' বা জায়গা আছে এবং সীমিত ফ্রিকোয়েন্সি আছে যার মাধ্যমে যন্ত্রগুলো যোগাযোগ করতে পারে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) অবস্থান এবং ফ্রিকোয়েন্সি দুটোই বরাদ্দ করে, তাই আপনি চাইলেই সেখানে গিয়ে পার্ক করতে পারবেন না।

এখানেই আমেরিকানরা তাদের ছয়টি দ্বৈত-ব্যবহারের 'অ্যাডভান্সড এক্সট্রিমলি হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্যাটেলাইট' রাখে যা তাদের যুদ্ধবিমান, ব্রিটিশ, ডাচ, অস্ট্রেলিয়ান এবং কানাডিয়ান সেনাবাহিনী এবং মার্কিন পারমাণবিক আগাম-সতর্কবার্তা সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করে। রাশিয়ার আগাম-সতর্কবার্তা 'ইউনিফাইড স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম' একই কক্ষপথে রয়েছে এবং ধারণা করা হয় যে চীনের বেইদু (Beidou) স্যাটেলাইট সিস্টেমের অংশগুলোরও একই সক্ষমতা রয়েছে।

আরও দূরে হাই আর্থ অরবিটে অনেক স্যাটেলাইট মৃত্যুবরণ করতে যায়। যখন কোনো স্যাটেলাইটের স্বাভাবিক জীবন শেষ হয়ে আসে, তখন অন-বোর্ড থ্রাস্টারগুলো এটিকে জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথ থেকে বের করে মহাকাশের আরও গভীরে ঠেলে দেয়, যাতে এটি অন্যদের জন্য বিপদের কারণ না হয়।

পৃথিবীর (Terra) ওপরে বেশ ভিড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি হওয়ার কথা আশিটিরও বেশি দেশ সীমানা অতিক্রম করেছে এবং মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপন করেছে, যা নিয়ে গেছে সেই এগারোটি দেশ যাদের উৎক্ষেপণ সক্ষমতা আছে (বা ছিল)। সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড় হলো চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া; সাথে জাপান, ভারত, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্য নিজেদের সামনের সারিতে রাখার চেষ্টা করছে।

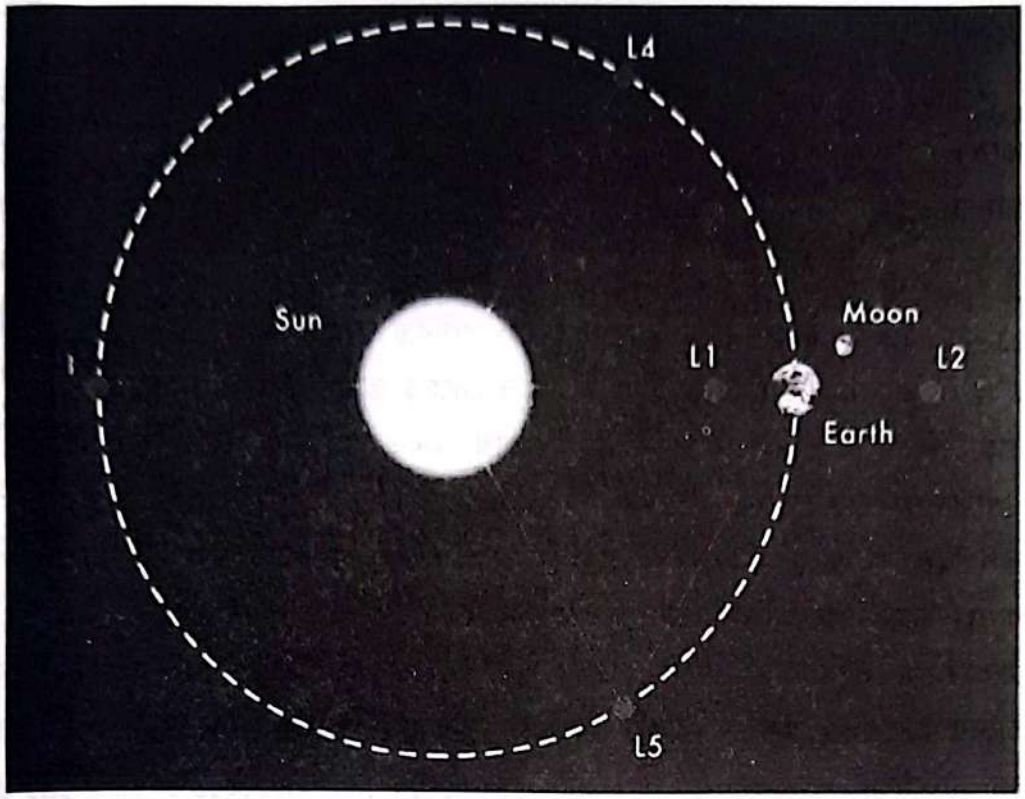
স্যাটেলাইট বেল্টে নিজেদের জায়গা দাবি করছে তিউনিসিয়া, ঘানা, অ্যাঙ্গোলা, বলিভিয়া, পেরু, লাওস, ইরাক এবং আরও ডজনখানেক দেশ যাদের সচরাচর গ্রহে প্রদক্ষিণকারী যন্ত্রগুলোর সাথে যুক্ত করা হয় না। এই স্যাটেলাইটগুলোর অনেকগুলো কেবল রাষ্ট্র নয়, বরং প্রাইভেট কোম্পানিগুলো উৎক্ষেপণ করেছে। 'ইউনিয়ন অব কনসার্নড সায়েন্টিস্টস'-এর মতে বর্তমানে পৃথিবীর চারপাশে ৮,০০০-এরও বেশি স্যাটেলাইট ঘুরছে, যার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ সক্রিয় এবং তাদের সাথে আরও অনেক, অনেকগুলো যোগ দিতে যাচ্ছে। হাজার হাজার স্যাটেলাইটের জন্য প্রচুর জায়গা আছে, কিন্তু প্রতিটির নতুনটির সাথে সংঘর্ষ এবং সরাসরি সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ছে।

আরও দূরে, স্যাটেলাইটের জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো ল্যাগ্রঞ্জ পয়েন্ট (Lagrange points)। এগুলো মহাকাশে 'গাড়ির পার্কিং'-এর মতো, এমন জায়গা যেখানে একে অপরকে প্রদক্ষিণকারী দুটি বড়ো ভরের মহাকর্ষীয় টান তাদের মাঝখানে সমানভাবে ভারসাম্যপূর্ণ হয়। এর মানে হলো একটি তৃতীয়, ছোটো বস্তু যেমন একটি স্যাটেলাইট বা মহাকাশযান, ন্যূনতম জ্বালানি ব্যবহার করে অবস্থান থাকার জন্য সেই সুবিধাজনক স্থানে (sweet spot) 'ভেসে' থাকতে পারে। বিকল্পভাবে, ভবিষ্যতে আপনি কোনো গ্রহাণু থেকে খনন করা কাঁচামালের চালান, স্পেস স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এই পয়েন্টগুলোর একটিতে পৌঁছে দিতে পারেন এবং নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি ফিরে আসা পর্যন্ত এটি সেখানেই থাকবে।

প্রতিটি দুই-বস্তুর সিস্টেমে পাঁচটি ল্যাগ্রঞ্জ পয়েন্ট থাকে, উদাহরণস্বরূপ সূর্য ও বৃহস্পতি, কিন্তু আমাদের জন্য যেগুলো প্রাসঙ্গিক সেগুলো হলো পৃথিবী ও সূর্য

CamScanner

পৃথিবী ও চাঁদ। পৃথিবী/সূর্য সিস্টেমে L1 হয়তো ১.৫ মিলিয়ন (১৫ লক্ষ) কিলোমিটার দূরে হতে পারে, তবে এটি SOHO – সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফিয়ারিক অবজারভেটরির কাছাকাছি, যা নিরাপদ (মোটামুটি) দূরত্ব থেকে সূর্যের ওপর অবিরাম নজর রাখে। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ২০২২ সালে L2-তে পৌঁছেছে এবং যেহেতু টেলিস্কোপটি সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদের উলটো দিকে মুখ করে থাকে, তাই এটি গভীর মহাকাশের নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্য পায়। সামান্য কিছু সমন্বয়, যাতে প্রায় কোনো জ্বালানিই লাগে না, এটিকে আগামী বিশ বছর সেখানে রাখা উচিত।



পৃথিবী-সূর্য সিস্টেমের ল্যাগ্রঞ্জ পয়েন্টগুলো (স্কেল অনুযায়ী নয়), স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান। এই পয়েন্টগুলো পৃথিবী এবং চাঁদ সহ সমস্ত দুই-বস্তুর সিস্টেমে বিদ্যমান।

L4 এবং L5 এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং খুব কম লোকই L3 নিয়ে ভাবে কারণ এটি সূর্যের উলটো দিকে লুকানো। তবে এটি সায়েন্স ফিকশন লেখকদের জন্য দরকারি হয়েছে, যারা সেখানে পৃথিবীর একটি হুবহু প্রতিচ্ছবি কল্পনা করেছেন, যা ১৯৬৯ সালের চলচ্চিত্র 'ডপেলগ্যাঙ্গার' (Doppelgänger), যা 'জার্নি টু দ্য ফার সাইড অফ দ্য সান' নামেও পরিচিত, তাতে সবচেয়ে ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। এতে কিছু চমৎকার বিষয় ছিল : পৃথিবীর সাহসী নভোচারী মনে করেন তিনি ক্র্যাশ করে বাড়িতেই ফিরে এসেছেন যতক্ষণ না... তিনি বুঝতে পারেন লেখাগুলো উলটো এবং

আরও খারাপ ব্যাপার—লোকেরা রাস্তার ভুল দিক দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে! এটা অনেকটা রাশিয়ায় থাকার মতো।

বাস্তব জগতে ফিরে আসি (আমার মনে হয়), পৃথিবী-চাঁদ সিস্টেমে, L1 এবং L2 উভয়ই চাঁদের কাছাকাছি 'গেটওয়ে' বা প্রবেশদ্বার স্পেস স্টেশনের অবস্থান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে L2 চাঁদের উলটো দিকে (far side) অবস্থিত এবং তাই 'রেডিও সাইলেন্স' বা বেতার নীরবতা প্রদান করে, যার অর্থ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যোগাযোগের হস্তক্ষেপ ছাড়াই মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করতে পারেন।

L পয়েন্টগুলোর কৌশলগত সুবিধা ইঙ্গিত দেয় যে এগুলোর জন্য প্রতিযোগিতা হতে পারে। সৌভাগ্যবশত, এগুলো বিশাল—প্রায় ৮ লক্ষ কিলোমিটার চওড়া—তাই প্রচুর জায়গা আছে, যদিও এই অঞ্চলগুলোতে কর্মরত মহাকাশ শক্তিগুলো একে অপরের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

L3 কম দরকারি কারণ এটি চাঁদের সাপেক্ষে পৃথিবীর উলটো দিকে। এই সিস্টেমে L4 এবং L5-ও বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে না, কিন্তু যেহেতু তারা পৃথিবীর তুলনামূলক কাছে তাই ভবিষ্যতের স্পেস কলোনি বা মহাকাশ বসতি স্থাপনের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে এগুলোর আলোচনা হয়েছে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে 'L5 সোসাইটি' নামে একটি গ্রুপ ছিল, যা শুনতে কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে—পাশাপাশি পক্ষপাতিত্বের গন্ধও পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু আসলে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক জেরার্ড কে. ও'নিল-এর ধারণা প্রচারের জন্য গম্ভীর বিজ্ঞানীরা এটি গঠন করেছিলেন তাদের রসবোধও ছিল, যা একটি প্রাথমিক চিঠিতে দেখা যায় : 'আমাদের স্পষ্টভাবে বলা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হবে L5-এ একটি গণসমাবেশে সোসাইটি ভেঙে দেওয়া।' ১৯৮৫ সালে এই সোসাইটি এবং এর ১০ হাজার সদস্য বৃহত্তর 'ন্যাশনাল স্পেস ইনস্টিটিউট' এর সাথে একীভূত হয় এবং এখন এর নাম 'ন্যাশনাল স্পেস সোসাইটি'।

আমাদের সিসলুনার ভ্রমণের শেষ বিরতি হলো খোদ চাঁদ— ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কিলোমিটার দূরে, মাত্র ১.৩ আলোক সেকেন্ড দূরে—আলোর চাঁদ থেকে আমাদের এই পাথরে (পৃথিবীতে) আসতে যে সময় লাগে। ১০০ কি.মি/ঘণ্টা গতিতে গাড়ি চালিয়ে পৃথিবী থেকে মহাকাশে পৌঁছাতে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগত, কিন্তু তারপর সেখানে পৌঁছাতে আরও ছয় মাস লাগত। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দ্রুততম যাত্রা ছিল 'নিউ হরাইজনস' মহাকাশযানের—আট ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট—কিন্তু বেশিরভাগ মনুষ্যবাহী যাত্রায় প্রায় তিন দিন সময় লাগে।

চাঁদের পৃষ্ঠ এবং আকৃতি এখন ম্যাপ করা বা মানচিত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি একটি অত্যাশ্চর্য জায়গা, যেখানে পাহাড়, শৈলশিরা, উপত্যকা, সমভূমি এবং বিশাল গুহা রয়েছে। এর পৃষ্ঠের আয়তন ৩৮ মিলিয়ন (৩ কোটি ৮০ লক্ষ) বর্গকিলোমিটারের কিছু কম, যা আফ্রিকার চেয়ে সামান্য বড়ো। প্রায় এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) বছর ধরে চাঁদে উল্কাপাত হয়েছে, যার মধ্যে কিছু এত বড়ো ছিল যে সেগুলো বহু-রিংযুক্ত অববাহিকা এবং পর্বত তৈরি করেছে যা আমরা আজ পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখতে পাই। আমরা আলো এবং অন্ধকার অঞ্চলগুলোও দেখতে পাই—উচ্চভূমি এবং 'মারিয়া' (maria), যা ল্যাটিন শব্দ 'সাগর' থেকে এসেছে, কারণ প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন এগুলো হয়তো সাগর। আসলে, উল্কাপাতের ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, যার ফলে পৃষ্ঠে লাভা প্রবাহিত হয়েছিল।

এগুলো বেশি অন্ধকার কারণ আগ্নেয় শিলায় উচ্চ আয়রন বা লৌহ উপাদান অন্যান্য এলাকার তুলনায় কম সূর্যালোক প্রতিফলিত করে। ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো ১১ যখন 'সি অফ ট্রাঙ্কুইলিটি' বা প্রশান্তির সাগরে অবতরণ করে, ততদিনে আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে এটি কোনো জলের মধ্যে অবতরণ (splash landing) হবে না। আপনি যদি পরিষ্কার রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকান (উত্তর গোলার্ধ থেকে), তবে আপনি এর কেন্দ্রের ঠিক পূর্ব দিকে ৮০০ কিলোমিটার চওড়া সি অফ ট্রাঙ্কুইলিটি দেখতে পাবেন। পৃষ্ঠের বাকি অংশকে বলা হয় টেরে (terrae) বা ভূমি এবং এতে পার্বত্য অঞ্চলগুলো রয়েছে, যার মধ্যে কিছু গড় উচ্চতার ৫ কিলোমিটার ওপরে।

সম্প্রতি, কিছু বড়ো গর্ত বা ক্রেটারে মেটাল অক্সাইড বা ধাতব অক্সাইডের জমার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয় উল্কাপিণ্ডগুলো হয়তো পৃষ্ঠের নিচ থেকে উপাদানগুলো খনন করে বের করেছে। যদি তাই হয়, তবে সম্ভবত মাটির গভীরে ধাতব অক্সাইডের বড়ো ঘনত্ব থাকবে এবং বিশ্বাস করা হয় যে চাঁদে সিলিকন, টাইটানিয়াম, বিরল মৃত্তিকা ধাতু (rare earth metals) এবং অ্যালুমিনিয়ামের রিজার্ভ বা মজুদ রয়েছে। মানবজাতির কপালে সেখানে আরও সময় ব্যয় করা লেখা আছে, এই ধাতুগুলোর সন্ধানে পৃষ্ঠের নিচে খনন করা, যা গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। অনেক দেশেরই এগুলোর পেছনে যাওয়ার উৎসাহ রয়েছে, বিশেষ করে যারা চীনের ওপর নির্ভর করতে চায় না, যাদের কাছে বর্তমানে বিশ্বের জানা মজুদের এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে।

সেখানে প্রচুর পরিমাণে শক্তির সম্ভাবনাও রয়েছে, যা চাঁদে মানব বসতিগুলোকে শক্তি দিতে এবং পৃথিবীতে রপ্তানি করতে যথেষ্ট হতে পারে। এই সম্ভাবনাটি হিলিয়ামে

নিহিত। এই বিরল এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসটির নাম গ্রিক শব্দ হেলিওস (helios) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'সূর্য'—কারণ সেখানেই এটি প্রথম শনাক্ত হয়েছিল। আইসোটোপ হিলিয়াম-৪ পৃথিবীতে পাওয়া প্রাকৃতিক হিলিয়ামের ৯৯ শতাংশেরও বেশি। এটি বেশ কাজের জিনিসও বটে। এটি উদাহরণস্বরূপ শিশুদের পার্টির বেলুন ফোলানো থেকে শুরু করে গাড়ির এয়ারব্যাগ পর্যন্ত এবং ম্যাগনেটিক-রেজোন্যান্স ইমেজিং (MRI) সিস্টেমের অংশগুলো ঠান্ডা করতে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এটি হিলিয়াম-৩ নয় এবং আমরা সেটারই খোঁজ করছি।

তাত্ত্বিকভাবে, হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়ার ফিউশন বা পারমাণবিক সংযোজন তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে—যা শক্তি উৎপাদনের 'হোলি গ্রেইল' বা পরম আরাধ্য কারণ এটি নিউক্লিয়ার ফিশন বা বিভাজনের চেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদন করবে কিন্তু তেজস্ক্রিয় নয়। পৃথিবীতে হিলিয়ামের মাত্র ০.০০০১ শতাংশ হলো হিলিয়াম-৩, কিন্তু চাঁদে এই জিনিসের হয়তো এক মিলিয়ন (১০ লক্ষ) টন মজুদ আছে। এর কারণ হলো আমাদের উপগ্রহটির কোনো বায়ুমণ্ডল নেই এবং তাই কোটি কোটি বছর ধরে হিলিয়াম-৩ বহনকারী সৌর বায়ু এর পৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করেছে।

চীনের লুনার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রামের বিশিষ্ট প্রধান বিজ্ঞানী ওউইয়াং জিউয়ান বিশ্বাস করেন যে যদি হিলিয়াম-৩-এর শক্তি কাজে লাগানো যায় তবে এটি 'প্রায় ১০,০০০ বছরের জন্য মানবতার শক্তির চাহিদা মেটাবে'। এটি অনেক দূরদর্শী চিন্তা, তবে এটি বর্তমান শক্তি সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও চিন্তা। হিলিয়াম-৩ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি তৈরি করতে ঠিক কতটুকু প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারেন না, তবে অনুমান করা হয় যে এক টন হিলিয়াম-৩ হয়তো ৫ মিলিয়ন (৫ কোটি) ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের সমান হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা চল্লিশ বছর ধরে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েক্টর নিয়ে কাজ করছেন এবং এর মৌলিক প্রোটোটাইপ বা আদিরূপ রয়েছে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত কোনো সাফল্য ছাড়া এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সম্ভবত এই দশকের নয় বরং পরবর্তী দশকের বিষয়। চাঁদে খনন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে, তবে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে।

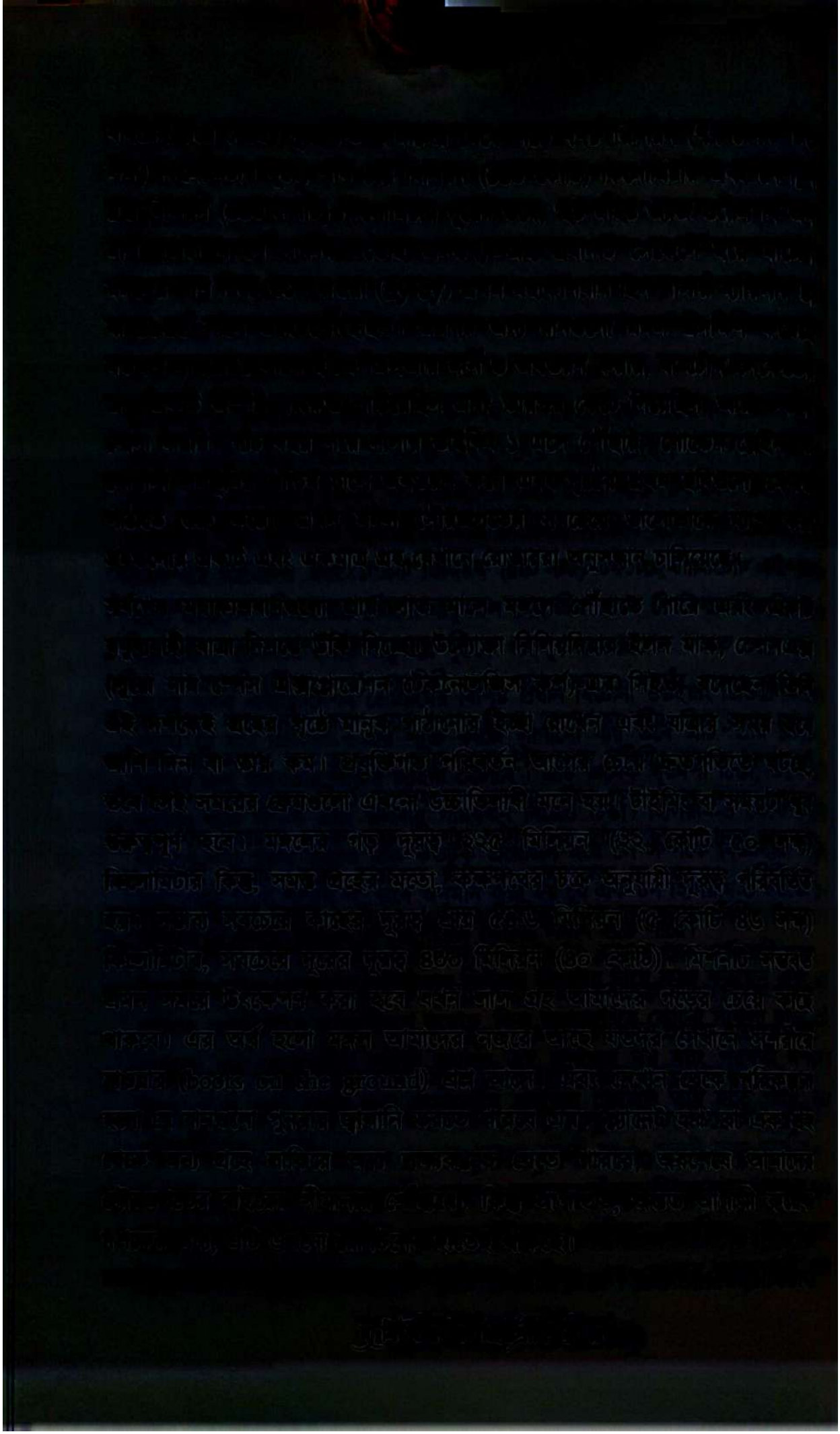
বিশ্বাস করা হয় যে সেখানে পানির মজুদও রয়েছে। চাঁদের বিষুবরেখার প্রায় ২,৭০০ কিলোমিটার দক্ষিণে 'সাউথ পোল-আইটকেন বেসিন' অবস্থিত, যা ২,৫০০ কিলোমিটার চওড়া এবং ১৩ কিলোমিটার গভীর। এর ভেতরে আকাশচুম্বী পর্বত

CamScanner

রয়েছে, যার মধ্যে কিছু চাঁদের অক্ষের কাত হওয়ার কারণে ৮০ শতাংশ সময় পর্যন্ত সূর্যালোকে থাকে। ১৮০০-এর দশকের শেষের দিকে তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল যে এই পাহাড়গুলো হয়তো স্থায়ীভাবে আলোকিত থাকে এবং সেগুলোকে 'পিকস অফ ইন্টারনাল লাইট' বা অনন্ত আলোর চূড়া নাম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হয় এমনকি সর্বোচ্চ চূড়াগুলোও মাঝে মাঝে অন্ধকারে পড়ে। তবে এদের কাছে এমন কিছু গর্ত বা ক্রেটার রয়েছে, যেগুলো এত গভীর যে সূর্যালোক, যা খুব নিচু কোণে কিরণ দেয়, কখনো তাদের তলদেশে পৌঁছায় না। এই স্থায়ীভাবে ছায়াযুক্ত স্থানগুলো সৌরজগতে পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে শীতল স্থান। এখানে-২৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা প্লুটোর পৃষ্ঠের তাপমাত্রার চেয়েও কম। এই জমে যাওয়া গুহাগুলোতে বরফের স্ফটিক রয়েছে এবং সেই বরফে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন রয়েছে; যা থেকে আপনি রকেটের জ্বালানি তৈরি করতে পারেন।

আপনি যদি মাটি থেকে বরফ বের করতে পারেন, তবে এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে এটি তরল অক্সিজেন এবং তরল হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে যায়। হ্যাঁ, এর মধ্যে আরও ব্যাপার আছে, তবে আপনি মূল ধারণাটা পেলেন এবং যেহেতু কিছু অনুমান বলছে চাঁদের মেরুগুলোতে ৬০০ মিলিয়ন (৬০ কোটি) কিলোগ্রাম জলীয় বরফ আছে, তাই এটি খুব ভালো একটি ধারণা হতে পারে। চাঁদ থেকে একটি রকেট উৎক্ষেপণ করতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির সামান্য অংশ লাগে এবং তাই একবার অবকাঠামো তৈরি হয়ে গেলে, পৃথিবী-চাঁদ ভ্রমণের জন্য ফেরার যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি বহন করার প্রয়োজন হবে না যদি 'অরবিটিং গ্যারেজ' বা কক্ষপথের গ্যারেজে সরবরাহ থাকে। নাসার বিশাল SLS রকেট পৃথিবী থেকে লো আর্থ অরবিটে যেতে ৮,০২,৫০০ গ্যালন জ্বালানি পোড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা প্রায় নয় মিনিটে ১.২টি অলিম্পিক সুইমিং পুল খালি করার সমান। এটি অন্যতম কারণ কেন চাঁদ তার পৃষ্ঠের ঘাঁটি থেকে দূরপাল্লার মিশন উৎক্ষেপণের জন্যও দরকারি হবে।

আর চাঁদের পরের ভূগোল? সীমা হলো অসীম, যার মানে কোনো সীমা নেই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতের জন্য মনুষ্যবাহী মহাকাশযানের এমন কোনো মানচিত্রের প্রয়োজন হবে না যা মঙ্গলের চেয়ে বেশি দূরে বিস্তৃত এবং সম্ভবত ২০৩০-এর দশকের আগে সেটিও হবে না। মহাকাশের বিশাল দূরত্বের তুলনায়, আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো একে অপরের বেশ কাছাকাছি অবস্থান করছে, কিন্তু যদিও আমরা এখন সেগুলোর সবকটিতেই যন্ত্র পাঠাতে পারি, সেগুলো আমাদের ভ্রমণের ক্ষমতার



তবে চাঁদ আমাদের নাগালের মধ্যে এবং প্রধান মহাকাশচারী দেশগুলো দেরিতে না করে শীঘ্রই সেখানে দোকান খুলতে আগ্রহী। হ্যাঁ, চাঁদে খনন এবং প্রক্রিয়াকরণ অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন হবে; হ্যাঁ, হিলিয়াম-৩ থেকে নিউক্লিয়ার ফিউশন হয়তো কেবল তাত্ত্বিক; এবং হ্যাঁ, সময়সীমা এবং বাজেট হয়তো পিছিয়ে যাবে, কিন্তু আপনি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এত দূর এগিয়ে যেতে দেখতে পারেন যে যদি তত্ত্ব বাস্তবে পরিণত হয়, তবে আপনি খেলার বাইরে চলে যান? হিলিয়াম এবং পানি ব্যবহারযোগ্য নবায়নযোগ্য সম্পদ নয়; যা খুঁড়ে বের করা হয়েছে এবং গরম করা হয়েছে তা প্রতিস্থাপনের জন্য সৌর বায়ুর ঢেউয়ের জন্য আপনি আরও এক বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করতে পারেন না—এটি হলো 'ফার্স্ট কাম, ফার্স্ট সার্ভড' বা 'আগে এলে আগে পাবেন' নীতির মতো। আর্থিক মডেলটি এখনো খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না, কিন্তু আমরা প্রথমবার আর্থিক লাভের জন্য চাঁদে যাইনি। নতুন বিশ্বের (New World) অনুসন্ধান এবং শোষণ গত ৫০০ বছরের ইতিহাস গড়েছে। ওপরে এবং দূরে যা আছে তারও এই সম্ভাবনা রয়েছে।

চ্যালেঞ্জগুলো বিভিন্ন কারণে গ্রহণ করা হবে—সম্মান, বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত। চাঁদের সফল উপনিবেশ স্থাপন একটি দেশকে, বা একটি জোটকে, আগের যুগে নৌ-শক্তিগুলো যে সুবিধা ভোগ করত তার মতো সুবিধা দেবে। একটি প্রভাবশালী শক্তি অঞ্চলটি দখল করে এবং সেখানে পুলিশগিরি করার চেষ্টা করে অন্যদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভণ্ডুল করতে সক্ষম হবে। এর স্যাটেলাইটগুলো জিওস্টেশনারি এবং লো আর্থ অরবিট পর্যন্ত সরাসরি দৃষ্টিরেখা (line of sight) উপভোগ করবে। যারা পথ তৈরি করবে তারা এমন প্যারামিটার বা মাপকাঠি ঠিক করে দেবে যা অন্যরা অনুসরণ করবে বলে আশা করা হবে। যারা প্রথমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে তারাই প্রথমে চাঁদের সম্ভাব্য সম্পদ এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ বাড়িতে ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা অর্জন করবে।

যদি কোনো মহাকাশ পরাশক্তি পৃথিবী থেকে বের হওয়ার পয়েন্ট এবং বায়ুমণ্ডল থেকে বের হওয়ার পথগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে তারা অন্য দেশগুলোকে মহাকাশ ভ্রমণে যুক্ত হওয়া থেকে আটকাতে পারে। যদি তারা চাঁদ নিয়ন্ত্রণ করে তবে তারা এর সম্পদ রাখতে পারে এবং আরও দূরে ভ্রমণের জন্য এটি ব্যবহারকারী একমাত্র শক্তি হতে পারে এবং যদি তারা লো আর্থ অরবিট নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তারা স্যাটেলাইট বেল্টকে নির্দেশ দিতে পারে এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে এটি ব্যবহার করতে পারে।

CamScanner

অ্যাস্ট্রোপলিটিক্স বা মহাকাশ-রাজনীতির বিশ্বের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক হলেন এভারেট ডলম্যান, ইউএস এয়ার ফোর্স এয়ার কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের স্ট্র্যাটেজির প্রফেসর এবং দূরদর্শী বই 'অ্যাস্ট্রোপলিটিক : ক্লাসিক্যাল জিওপলিটিক্স ইন দ্য স্পেস এজ'-এর লেখক। প্রফেসর ডলম্যান এই ক্ষেত্রের অন্যতম পরিচিত প্রবচনটি তৈরি করেছেন : 'যে লো আর্থ অরবিট নিয়ন্ত্রণ করে সে পৃথিবীর কাছাকাছি মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। যে পৃথিবীর কাছাকাছি মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ করে সে পৃথিবীকে (Terra) শাসন করে। যে পৃথিবীকে শাসন করে সে মানবজাতির নিয়তি নির্ধারণ করে।'

এ কারণে মহাকাশের অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করার প্রলোভন বাড়ছে। তিনটি প্রধান শক্তি এখন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, একটি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আটকা পড়ে নিশ্চিত করতে চাইছে যে অন্য কেউ যেন খবরদারি করতে না পারে। এবং এটি অন্য দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব সামরিক বিকল্পগুলো কী হতে পারে তা বিবেচনা করতে বাধ্য করছে। জাপান, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলো তাদের নিজস্ব সামরিক 'স্পেস কমান্ড' ঘোষণা করেছে।

এর পেছনে একটি পরিচিত ঠান্ডা যুক্তি রয়েছে। যদি আপনার কাছে দূরপাল্লার তীর থাকে (বিস্তারিত জানার জন্য আজিনকোর্ট দেখুন), তবে আমি আমার পাল্লা বা রেঞ্জ নিয়ে কাজ করার সময় আরও ভালো ঢাল তৈরি করব। আগের সময়ে সেনাপতিরা নিজেদের রক্ষা বা শত্রুকে আক্রমণ করার উপায় ছাড়া সৈন্যদের যুদ্ধে পাঠাতেন না– এবং এই যুগে, স্যাটেলাইটগুলো যুদ্ধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং পারমাণবিক অস্ত্র উৎক্ষেপণ শনাক্ত করতে দেশগুলো যে আগাম-সতর্কবার্তা সিস্টেম ব্যবহার করে তার একটি অত্যাবশ্যক অংশ। এর মানে দাঁড়ায় যে এমন একটি স্যাটেলাইট হারানো একটি দেশকে অরক্ষিত করে ফেলবে; মহাকাশের কক্ষপথ বেল্টগুলোতে প্রবেশাধিকার অস্বীকার করা হলে জীবন সত্যিই খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠবে। যুদ্ধের জন্য বা আক্রমণের আগাম সতর্কবার্তায় স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল কোনো দেশই তাদের অরক্ষিত রাখতে চাইবে না এবং শত্রু স্যাটেলাইটকে আঘাত করার ক্ষমতা ত্যাগ করবে না।

মহাকাশে কার্যকলাপের জন্য আমাদের বর্তমানে যে 'আইন'গুলো আছে সেগুলো নির্দেশিকার চেয়ে খুব একটা ভালো কিছু নয়। প্রযুক্তি এবং পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা সেগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। সামরিক ও বেসামরিক ব্যবহারের

জন্য মহাকাশ-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে—খনন, সৌর শক্তি প্রকল্প, বৈজ্ঞানিক কাজ এবং মহাকাশ পর্যটন—মহাকাশ একবিংশ শতাব্দীর একটি জনাকীর্ণ পরিবেশে পরিণত হচ্ছে যার জন্য একবিংশ শতাব্দীর আইন এবং চুক্তির প্রয়োজন।

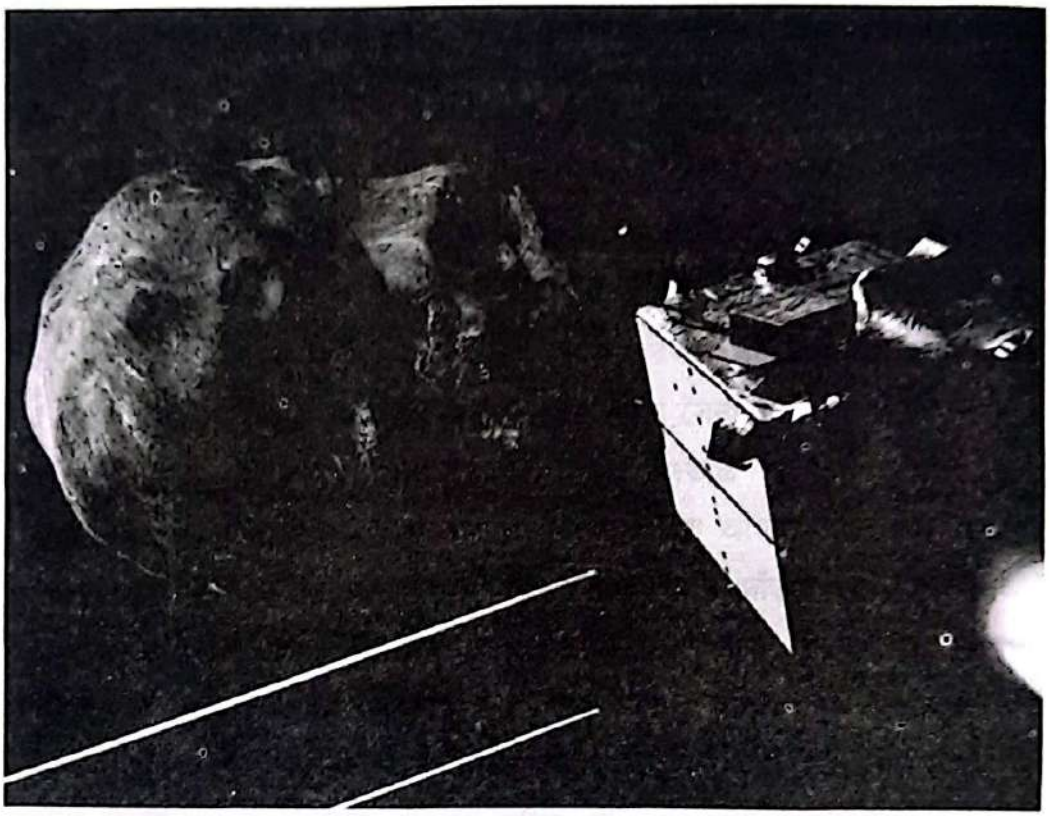
মহাকাশ যে একটি বৈশ্বিক সাধারণ সম্পদ (global common) সেই ধারণাটি হারিয়ে যাচ্ছে। ঝুঁকি অনেক বেশি। আমাদের নতুন নিয়ম এবং সেগুলো যে মহাকাশকে পরিচালনা করে তার সম্পর্কে আরও ভালো বোঝাপড়া প্রয়োজন। এর ৮ বিলিয়ন (৮০০ কোটি) কারণ আছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের নিয়ম-ভিত্তিক মহাকাশ ব্যবস্থা এবং মহাজাগতিক ইস্যুতে বৈশ্বিক সহযোগিতায় স্বার্থ রয়েছে। এটি ছাড়া আমরা হয়তো মহাকাশের ভূগোল নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে শেষ হয়ে যাব, ঠিক যেমনটি আমরা পৃথিবীর ভূগোল নিয়ে করেছি।

অধ্যায়-৪

সিস্টেম বহির্ভূত শক্তিসমূহ (OUTLAWS)

'চাঁদ থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে খুব তুচ্ছ মনে হয়। মনে হয় কোনো রাজনীতিবিদের ঘাড় ধরে আড়াই লক্ষ মাইল টেনে এনে বলি, "এটা দ্যাখো, শুয়োরের বাচ্চা।"'

— এডগার মিশেল, অ্যাপোলো ১৪-এর নভোচারী



নাসার ডাবল অ্যাস্টেরয়েড রিডাইরেকশন টেস্ট (DART)-এর চিত্রায়ন, যা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ডিমরফোস গ্রহাণুকে লক্ষ্য করে চালানো হয়।

তৃতীয় গ্রহ (পৃথিবী) এবং সূর্যের মাঝখানের জায়গাটি বেশ কঠিন। এর ভূগোল চ্যালেঞ্জিং এবং পরিবেশ প্রতিকূল, কিন্তু এতে অঢেল সম্পদও রয়েছে। মানুষ এর

আগে যেসব অঞ্চলের মুখোমুখি হয়েছে এবং যেগুলোর বৈশিষ্ট্য একই রকম ছিল, সেগুলোর মতো এটিও কার্যত আইনবিহীন। এটি মহাকাশ। আর এর জন্য মহাকাশ আইন প্রয়োজন।

কিন্তু সেটা কোনো সহজ কাজ নয়। পৃথিবীতে আইন ও চুক্তি করা যথেষ্ট কঠিন, যেখানে সীমান্ত এবং সীমানা স্পষ্ট এবং পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম আছে। তার ওপর, মহাকাশে বড়ো শক্তিগুলো তাদের সুবিধা হারাতে চাইবে না।

বিদ্যমান মহাকাশ আইনগুলো বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ভয়াবহভাবে সেকেলে এবং অস্পষ্ট। বেশিরভাগই মূলত শীতল যুদ্ধের সময়কার, যা প্রধান খেলোয়াড়দের দ্বারা মীমাংসিত হয়েছিল। এগুলো আর উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। যেমন, আউটার স্পেস ট্রিটি (১৯৬৭), যার ওপর ভিত্তি করে মহাকাশ ব্যবহারের বেশিরভাগ নিয়ম তৈরি হয়েছে, বলে : 'চাঁদ এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুসহ বাইরের মহাকাশ সার্বভৌমত্বের দাবি, দখল বা অন্য কোনো উপায়ে জাতীয় মালিকানাধীন নয়' এবং অনুসন্ধান 'সকল দেশের স্বার্থে এবং কল্যাণে পরিচালিত হবে, তাদের অর্থনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের মাত্রা নির্বিশেষে এবং এটি হবে সমস্ত মানবজাতির এলাকা'। যদি কোনো দেশ চাঁদে একটি ঘাঁটি তৈরি করে এবং নির্দিষ্ট এলাকাকে অন্যদের জন্য নিরাপদ নয় বলে ঘোষণা করে, তবে কি সেটি দখল এবং/বা সার্বভৌমত্ব হিসেবে গণ্য হবে? যদি কোনো দেশ পৃথিবীতে বিক্রির জন্য চাঁদ থেকে সম্পদ আহরণ করে—তবে কি সেটা সমস্ত মানবজাতির স্বার্থে? চুক্তিতে মহাকাশে গণবিধ্বংসী অস্ত্র স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু প্রচলিত অস্ত্রের কোনো উল্লেখ নেই এবং যেকোনো ক্ষেত্রে, এটি এমন একটি নথি যার কোনো প্রয়োগকারী ব্যবস্থা নেই। মুন এগ্রিমেন্ট (১৯৭৯)-ও একইভাবে সেকেলে এবং কার্যকর হওয়ার মতো খুব কম স্বাক্ষরকারী রয়েছে—এটা উল্লেখ করার মতো যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা রাশিয়া কেউ এটি অনুমোদন করেনি।

এই ধরনের চুক্তিগুলো জাতিরাষ্ট্রের হাতে থাকা প্রযুক্তির পরিবর্তনগুলো কভার করতে ব্যর্থ হয় এবং এই বিষয়টি প্রতিফলিত করে না যে এখন অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশ এই খেলায় নেমেছে কিন্তু নিয়মগুলো যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল তখন তাদের খুব একটা মতামত ছিল না। ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের পররাষ্ট্র নীতি উপদেষ্টা প্রফেসর জন বিউ যেমন বলেছেন: 'মহাকাশ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নতুন সীমানাগুলোর একটি যেখানে ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং নিয়মগুলো এখনো পুরোপুরি লেখা হয়নি।'

আরেক যুগের এই ধ্বংসাবশেষগুলোর জায়গায়, একাধিক অবাধ্যতামূলক অ্যাড-হক বা বিশেষ চুক্তি উঠে এসেছে। আর্টেমিস অ্যাকর্ডস (২০২০) এর সেরা উদাহরণ। এটি

CamScanner

চাঁদে কার্যকলাপের জন্য আপডেট করা নির্দেশিকা নির্ধারণ করার দাবি করে। কিছু অংশ মুন এগ্রিমেন্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ : উভয়ই অনুসন্ধানে আইনের শাসন প্রচার করে, জাতীয়তা নির্বিশেষে সমস্ত নভোচারী এবং মহাকাশযানকে সহায়তা প্রদানে সম্মত হয় এবং চাঁদে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশের আহ্বান জানায়।

যাহোক, দুটির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যে এগ্রিমেন্টটি চাঁদের জন্য একটি বহুপাক্ষিক, প্রকৃতপক্ষে বৈশ্বিক আইনি কাঠামো প্রচার করে, যেখানে অ্যাকর্ডস হলো একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সমষ্টি এবং এর টেক্সট বা পাঠ্য মূলত যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা লিখিত এবং মহাকাশ আইনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। কিছু 'আপডেট' মুন এগ্রিমেন্টের মূল বিধানগুলোতে বর্ণিত নীতি এবং দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক—উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকানরা এই ধারণাটি গ্রহণ করে না যে চন্দ্রের কার্যকলাপ সমস্ত মানবতার সাধারণ ঐতিহ্য এবং উপকারের জন্য হওয়া উচিত।

তাই অ্যাকর্ডসে যোগদানের মাধ্যমে, সদস্য রাষ্ট্রগুলো কার্যকরভাবে চন্দ্র আইন এবং—বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে—মহাকাশ আইনের প্রতি মার্কিন আইনি দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিয়েছে। মূল স্বাক্ষরকারীরা ছিল অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, যুক্তরাজ্য, ইউএই এবং যুক্তরাষ্ট্র; এরপর রোমানিয়া, ইউক্রেন, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, মেক্সিকো, ইসরায়েল, সৌদি আরব, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর এবং অন্যান্যরা যোগ দিয়েছে। কিন্তু ১৬০টিরও বেশি অন্যান্য দেশ যোগ দেয়নি এবং চীন ও রাশিয়াকে বিশেষভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস নাসাকে চীনের সাথে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ করেছে এবং রাশিয়াকে বিপজ্জনকভাবে মার্কিন গুপ্তচর স্যাটেলাইট ট্র্যাক করার অভিযোগে বের করে দেওয়া হয়েছে।

গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতে আর্টেমিস ছিলেন চাঁদের দেবী, অ্যাপোলোর যমজ বোন। আর্টেমিস দেশগুলোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অতটা মহৎ না হলেও, তারা অবশ্যই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাদের মিশন হলো কয়েক বছরের মধ্যে চাঁদে মানুষ নামানো এবং তারপর স্থায়ী কাঠামো তৈরি করা শুরু করা দশকের শেষের দিকে, ২০৩০-এর দশকের শুরুতে বসবাসের লক্ষ্যে।

আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষরকারীরা এই ধারণাটি মেনে নেয় যে এটি চাঁদে উপস্থিতি স্থাপন এবং বিরল মৃত্তিকা পদার্থ, পানি এবং হাইড্রোজেনের জন্য খনন করার আইনি ভিত্তি পরিষ্কার করে। এটি বলে যে সম্পদ আহরণ সহজাতভাবে জাতীয় মালিকানা গঠন করে না—অন্য কথায়, যে দেশ খনন করছে সে যে অঞ্চলে কাজ করছে তার মালিক নয়। বাস্তবে, এর অর্থ হলো 'আগে এলে আগে পাবেন'। চীন সম্ভবত

অ্যাকর্ডস স্বাক্ষরকারীদের কিছু পরেই চাঁদে পৌঁছাবে। যদি দেখা যায় যে খনন করা সম্ভব এমন এলাকা সীমিত, তবে তারা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হবে—যারা ততক্ষণে তাদের দাবি পেশ করে ফেলবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোও আউটার স্পেস ট্রিটিতে যা 'সমস্ত মানবজাতির এলাকা' বলা হয়েছে তা থেকে বঞ্চিত হবে।

অ্যাকর্ডসের ১১ নম্বর ধারায় 'মহাকাশ কার্যকলাপের সংঘাত নিরসন'-এর মহৎ লক্ষ্য রয়েছে। এটি অর্জনের জন্য, যারা চাঁদে দোকান খুলছে তাদের 'তাদের কার্যকলাপের বিজ্ঞপ্তি' প্রদান করতে হবে। সেই কার্যকলাপগুলো একটি 'সেফটি জোন' বা নিরাপত্তা অঞ্চলে হবে, যা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন এলাকা হিসেবে যেখানে অন্য দেশের কার্যকলাপ 'যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপ ঘটাতে পারে'।

বিষয়টি আরও খারাপ, বা হয়তো ভালো হতে পারে, নির্ভর করে আপনি ঘণ্টায় মজুরি নেওয়া মহাকাশ আইনজীবী কি না তার ওপর। দৃশ্যত, নিরাপত্তা অঞ্চলগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে এবং তাই 'অপারেটিং সিগনেটরি বা স্বাক্ষরকারী যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা অঞ্চলের আকার এবং পরিধি পরিবর্তন করবে'। তবে ভয় নেই—স্বাক্ষরকারীরা 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং সাধ্যমতো' জনসাধারণের কাছে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাবে। যাক! স্বস্তির বিষয়। কিন্তু এটা কী? ওহ, তারা কেবল তখনই সেটা করবে 'যখন মালিকানা এবং রপ্তানি-নিয়ন্ত্রিত তথ্যের জন্য যথাযথ সুরক্ষা বিবেচনা করা হবে'। আপনি এই আইনি ভাষার ফাঁকফোকর দিয়ে স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজ চালিয়ে দিতে পারেন, বিশেষ করে যেহেতু বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ এতে স্বাক্ষর করেনি। এমনকি যদি তারা করতও—'যুক্তিসঙ্গতভাবে', 'ক্ষতিকারক' এবং 'হস্তক্ষেপ' সংজ্ঞায়িত করুন।

তাই, আসুন সেই বিভাগটি পুনরায় লিখি : 'মহাজাগতিক বস্তুগুলোর সমস্ত এলাকায় অবাধ প্রবেশাধিকারের নীতিটি গম্ভীরভাবে স্বীকার, নিশ্চিত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার পরে, স্বাক্ষরকারীরা সীমানা চিহ্নিত করার অধিকার নিশ্চিত করে যেখানে অন্যরা যেতে পারবে না পাছে তারা পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাক্ষরকারীরা সীমানা সংজ্ঞায়িত করবে এবং তা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। স্বাক্ষরকারীরা এই বিষয়গুলোতে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দেয় কেবল তখন ছাড়া যখন তারা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।'

ব্যাস। ঠিক করা হলো। আসল টেক্সট সঠিক না ভুল সেটা বিষয় নয়, কিন্তু এতে চাঁদের পৃষ্ঠের চেয়েও বেশি গর্ত রয়েছে।

অ্যাকর্ডসের সমর্থকরা যুক্তি দেন যে যেহেতু এটি সম্মত হয়েছে যে চাঁদ কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, তাই 'সেফটি জোন' কোনো সমস্যা নয়। তবে,

'শান্তিপূর্ণ' বলতে কী বোঝায় তাও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং যদি আমার সংজ্ঞা আপনার থেকে ভিন্ন হয়? ১৯৫৯ সালে, অ্যান্টার্কটিক চুক্তির ক্ষেত্রে, রাশিয়া 'শান্তিপূর্ণ'কে 'অ-সামরিক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল। তবে, যুক্তরাষ্ট্র এটিকে 'আক্রমণাত্মক নয়' হিসেবে ব্যাখ্যা করে, যা সামরিক কার্যকলাপের অনুমতি দেয় যদি তা আক্রমণাত্মক না হয়। এই দুটি ব্যাখ্যা সেই মহাকাশ আইনজীবীদের বছরের পর বছর ধরে কর্মসংস্থানে রাখবে। আউটার স্পেস ট্রিটির ধারাগুলো ইতোমধ্যেই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশে সামরিক কর্মীদের কাজ করার অনুমতি দেয়। একবার আপনি 'ফ্যাক্টস অন দ্য মুন' বা চাঁদে বাস্তবতা তৈরি করে ফেললে, যদি অন্য কোনো নন-আর্টেমিস দেশ আপনার 'সেফটি জোন'-এ প্রবেশ করে তবে এটি যুক্তি দেওয়া সহজ হবে যে আপনার রক্ষণাত্মক অস্ত্রের প্রয়োজন, অবশ্যই আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে নয়, বরং শান্তি নিশ্চিত করতে এবং একবার আপনার কাছে রক্ষণাত্মক অস্ত্র থাকলে, আমিও সেগুলো চাইব। অবশ্যই, কেবল রক্ষণাত্মক উদ্দেশ্যের জন্য 'সেফটি জোন' থেকে 'ক্ষেয়ারস অফ ইনফ্লুয়েন্স' বা প্রভাব বলয়ে যাওয়া খুব বড়ো লাফ নয়, এটি আরেকটি শব্দ যার আইনি সংজ্ঞা অস্পষ্ট, কিন্তু যা মূলত এমন একটি অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে কোনো জাতি কোনো না কোনো একচেটিয়া দাবি করে, তা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা সামরিক হোক। এই ধরনের বলয় নিয়ে আমাদের পার্থিব আবেশ যুগে যুগে সংঘাতের কারণ হয়েছে, তাই মহাকাশে এগুলো রপ্তানি করা হয়তো সেরা ধারণা নয়।

আরও আছে। কোনো জাতিরাষ্ট্রের সাথে কাজ করতে পারে এমন প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে, প্রতিটি আর্টেমিস দেশ 'উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যাতে তার পক্ষে কাজ করা সংস্থাগুলো এই অ্যাকর্ডসের নীতিগুলো মেনে চলে'। তবে, চাঁদে কর্মরত একটি প্রধান মার্কিন কোম্পানি ২০১৫ সালের ইউএস কমার্শিয়াল স্পেস লঞ্চ কম্পিটিটিভনেস অ্যাক্টের দিকে আঙুল তুলতে পারে, যা মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিগতভাবে মহাকাশে প্রাপ্ত সম্পদ 'দখল, মালিকানা, পরিবহণ, ব্যবহার এবং বিক্রি' করার অনুমতি দেয়। যেহেতু একটি দেশের আইন তার সীমানার বাইরে প্রযোজ্য নয়, অন্য দেশগুলোর প্রতিবাদ করার ভিত্তি থাকবে, কিন্তু এটিও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

অ্যাকর্ডসের ৯ নম্বর ধারা একটি নতুন ধারণা প্রবর্তন করে : মহাকাশ ঐতিহ্য সংরক্ষণের, কিন্তু এটি কী হতে পারে বা কীভাবে এটি নিশ্চিত করা যায় তা সংজ্ঞায়িত করে না। এটি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে অ্যাপোলো ১১ অবতরণ স্থান, নীল আর্মস্ট্রংয়ের পায়ের ছাপ এবং

CamScanner

আমেরিকান পতাকাকে ঐতিহাসিক মূল্যের হিসেবে ঘোষণা করতে পারে এবং পুরো এলাকাটিকে একটি আমেরিকান সেফটি জোন হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারে। আর্মস্ট্রংয়ের পায়ের ছাপ সত্যিই ঐতিহাসিক মূল্যের, কিন্তু একতরফা ভিত্তিতে ডি ফ্যাক্টো বা কার্যত 'আইন' তৈরি করা অন্য বিষয়।

এটি উল্লেখ করা দরকার যে মূল মুন এগ্রিমেন্টের চেয়ে এখন বেশি দেশ অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষর করেছে, যা বৈধতা আলোচনার সময় প্রায়শই উল্লেখ করা হয়। যদি যথেষ্ট সংখ্যক দেশ কোনো চুক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের সমান গুরুত্ব দেয়, তবে বছর পার হওয়ার সাথে সাথে এবং টেক্সটে বর্ণিত অনুশীলনগুলো বদ্ধমূল হয়ে গেলে, দেশগুলো সেগুলোকে আইনের মতো আচরণ করতে শুরু করে। যদি দেশগুলোর একটি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোনো নথি অনুমোদন করে, তবে এটি সাধারণত আন্তর্জাতিক বৈশ্বিক আইনি মান হিসেবে সম্মত হয়। এর একটি উদাহরণ হলো ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অফ দ্য সি (UNCLOS), যা সমুদ্রে কার্যকলাপ এবং সামুদ্রিক সীমানা কী হবে তার জন্য একটি আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। মূলত ১৯৮২ সালে উত্থাপিত, এটি শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালে কার্যকর হয় যখন এটি ষাট জন স্বাক্ষরকারীতে পৌঁছায় এবং এখন এর ১৫৭ জন স্বাক্ষরকারী রয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রধান দেশ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং তুরস্ক, এতে স্বাক্ষর করেনি, কিন্তু তাতে এটি বৈশ্বিক 'মহাসাগরের সংবিধান' হিসেবে গণ্য হওয়া থেমে থাকেনি।

যেমন UNCLOS এখন সামুদ্রিক বিরোধে উদ্ধৃত করা হয়, এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে ২০৩০-এর দশকে আর্টেমিস দেশগুলো, যাদের সংখ্যা বাড়বে, চাঁদের অঞ্চল নিয়ে রাশিয়া বা চীনের সাথে বিরোধে অ্যাকর্ডস উদ্ধৃত করবে। কিন্তু তুরস্ক যেমন ভূমধ্যসাগরে তেল ও গ্যাস রিজার্ভ নিয়ে গ্রিসের সাথে বিরোধে UNCLOS সংজ্ঞা মেনে নেয় না, তেমনি আমরা বেইজিং এবং মস্কো আর্টেমিস সংজ্ঞা মেনে চলবে বলে আশা করতে পারি না।

২০২০ সালে রাশিয়ান স্পেস এজেন্সির (Roscosmos) তৎকালীন প্রধান, দিমিত্রি রোগোজিন, অ্যাকর্ডসকে চাঁদে 'আক্রমণ'-এর মতো বলে বর্ণনা করেছিলেন যা এটিকে 'আরেকটি আফগানিস্তান বা ইরাকে' পরিণত করতে পারে। পরের বছর রাশিয়া এবং চীন তাদের নিজস্ব সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে একটি মুন আউটপোস্ট বা চাঁদের ঘাঁটি তৈরি করতে, যার নাম হবে ইন্টারন্যাশনাল লুনার রিসার্চ স্টেশন এবং বলেছিল যে প্রকল্পটি অন্য দেশগুলোর যোগদানের জন্য উন্মুক্ত।

তাই প্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট নতুন বাস্তবতা মোকাবিলা করার জন্য এবং 'সেফটি জোন' যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তা রোধ করার জন্য নতুন এক সেট চুক্তির প্রয়োজন। সমস্যা

হলো এতে সব খেলোয়াড়ের সম্মতি প্রয়োজন এবং যেহেতু আমরা এখনো একমত হতে পারিনি যে মহাকাশ শুরু হয় এবং একটি দেশের সার্বভৌম এলাকা শেষ হয়—৮০ নাকি ১০০ কিলোমিটার ওপরে, তাই যাওয়ার পথ অনেক বাকি।

পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে এই সমস্ত সমস্যাগুলো নেভিগেট করা যথেষ্ট জটিল, কিন্তু আমাদের সেকেলে মহাকাশ আইনগুলোকে আরও অনেক বিষয় সমাধান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, মহাকাশে কার্যকলাপ হিসেবে কী গণ্য হবে? যদি কোনো দেশ পৃথিবীতে কোনো ড্রোন নিয়ন্ত্রণ করতে মহাকাশ-ভিত্তিক স্যাটেলাইট ব্যবহার করে, যা পরে একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে মিসাইল ছোঁড়ে—তবে কি তা আউটার স্পেস ট্রিটি লঙ্ঘন করে?

যদি ব্যবহৃত স্যাটেলাইটটি বাণিজ্যিক হয়, তবে কি এর অর্থ হলো সেই কোম্পানির পুরো স্যাটেলাইট সিস্টেম এখন অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে? ২০০৪ সালে, ইরাক যুদ্ধের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোঁড়া যুদ্ধাস্ত্রের ৬৮ শতাংশ স্যাটেলাইট দ্বারা নির্দেশিত ছিল, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ ছিল বাণিজ্যিক। ইরাকের যদি সক্ষমতা থাকত, তবে কি সেই স্যাটেলাইটগুলোতে গুলি চালানোর অধিকার তাদের থাকত? ২০২২ সালে তর্কে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের প্রথম দিনগুলোতে, ইরপিন শহর ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলে যখন মিসাইল হামলায় এর চব্বিশটি বেস স্টেশনের বেশিরভাগ অফলাইন হয়ে যায়। দুই দিন পর সংযোগ পুনরুদ্ধার করা হয়। ইলন মাস্কের স্পেসএক্স কোম্পানি শহরে স্টারলিঙ্ক হাই-স্পিড টার্মিনাল পাঠিয়েছিল লো আর্থ অরবিটে থাকা উন্নত স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইটগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য। স্টারলিঙ্ক ইঞ্জিনিয়াররা যাকে 'ডিশি ম্যাকফ্ল্যাটফেস' (Dishy McFlatfaces) বলে ডাকেন, তার ১০,০০০-এরও বেশি ইউনিট সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছিল। বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ ব্যবহার করত, কিন্তু ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী নেটওয়ার্ক যোগাযোগ বজায় রেখেছিল, যা তাদের ড্রোন সহ সুবিধাগুলোর কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল, যা কমান্ডারদের কাছে লক্ষ্যবস্তুর তথ্য পাঠাত।

রাশিয়ানরা টার্মিনাল এবং স্যাটেলাইটের মধ্যে সিগন্যাল জ্যাম করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্পেসএক্স দ্রুত তা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় বের করে ফেলে। মস্কো এবং ওয়াশিংটনে এসবই লক্ষ করা হয়েছিল। পেন্টাগনের ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের পরিচালক ডেভ ট্রেম্পার বলেছিলেন, 'আমাদের সেই ক্ষিপ্রতা থাকা দরকার', যখন রসকসমস-এর দিমিত্রি রোগোজিন অভিযোগ করেছিলেন যে স্টারলিঙ্ক পেন্টাগনের

একটি বাহু হিসেবে কাজ করছে। যদি সেটা সত্য হয়, তবে রাশিয়া কি বৈধভাবে স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইটগুলোতে আক্রমণ করতে পারত? সর্বোপরি, এটি রাশিয়ান সৈন্যদের হত্যা করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আপনি যুক্তি দিতে পারেন যে স্পেসএক্স ছিল এমন একটি দেশের তৃতীয় পক্ষ যারা একটি ছায়াযুদ্ধ বা প্রক্সি ওয়ার লড়ছিল। আরেকটি বাস্তবসম্মত বর্তমান দৃশ্যপট : চীন কী করত যদি কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সফল অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হতো এবং স্টারলিঙ্ক গ্রেট ফায়ারওয়াল বাইপাস করে ইন্টারনেট লিঙ্ক পাঠাত এবং নাগরিকদের জাতীয় পর্যায়ে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দিত?

এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ন্যাটো স্থল, আকাশ, সমুদ্র এবং সাইবারস্পেসের সাথে মহাকাশকে একটি অপারেশনাল ডোমেইন বা কর্মক্ষম ক্ষেত্র হিসেবে যুক্ত করে এবং পরের বছর একটি স্পেস সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মত হয়, যা ২০২১ সালে রামস্টেইন (জার্মানি)-এ খোলা হয়। বিভিন্ন ন্যাটো সদস্য থেকে কর্মীদের নেওয়া হয়, যাদের কাজ হলো নেভিগেশন, আবহাওয়া এবং যেকোনো ন্যাটো দেশের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্পেস কমান্ড থেকে পাওয়া তথ্যের সমন্বয় করা। ফরাসি এবং ব্রিটিশদের ইনপুট সত্ত্বেও, জোট এখনো নজরদারি এবং লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, ঠিক যেমনটি মাটিতে প্রচলিত যুদ্ধের অনেক সক্ষমতার জন্য তারা করে থাকে।

ন্যাটোর ২০২১ সালের সম্মেলনে আর্টিকেল ৫-এর পারস্পরিক প্রতিরক্ষা অনুচ্ছেদে মহাকাশকে অন্তর্ভুক্ত করার একটি কম-লক্ষ্য করা বিবৃতি ছিল। বিবৃতিটি সতর্কতার সাথে লেখা হয়েছিল : 'মহাকাশে, মহাকাশ থেকে বা মহাকাশের মধ্যে আক্রমণ... আধুনিক সমাজের জন্য প্রচলিত আক্রমণের মতোই ক্ষতিকারক হতে পারে। এই ধরনের আক্রমণ আর্টিকেল ৫ প্রয়োগের দিকে নিয়ে যেতে পারে।' সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে 'কেস-বাই-কেস' বা ক্ষেত্রবিশেষে।

সতর্ক ভাষা—'হতে পারে' এবং 'ক্ষেত্রবিশেষে'—প্রতিফলিত করে যে আমরা নতুন অঞ্চলে প্রবেশ করেছি। এটি কোনো ছোটো বিষয় নয়। একটি ন্যাটো দেশে মিসাইল ছোঁড়াকে যুদ্ধের কাজ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা সহজ, কিন্তু একটি লেজার বিম ছোঁড়ার ব্যাপারে কী হবে যা একটি বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট নষ্ট করে দেয়? কাজটি সার্বভৌম ভূখণ্ডে ঘটবে না এবং কোনো মানুষের প্রাণহানি হবে না। এটি কি যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো? উদাহরণস্বরূপ, স্পেন কি কেনিয়ার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ইলন মাস্কের

CamScanner



একটি স্যাটেলাইটে আঘাত লাগার কারণে অস্ত্র তুলে নেবে? সম্ভবত না এবং এই দৃশ্যপটেও জটিলতা রয়েছে। আর্টিকেল ৬ ত্রিশটি ন্যাটো রাষ্ট্রের অপারেশনাল এলাকা সংজ্ঞায়িত করে এবং 'যখন এই এলাকাগুলোর মধ্যে বা ওপরে' আক্রমণের কথা বলে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো জনবসতিহীন অংশের ওপর প্রদক্ষিণ করার সময় কোনো বস্তুর ওপর আক্রমণ হলে তা আর্টিকেল ৫-এর ট্রিগার বা কারণ নাও হতে পারে, কিন্তু মহাকাশের কয়েকশো কিলোমিটার ওপরের অংশ 'সার্বভৌম ভূখণ্ডের ওপরে' হিসেবে গণ্য হবে কি না তা অস্পষ্ট রেখে দেয়।

তাই 'ক্ষেত্রবিশেষে' অবস্থান। এটি ন্যাটোকে কী করতে পারে সে সম্পর্কে কৌশলগত অস্পষ্টতার একটি অবস্থান দেয়, সামরিক প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করার পরিবর্তে। যাহোক, সংজ্ঞা যা-ই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আর্লি-ওয়ার্নিং স্যাটেলাইট নষ্ট হয়ে গেলে ভৌগোলিক বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মহাকাশে করপোরেট এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপস্থিতি সামরিক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কহীন সব ধরনের প্রশ্নও উত্থাপন করে। তাদের উদ্যোগের ওপর পৃথিবীর কোন আইন প্রযোজ্য হবে এবং সেগুলো কীভাবে কার্যকর করা হবে? ধরা যাক স্পেস মোগল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন স্পেস স্টেশন শেলিতে থাকার সময় জীবিত টিস্যু থেকে একটি কৃত্রিম মানুষ তৈরি করলেন। পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়তো এমন মানুষ তৈরি নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু স্পেস মোগল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কোনো দেশ নন এবং স্পেস স্টেশন শেলি পৃথিবীতে নেই—কে তাকে থামাবে এবং কীভাবে?

আজগুবি? হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য। আইএসএস-এর বিজ্ঞানীরা বায়ো ফেব্রিকেশন ফেসিলিটিতে কাজ করার সময় থ্রিডি প্রিন্টার এবং বায়ো-কালি ব্যবহার করে ইতোমধ্যেই জীবিত টিস্যু তৈরি করেছেন। পৃথিবীতেও একই রকম কাজ হয়, কিন্তু এখানে মাধ্যাকর্ষণ নাজুক উপাদান ধসিয়ে দেয় বলে যে পরিমাণ টিস্যু তৈরি করা যায় তা সীমিত। মহাকাশে, বিজ্ঞানীরা এক ধরনের টিস্যু স্ক্যাফোল্ড বা কাঠামো প্রিন্ট করতে পারেন এবং তারপর তাতে যোগ করতে পারেন। তারা মানুষের অঙ্গ প্রিন্ট করতে সক্ষম হওয়ার পথে আছেন। পৃথিবীতে অঙ্গদাতার অভাবের কারণে (মঙ্গলের কথা না হয় বাদই দিলাম), এই বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলো মানবতার জন্য সুবিধাজনক হতে পারে; তবে, মহাকাশে এই ধরনের প্রকল্পগুলো পরিচালনা করার আইনি কাঠামো অস্পষ্ট।

আইএসএস-এ সাধারণত এটি বোঝা যায় যে বিজ্ঞানী যে দেশ থেকে এসেছেন সেই দেশের জাতীয় আইন কার্যকর থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানিজ এক্সপেরিমেন্ট

CamScanner

মডিউল (JEM)-এ তৈরি কোনো আবিষ্কার জাপানে ঘটেছে বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু এটি অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির কারণে।

জিনিসগুলোর আরও বিভীষিকাময় দিকে...জাপানি মডিউলে একজন জাপানি নভোচারী জাপানি সহকর্মীকে হত্যা করার অসম্ভাব্য দৃশ্যপটে, আইন পরিষ্কার। আউটার স্পেস ট্রিটি বলে যে আইনি এখতিয়ার সেই দেশটির হাতে থাকে যারা মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা বস্তুটি নিবন্ধন করেছে। এটি জাহাজ এবং বিমানের নিবন্ধনের আইনের মতো। কিন্তু জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড যদি দুটি ভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে হয় এবং একটি সংযোগকারী করিডোরে ঘটে—তবে এটি জটিল হয়ে যাবে—আর স্পেসওয়াকের সময় আইএসএস-এর বাইরে ঘটলে আরও ঘোলাটে।

অরবিটাল এক্সপ্রেসে স্পেসটেল (SpaceTel)-এর পথে বা স্পেসটেল হোটেলেই খুনের কী হবে—চাঁদ প্রদক্ষিণকারী এক মিলিয়ন তারার, ২০০-রুমের হোটেল? এটি অনেক কম সোজাসাপ্টা যদি স্পেসটেল একটি প্রাইভেট ইন্ডিয়ান কোম্পানির মালিকানাধীন হয় যার হেড অফিস সেশেলসে, যার যন্ত্রাংশ জাপানে তৈরি এবং কাজাখস্তান, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে উৎক্ষেপণ করা রকেটে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুভকামনা, স্পেস ইন্সপেক্টর পোয়ারো।

বর্তমানে এর কোনোটিরই সহজ উত্তর নেই, তবে এটি উল্লেখ করার মতো যে কানাডা ইতোমধ্যেই তার আইন পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছে যাতে তার দণ্ডবিধি বা ক্রিমিনাল কোড চাঁদের পৃষ্ঠ পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়।

আজ পর্যন্ত একমাত্র আইনি মামলাগুলো উপরের দৃশ্যপটের চেয়ে বেশি সাধারণ এবং সমাধান করা সহজ। ২০১৯ সালে নাসা নভোচারী অ্যান ম্যাকক্লেইন আইএসএস-এ থাকার সময় তার প্রাক্তন স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। নাসা তদন্ত করে অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন পায়; ম্যাকক্লেইনের প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। কম গুরুতর বিষয়, অ্যাপোলো ১৩ নভোচারী জ্যাক সুইগার্ট তার ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং মহাকাশে থাকার সময় ত্রুটিটি মনে পড়েছিল। 'হিউস্টন,' তিনি বলেছিলেন, 'আমার একটি সমস্যা হয়েছে।' হিউস্টন হেসেছিল এবং সুইগার্টকে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস সময় বাড়িয়ে দিয়েছিল এই যুক্তিতে যে তিনি 'দেশের বাইরে' ছিলেন।

মানুষ যদি সম্পূর্ণ নতুন গ্রহে বসতি স্থাপন করে তবে কী হবে; সেখানে কার আইন চলবে? এটি কি পৃথিবী থেকে শাসিত হবে? সম্ভবত কলোনি বা উপনিবেশগুলো শেষ

CamScanner

পর্যন্ত 'মাদার প্ল্যানেট' বা মাতৃগ্রহের শিকল ছুড়ে ফেলতে চাইবে এবং তাদের নিজস্ব স্ব-শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। আপনি যত দূরে যাবেন, পার্থিব আইন প্রয়োগ করা তত কঠিন হবে। আমরা যেমন দেখেছি, ইলন মাস্কের কোম্পানি স্পেসএক্স মানুষকে মঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে। স্পেসএক্স যে অনেক কাজ করে তার মধ্যে একটি হলো স্টারলিঙ্কের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা প্রদান করা। স্টারলিঙ্কের পরিষেবার শর্তাবলী (Terms of Service) আছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত : 'মঙ্গলে বা স্টারশিপ বা অন্য মহাকাশযানে মঙ্গলে যাওয়ার পথে প্রদত্ত পরিষেবাগুলোর জন্য, পক্ষগুলো মঙ্গলকে একটি মুক্ত গ্রহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং মঙ্গলের কার্যকলাপের ওপর কোনো পৃথিবী-ভিত্তিক সরকারের কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব নেই। তদনুসারে, বিবাদগুলো মঙ্গলে বসতি স্থাপনের সময় সরল বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত স্ব-শাসনের নীতির মাধ্যমে সমাধান করা হবে।'

স্ব-শাসনের নীতি? এই সরকার এবং তার নীতিগুলোর দায়িত্বে কে? আমি একটা মাস্ক-র‍্যাট (Muskrat) বা ইঁদুরের গন্ধ পাচ্ছি।

ব্রিটিশ একাডেমিক এবং মহাকাশ বিশেষজ্ঞ ডঃ ব্লেডিন বোয়েন এই ছোটো অক্ষরের লেখাগুলোর জবাবে সরাসরি বলেন : 'আমি যতটুকু বুঝি স্টারলিঙ্কের তাদের ব্যবহারের শর্তাবলীতে এটা রাখার কোনো আইনি অধিকার নেই কারণ মঙ্গলে জাতিসংঘের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। দ্বিতীয় অংশটি, স্ব-শাসনের নীতি এবং সরল বিশ্বাস সম্পর্কে, অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবে অপরিণত এবং প্রযুক্তিগত/বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতির সাধারণ অজ্ঞতা দেখায় যা আমি দুঃখজনকভাবে প্রায়ই দেখি।'

যেমনটি আগে দেখা গেছে, আউটার স্পেস ট্রিটির আর্টিকেল II বলে : 'চাঁদ এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুসহ বাইরের মহাকাশ জাতীয় দখলের বিষয় নয়।' আর্টিকেল III বলে যে দেশগুলো কেবল 'আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে' মহাকাশে কাজ করতে পারে। মিস্টার মাস্ক কোনো দেশ নন এবং তাই এই নিয়মগুলোর দ্বারা বাধ্য নন—এই পয়েন্টের জবাবে, আপনি যুক্তি দিতে পারেন যে চুক্তিতে এটাও বলা আছে যে দেশগুলো 'মহাকাশ জাতীয় কার্যকলাপের জন্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বহন করে' এবং আপনি সঠিক হবেন। কিন্তু ততক্ষণে স্পেসএক্স হন্ডুরাস থেকে উৎক্ষেপণ করবে, আপনার দিকে রকেট-বুস্টেড আইনজীবীদের 'তাক' করবে এবং কোম্পানির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্র থেকে পানামায় সরিয়ে নেবে, মিস্টার মাস্ক ইতোমধ্যেই কাউন্টি মার্স বা মঙ্গল প্রদেশের শেরিফ হয়ে যাবেন। অতি-ধনীরা তাদের 'কলোনি'গুলো কীভাবে শাসন করার ইচ্ছা রাখেন তা দেখার বিষয়।

CamScanner

যেমন ডঃ বোয়েন বলেছেন, 'বিলিয়নিয়াররা কি তাদের "কলোনি"গুলো সেভাবে চালাবেন যেভাবে তারা তাদের কারখানার ফ্লোর চালান এবং নাগরিকদের সাথে তেমন আচরণ করবেন যেমন তারা তাদের সবচেয়ে কম বেতনের কর্মচারীদের সাথে করেন?' তিনি 'কলোনি' শব্দটি নিয়েও অস্বস্তিতে আছেন : 'গণহত্যা, করপোরেট শোষণ, পরিবেশগত বিপর্যয়, দাসত্ব এবং বর্ণবাদের সাথে যুক্ত একটি শব্দ কি আমরা মহাকাশে "উজ্জ্বল ভবিষ্যতের" জন্য ব্যবহার করতে চাই?'

একসময় পর্যাপ্ত, যদিও মাঝে মাঝে অস্পষ্ট, বহুপাক্ষিক চুক্তি, আচরণবিধি এবং বিশ্বাস-গঠনের ব্যবস্থাগুলো স্পেসএক্স, ভার্জিন গ্যালাকটিক এবং ব্লু অরিজিন এবং চীনে কম পরিচিত আই-স্পেস এবং রাশিয়ায় আর্সেনালের মতো প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর উত্থানের সাথে তাল মিলিয়ে বিবর্তিত হয়নি।

যদি কোনো প্রাইভেট কোম্পানি বা ব্যক্তি সত্যিই অন্য গ্রহে বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়, তবে এই নতুন অফ-আর্থ বা পৃথিবীর বাইরের 'কলোনি'গুলোর 'শাসকদের' তাদের কর্তৃত্বের সীমার ওপর নজরদারি প্রয়োজন হবে। এই কাহিনিসূত্র নিয়ে বেশ কিছু সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস রয়েছে, কিন্তু বাস্তব বিশ্বে যদি আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাজাগতিক সংস্করণ এড়াতে চাই, যার নিজস্ব ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী এবং ভারতের কিছু অংশের কার্যত দখল ছিল, তবে আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত আইনের প্রয়োজন।

অন্যান্য, আরও তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি বিষয় রয়েছে যার জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। একটি বড়ো বিষয় হলো মহাকাশের বর্জ্য বা স্পেস ডেব্রিস। এভারেট ডলম্যান একমত যে অগ্রাধিকার হিসেবে এটি মোকাবিলা করার জন্য একটি নতুন সেট চুক্তির প্রয়োজন : 'বর্তমানে বর্জ্য হলো এক নম্বর সমস্যা। সমস্ত মহাকাশচারী রাষ্ট্র প্রকাশ্যে বর্জ্য প্রশমন এবং এমনকি কমানোর পক্ষে কথা বলেছে। সমস্যা হলো প্রস্তাবগুলো সবসময় স্পষ্টভাবে এক পক্ষের স্বার্থের পক্ষে যায়।'

নাসা অনুমান করে যে পৃথিবীর চারপাশে কক্ষপথে ১০ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড়ো (মোটামুটি একটি জাম্বুরার আকারের) ২৭,০০০-এরও বেশি বর্জ্য রয়েছে। ১ থেকে ১০ সেন্টিমিটার আকারের (টেনিস বল প্রায় ৭ সেন্টিমিটার) আরও ৫,০০,০০০ টুকরো রয়েছে এবং সব মিলিয়ে ১ মিলিমিটারের চেয়ে বড়ো প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) টুকরো রয়েছে। বেশিরভাগ বর্জ্যের টুকরো ছোটো হতে পারে, কিন্তু সেগুলো ২৫,০০০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে চলছে, যা আপনি যদি একটির সংস্পর্শে আসেন তবে সমস্যার কারণ হবে। সেই গতিতে চলা ১-সেন্টিমিটারের একটি টুকরো আপনার, বা

আপনার মহাকাশযানের সাথে ৪০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে একটি ছোটো গাড়ির সংঘর্ষের সমান শক্তি তৈরি করতে পারে।

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকারী স্যাটেলাইটের বিশাল পরিমাণের অর্থ হলো এই সমস্যাটি কেবল আরও খারাপ হতে যাচ্ছে। স্পেসএক্স তাদের স্টারলিঙ্ক ব্রডব্যান্ড পরিষেবার জন্য ৪০,০০০ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার লক্ষ্য রেখেছে; অ্যাস্ট্রা নামে একটি নতুন স্টার্ট-আপ ১৩,৬০০-এর জন্য আবেদন করেছে; এবং আমাজন চায় ৩,২০০। এবং এরা কেবল আমেরিকানরা। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে ২০৫০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫০,০০০ স্যাটেলাইট হতে পারে—তবে ততদিনে কক্ষপথে ২,৫০,০০০ স্যাটেলাইটও থাকতে পারে।

বেশি স্যাটেলাইট মানে অনিবার্যভাবে বেশি বর্জ্য। যত বেশি বর্জ্য, তত বেশি কেসলার সিনড্রোম (Kessler Syndrome)-এর ঝুঁকি। দৃশ্যপটটি হলো কক্ষপথে আবর্জনার পরিমাণ এমন একটি বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে সংঘর্ষ ঘন ঘন হতে থাকে। এটি একটি বিপর্যয়কর ক্যাসকেড বা ধারাবাহিক ঘটনার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে বর্জ্যের একটি মেঘ হাবল স্পেস টেলিস্কোপে আঘাত হানে, যা পরে আইএসএস-এর দিকে যাওয়ার আগে একটি পাশ দিয়ে যাওয়া স্পেস শাটলকে ধ্বংস করে। আপনার হয়তো মনে আছে এটি ২০১৩ সালের সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম 'গ্র্যাভিটি'-র গল্পের অংশ ছিল—কিন্তু এটি প্রাক্তন নাসা বিজ্ঞানী ডোনাল্ড কেসলারের কাছ থেকে প্লটটি পেয়েছিল, যিনি ১৯৭৮ সালের একটি পেপারে এই ধারণাটি দিয়েছিলেন। কেসলারের সংস্করণে, ক্যাসকেড চলতেই থাকে যতক্ষণ না সমস্ত স্যাটেলাইট ধ্বংস হয়ে যায় এবং লো আর্থ অরবিটে বর্জ্যের বলয় মহাকাশযানগুলোর পক্ষে আমাদের গ্রহ ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব করে তোলে।

কেসলার সিনড্রোম একটি প্রজেকশন বা অনুমান, কিন্তু বর্জ্য দ্বারা সৃষ্ট বর্তমান হুমকি কাল্পনিক নয়। অসংখ্যবার আইএসএস-কে বর্জ্যের আঘাত এড়াতে তার থ্রাস্টার জ্বালাতে হয়েছে। মহাকাশযানগুলোও কক্ষপথে একে অপরকে আঘাত করেছে। সবচেয়ে পরিচিত ঘটনা ছিল ২০০৯ সালের সংঘর্ষ যখন রাশিয়ার নিষ্ক্রিয় কসমস ২২৫১ যোগাযোগ স্যাটেলাইট সাইবেরিয়ার ৮০০ কিলোমিটার ওপরে একটি সক্রিয় ইউএস-ভিত্তিক ইরিডিয়াম স্যাটেলাইটকে আঘাত করে। কমপক্ষে ১০ সেন্টিমিটার মাপের প্রায় ২,০০০ টুকরো বর্জ্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকারী আবর্জনার সাথে যুক্ত হয়েছিল।

বর্জ্য কমানোর জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু অসংখ্য জটিল কারণ রয়েছে। একটি প্রধান কারণ হলো বর্জ্য সৃষ্টি কেবল দুর্ঘটনাবশত নয়। একটি

স্যাটেলাইট বিভিন্ন কারণে লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু এবং বিভিন্ন অ্যান্টি-স্যাটেলাইট (ASAT) অস্ত্র রয়েছে যা পৃথিবীর পৃষ্ঠের হাজার হাজার কিলোমিটার ওপরে দ্রুত গতিতে চলা বস্তুকে লক্ষ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম অ্যান্টি-স্যাটেলাইট পরীক্ষা করেছিল ১৯৫৯ সালে। এই কর্মসূচি প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং পরবর্তী প্রেসিডেন্টরা চালিয়ে যান, যা রোনাল্ড রিগ্যানের স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ, যা 'স্টার ওয়ার্স' নামে পরিচিত, তার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েতরা অনুরূপ কর্মসূচিতে কাজ করছিল। তারা এমনকি তাদের একটি স্যালুট স্পেস স্টেশনে একটি 'আত্মরক্ষা' র‍্যাপিড-ফায়ার গান বা দ্রুত-ফায়ারিং বন্দুক স্থাপন করেছিল এবং ১৯৭৫ সালে বায়ুমণ্ডলে পরীক্ষামূলকভাবে গুলি ছুড়েছিল। এটি হয়তো সায়েন্স ফিকশন সিনেমার 'ডেথ রে' বা মৃত্যু রশ্মির মতো ছিল না, কিন্তু এটি অবশ্যই মহাকাশে প্রথম ছিল। বন্দুকটির সীমাবদ্ধতা ছিল। এটি তাক করার জন্য, পুরো ২০-টন ওজনের স্টেশনটিকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে ঘুরাতে হতো, তারপর অস্ত্রের সাথে একই সময়ে তার থ্রাস্টার জ্বালাতে হতো যাতে রিকয়েল বা পশ্চাৎধাক্কা যানটিকে অজানার দিকে পাঠিয়ে না দেয়। এর কক্ষপথের আড়াআড়ি গুলি না চালানোও বুদ্ধিমানের কাজ ছিল কারণ তাতে মহাকাশযানটি নিজের পেছনেই গুলি করে বসত। একমাত্র জানা টেস্ট ফায়ারটি কসমোনটরা চলে যাওয়ার পর দূর থেকে করা হয়েছিল।

তারপর থেকে পরিস্থিতি অনেক এগিয়েছে। এখন স্যাটেলাইট নামানোর জন্য নিখুঁত অস্ত্রের একটি সম্পূর্ণ সমাহার রয়েছে—পৃথিবী বা মহাকাশ থেকে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যালিস্টিক মিসাইল, পৃথিবী থেকে জিওস্টেশনারি কক্ষপথ পর্যন্ত ছোঁড়া লেজার, হাই-পাওয়ার মাইক্রোওয়েভ এবং সাইবার আক্রমণ। এমনকি স্যাটেলাইটের ক্যামেরায় রাসায়নিক স্প্রে করে তাদের 'অন্ধ' করার সম্ভাবনাও রয়েছে, যখন 'স্পেস-ক্লিনিং' বা মহাকাশ-পরিষ্কারকারী স্যাটেলাইটের হাইড্রোলিক হাতলগুলো, যা বর্জ্য ধরার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সহজেই শত্রু অস্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে যা অন্য স্যাটেলাইটকে কক্ষপথ থেকে ফেলে দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২০০৭ সালে চীন তাদের নিজস্ব একটি অকার্যকর আবহাওয়া স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে ভূমি থেকে উৎক্ষেপিত ASAT ব্যবহার করে যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ৮৬৩ কিলোমিটার ওপরে ছিল, যা দেখে মনে হয়েছিল একটি পরীক্ষা যে তারা এটি কোনো শত্রু স্যাটেলাইট বা এমনকি মহাকাশযানের বিরুদ্ধে করতে পারে কি না। সিচুয়ান প্রদেশের জিচাং স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার থেকে একটি 'কাইনেটিক কিল ভেহিকল' (KKV) বহনকারী ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোঁড়া হয়েছিল। KKV-কে কখনো কখনো 'স্মার্ট রক্স' বা বুদ্ধিমান পাথর বলা হয় কারণ তাদের বিস্ফোরিত হওয়ার মতো

ওয়ারহেড থাকে না; পরিবর্তে, তারা কেবল 'হিট-টু-কিল' বা আঘাত-করে-হত্যা আক্রমণে লক্ষ্যবস্তুতে আছড়ে পড়ে।

ধ্বংসের বিজ্ঞানটি তুলনামূলক সহজ অংশ। আক্রমণকারী যানের প্রভাবকে লক্ষ্যবস্তুর সংযোজক শক্তির (cohesive energy) চেয়ে বেশি গতিশক্তি (kinetic energy) তৈরি করতে হবে এবং তাই এটিকে উড়িয়ে দিতে হবে। কঠিন অংশটি হলো প্রয়োজনীয় গতিতে সংঘর্ষের ব্যবস্থা করা এবং অবশ্যই, লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা।

আক্রমণকারী যানটি কক্ষপথে থাকে না। এটি সেকেন্ডে কয়েক কিলোমিটার গতিতে ব্যালিস্টিক আর্কের মাধ্যমে মহাকাশে ভ্রমণ করে, যখন এর কন্ট্রোল সিস্টেম কক্ষপথে থাকা লক্ষ্যবস্তুর গতি এবং দিক ট্র্যাক করে, যা আরও দ্রুত ভ্রমণ করছে। যানের গতিপথে সামান্যতম বিচ্যুতি, বা লক্ষ্যবস্তুর গতি ও দিকের এক মিনিটের ভুল গণনা মানে আক্রমণটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। যদি এটি আঘাত করে, তবে প্রভাবটি ধ্বংসাত্মক।

২০০৭ সালের পরীক্ষায় KKV-র ওজন প্রায় ৬০০ কিলোগ্রাম ছিল বলে মনে করা হয় এবং এটি ৩২,০০০ কিমি/ঘণ্টা সম্মিলিত আপেক্ষিক বেগে স্যাটেলাইটের সাথে সংঘর্ষ করেছিল। এমন গতিতে কঠিন বস্তু তরলের মতো আচরণ করে এবং দুটি যন্ত্র কার্যত একে অপরের মধ্য দিয়ে চলে যায়, একটি ধুলোর মেঘ তৈরি করে যাতে হাজার হাজার ছোটো ধাতব টুকরো ছিল। অন্যান্য মহাকাশচারী জাতিগুলো এতে খুব একটা খুশি ছিল না যে ফলস্বরূপ বর্জ্য, যার মধ্যে এক সেন্টিমিটারের চেয়ে বড়ো ৩৫,০০০-এরও বেশি টুকরো ছিল, তারপর লো আর্থ অরবিটে ছুটতে শুরু করে এবং অনেকেই এখনো সেখানে আছে। মহাকাশ ভ্রমণের ইতিহাসে আগের সমস্ত ঘটনার চেয়ে এই পরীক্ষায় বেশি বর্জ্য তৈরি হয়েছিল।

শিক্ষা নেওয়া হয়নি। ২০২১ সালে রাশিয়া তার নিজস্ব একটি স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে 'ডাইরেক্ট-এসেন্ট হিট-টু-কিল' ASAT পরীক্ষা ব্যবহার করে। অন্যান্য দেশও একই কাজ করেছে, কিন্তু মস্কো যেভাবে মিশনটি পরিচালনা করেছিল তা বেপরোয়া ছিল। স্যাটেলাইটটি ১,৫০০-এরও বেশি ধাতব টুকরোয় বিস্ফোরিত হয়, যা অবিলম্বে পৃথিবীর চারপাশে ছুটতে শুরু করে—আইএসএস-এর একই কক্ষপথে। বোর্ডে থাকা সাতজন, চারজন আমেরিকান, দুজন রাশিয়ান এবং একজন জার্মানকে, দুই ঘণ্টার জন্য তাদের ডক করা স্পেসশিপ ক্যাপসুলে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে দ্রুত পালানো যায়, যা শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি।

ইউএস স্পেস কমান্ড একটি বিবৃতি জারি করে : 'রাশিয়া সমস্ত জাতির জন্য মহাকাশ ডোমেইনের নিরাপত্তা, সুরক্ষা, স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের প্রতি ইচ্ছাকৃত

CamScanner

অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে।' জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াসহ অসংখ্য দেশ একমত হয়েছিল। রাশিয়া হয়নি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু বলেছিলেন এটি একটি রুটিন পদ্ধতি যা আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং এতে আইএসএস-এর কোনো বিপদ ছিল না।

ASAT স্যাটেলাইট নামানোর একমাত্র উপায় নয়। সমস্ত খেলোয়াড় তাদের ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সক্ষমতা বিকাশ অব্যাহত রাখবে—কাজ চলছে স্যাটেলাইটের সিস্টেমে হ্যাক করা এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া, মালিকদের অ্যাক্সেস অস্বীকার করা বা কেবল জ্যাম করে দেওয়া নিয়ে। তবে, প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখনো 'কাইনেটিক' বা গতিশীল অস্ত্র তৈরি করবে এই ভয়ে তারা কেবল ইলেকট্রনিক যুদ্ধের ওপর নির্ভর করবে না, যা আরও বেশি বর্জ্যের দিকে নিয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, ASAT নিষিদ্ধ করে একটি ব্যাপক চুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু এমনকি যদি এটি 'করা সম্ভব' মনেও হয়, তবুও এটি কঠিন। বিস্তারিত বিষয়গুলো খুব জটিল। আপনি কেবল লিখতে পারেন না, 'আমরা ASAT নিষিদ্ধ করতে সম্মত।' ভূমি-ভিত্তিক উপাদানের পাশাপাশি, টেক্সটে নির্দেশিত-শক্তি অস্ত্র (directed-energy weapons), হাই-পাওয়ার মাইক্রোওয়েভ, সাইবার সক্ষমতা, রোবোটিক মেকানিজম এবং এমনকি রাসায়নিক স্প্রেয়ারের বৈধতা বা অন্যথা সংজ্ঞায়িত এবং স্পষ্ট করতে হবে। বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোকেও জড়িত করতে হতে পারে।

২০১৪ সালে ASAT নিষিদ্ধ করার একটি প্রচেষ্টা ছিল। রাশিয়া এবং চীন একটি সংশোধিত খসড়া টেক্সটে আগ্রহী ছিল কারণ এটি কেবল মহাকাশ-ভিত্তিক ASAT নিষিদ্ধ করেছিল কিন্তু ভূমি-ভিত্তিক অস্ত্রের উন্নয়ন এবং মজুদ করার অনুমতি দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র সেই কারণে এর বিরোধিতা করেছিল এবং তারপর থেকে খুব একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। তবে, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দেয় এবং প্রথম দেশ হিসেবে 'ধ্বংসাত্মক, ডাইরেক্ট-এসেন্ট অ্যান্টি-স্যাটেলাইট মিসাইল টেস্টিং'-এর ওপর স্বেচ্ছাসেবী স্থগিতাদেশ ঘোষণা করে। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পরীক্ষাগুলোকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে এগুলো 'মহাকাশে আমরা যা করি তার অনেক কিছুকে বিপদে ফেলে'। তবে, 'ধ্বংসাত্মক' শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রকে কম্পিউটার টেস্টিং এবং মিসাইল ফায়ারিং পরিচালনা করার সুযোগ দেয় যা লক্ষ্যবস্তুতে প্রভাব ফেলে না।

নিকট ভবিষ্যতের জন্য, মনে হচ্ছে আমরা কেবল মহাকাশ বর্জ্য সমস্যা বাড়াব এবং আমাদের এটি পরিচালনা করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

CamScanner

তাহলে, আমরা কি কেবল গুলি করে আকাশ থেকে বর্জ্য নামিয়ে দিতে পারি? একটি বাধা হলো মহাকাশ বর্জ্য মোকাবিলার জন্য উদ্দিষ্ট যেকোনো যন্ত্রের দ্বৈত উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে, যারা নির্দেশিত শক্তি বা ডাইরেক্টেড এনার্জি ফায়ার করছে—ছোটো বর্জ্যের টুকরো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, অথবা বড়ো টুকরোগুলোকে বায়ুমণ্ডলে ঠেলে দেওয়ার জন্য যাতে সেগুলো পুড়ে যায়—তারা মহাকাশযান বা স্যাটেলাইট আক্রমণ করতেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বড়ো বর্জ্য, যেমন অকেজো স্যাটেলাইট, মহাকাশযানের মাধ্যমে সরানো যেতে পারে, কিন্তু আবার সরকারগুলো চিন্তা করে যে শত্রু বাহিনী মোতায়েনের জন্য এই ধরনের যান কভার হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে।

বর্জ্যের সমস্যা কমানোর অন্যান্য উপায় আছে। আমরা বিশ্বব্যাপী সম্মত স্পেস সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস (Space Situational Awareness) সিস্টেম চালু করতে পারি যা সমস্ত স্যাটেলাইটের তালিকা করে, তাদের দিকনির্দেশক ক্ষমতা জানে এবং তারপর তাদের ট্র্যাক করে। সমস্ত স্যাটেলাইটে ছোটো বুস্টার রকেট লাগানো যেতে পারে, যা তাদের সংঘর্ষ এড়াতে ম্যানুভার বা কৌশল করতে দেয় এবং তাদের কর্মজীবন শেষ হওয়ার পর তুলনামূলক দ্রুত কক্ষপথ থেকে পড়ে যেতে দেয়। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো নেট এবং হারপুন ব্যবহার করে ধাতুর বড়ো টুকরোগুলো ধরার সক্ষমতা সম্পন্ন মহাকাশযান তৈরির লোভনীয় চুক্তি নিশ্চিত করতে কাজ করছে। কিন্তু ধরুন জাপানের একটি স্পেস ট্র্যাশ-ক্লিয়ারিং বা মহাকাশ-আবর্জনা পরিষ্কারকারী কোম্পানি আমেরিকান প্রকল্পের জন্য পথ তৈরি করতে চীনা বর্জ্য, যার মধ্যে মৃত স্যাটেলাইটও আছে, সরানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি চুক্তি পেল?

প্রফেসর ডলম্যান এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরির চেষ্টাকারীদের মুখোমুখি হওয়া অসংখ্য সমস্যার তালিকা দিয়েছেন : 'সচেতনতা সিস্টেমটি এমন রেজোলিউশনে হতে হবে যা কেবল মহাকাশের সেন্সর থেকেই সম্ভব। কাঁচা তথ্য কে দেখতে পাবে? এটি আর কী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে? সম্ভাব্য সামরিক সুবিধাগুলো কী? দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হলো কে সম্মতি প্রয়োগ করবে? প্রয়োগকারীর কী ক্ষমতা থাকবে? কে টাকা দেবে? কার মহাকাশযান ব্যবহার করা হবে? এটি তৈরি, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের লাভজনক চুক্তি কে পাবে?' স্যাটেলাইট সম্পর্কিত যেকোনো পরিকল্পনা এবং প্রবিধান সামরিক এবং জাতীয় নিরাপত্তা সমস্যা থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে।

স্যাটেলাইটের জন্য 'সেফটি জোন' নির্ধারণ করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে হতে পারে যেখানে অন্য দেশের যন্ত্র কাজ করতে পারে না, কিন্তু এটি 'ইনোসেন্ট প্যাসেজ' বা

CamScanner

নির্দোষ চলাচল এবং নেভিগেশনের স্বাধীনতার অধিকারের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যা আমরা UNCLOS-এর অধীনে পৃথিবীর সমুদ্রপথের জন্য তৈরি করেছি। এটি ভবিষ্যতের চুক্তিগুলোকেও জটিল করে তুলবে যা একটি রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের স্যাটেলাইট পরিদর্শন করার অনুমতি দেয় যাতে নিশ্চিত করা যায় যে তাদের দ্বৈত ব্যবহার (বেসামরিক এবং সামরিক সক্ষমতা) নেই।

তাই অদূর ভবিষ্যতের জন্য, মহাকাশ বর্জ্য গুরুত্বপূর্ণ স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক এবং স্পেস স্টেশন এবং মানুষের জীবনের জন্য বিপদ হয়েই থাকবে।

অন্যান্য অসংখ্য ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে চুক্তির অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শক্তিশালী সোলার ফ্লেয়ার বা সৌর শিখা পৃথিবীতে আঘাত হানা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য এবং ইন্টারনেট যুগে এর একটি বিশাল তাৎক্ষণিক প্রভাব থাকবে যা বিশ্ব অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। লো আর্থ অরবিটের স্যাটেলাইটগুলোর পাশাপাশি পৃথিবীতে যোগাযোগের যন্ত্রগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে—'ইন্টারনেট অ্যাপোক্যালিপস', যা ব্ল্যাকআউট, দাঙ্গা এবং সাপ্লাই-চেইন বিঘ্ন ঘটাবে, পাশাপাশি আপনার শেষ সেকেন্ডের ইবে (eBay) বিড নষ্ট করে দেবে।

এর একটি ছোটো আকারের সংস্করণ আসলে খুব বেশিদিন আগে ঘটেনি। ১৯৮৯ সালের মার্চে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যে একটি বিশাল বিস্ফোরণ লক্ষ্য করেন। মিনিটের মধ্যে এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি টন গ্যাসের মেঘ ঘণ্টায় এক মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ কিলোমিটারের বেশি গতিতে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছিল। দুই দিন পরে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণার মেঘ আমাদের চৌম্বক ক্ষেত্রে আঘাত হানে, উত্তর আমেরিকার নিচে বৈদ্যুতিক স্রোত তৈরি করে। পরদিন ভোর ২:৪৪ মিনিটে একটি স্রোত কুইবেকের পাওয়ার গ্রিডে দুর্বলতা খুঁজে পায় এবং দুই মিনিট পরে কুইবেক প্রদেশের প্রতিটি আলো নিভে যায়। সেই সাথে প্রতিটি কম্পিউটার, ফ্রিজ, ওভেন, লিফট, ট্রাফিক সিগন্যাল এবং বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় এমন অন্য সবকিছুও বন্ধ হয়ে যায়। মহাকাশে বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঘুরতে থাকে। বিদ্যুৎ ফিরে আসতে বারো ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

যেহেতু আমাদের মৌলিক অবকাঠামো স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভর করে, যেমনটা আমাদের বাণিজ্য এবং সেনাবাহিনী করে, জাতিরাষ্ট্রগুলো সম্মিলিতভাবে তাদের রক্ষা করতে কী করছে? ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, আরভাইন-এর কম্পিউটার সায়েন্স বিশেষজ্ঞ সঙ্গীতা আবদু জ্যোতির কাছে এর উত্তর আছে : 'আমার জানা মতে, বড়ো আকারের সৌর ঝড় মোকাবিলার জন্য কোনো বৈশ্বিক চুক্তি বা পরিকল্পনা নেই।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুমান করে যে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিপর্যয়কর ঘটনার সময় অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিদিন ৪০ বিলিয়ন ডলার হবে। একটি সৌর ঝড় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করবে। এটি সত্ত্বেও, আমাদের সবচেয়ে খারাপ সৌর ঘটনার জন্য কোনো দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা নেই।' ইতিবাচক দিক হিসেবে তিনি বলেন যে পাওয়ার গ্রিড সেন্টরে পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে তা মূল্যায়নের জন্য ব্যাপক কাজ করা হচ্ছে এবং যেহেতু কিছু অঞ্চল বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, তাই কম-ঝুঁকির দেশগুলো সংযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য দ্রুত নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে পারে কি না তা দেখার জন্য গবেষণা করা হচ্ছে।

একই কথা প্রযোজ্য পৃথিবী ভুল সময়ে ভুল কক্ষপথে থাকার এবং ১ কিলোমিটারের চেয়ে বড়ো কোনো গ্রহাণুর আঘাতে পড়ার বিপদের ক্ষেত্রে। আমেরিকান বিজ্ঞানী এবং কমেডিয়ান বিল নাই যেমন বলেছেন, আকারের ওপর নির্ভর করে, সেটা হবে 'গেম ওভার। এটি সভ্যতার জন্য কন্ট্রোল-অল্ট-ডিলিট (Control-Alt-Delete)।'

অসমাব্য ঘটনা যে 'ডোন্ট লুক আপ' (Don't Look Up) সিনেমাটি সত্যি হয়ে গেলে কী করতে হবে তার জন্য আমাদের কোনো আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা নেই। তবে সবটাই নেতিবাচক নয়। নাসা,

আন্তর্জাতিক সহকর্মীদের সাথে, ডার্ট (DART) – ডাবল অ্যাস্টেরয়েড রিডাইরেকশন টেস্ট নামে একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছে—এটি দেখার জন্য যে পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষের পথে থাকা বড়ো বস্তুগুলোকে মিসাইল দিয়ে আঘাত করে দিক পরিবর্তন করা যায় কি না।

এর প্রথম পরীক্ষামূলক রান ২০২১ সালের নভেম্বরে স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটের মাথায় চড়ে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। ডার্ট মহাকাশযানটি, যা একটি বড়ো ফ্রিজ-ফ্রিজারের আকারের, ডিমরফোস (Dimorphos) নামে একটি নিয়ার-আর্থ বা পৃথিবীর কাছের গ্রহাণুতে পৌঁছাতে দশ মাস সময় নেয়, যার মাপ ১৬০ মিটার এবং এটি ডিডিমোস (Didymos) নামে একটি বড়ো গ্রহাণুকে প্রদক্ষিণ করে। এটি ২৩,৭৬০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে ডিমরফোসকে সরাসরি আঘাত করে, যার ফলে এটি সামান্য দিক পরিবর্তন করে এবং ডিডিমোসের চারপাশে তার তৎকালীন বারো ঘণ্টার কক্ষপথ বত্রিশ মিনিট কমিয়ে দেয়। এটি ছিল একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত, প্রথমবার মানুষ কোনো গ্রহাণুর কক্ষপথ পরিবর্তন করেছিল—এবং ৩২৫ মিলিয়ন ডলার খরচে, এটি ছিল সদ্ব্যবহার করা অর্থ।

CamScanner

যদি প্রধান মহাকাশচারী দেশগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে সহযোগিতা উৎসাহিত করার জন্য আইন থাকত, তবে এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করা সহজ হতো। বিশ্বের দুটি বৃহত্তম শক্তি তাদের মতপার্থক্য সরিয়ে রাখবে আশা করাটা সরলতা, কিন্তু যদি তারা সেগুলো মেনে নিতে পারে এবং তাদের পারস্পরিক সন্দেহের ঊর্ধ্বে দেখতে পারে, তবে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা বিনিময় করে উভয়ই ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে, যেমনটা গ্রহের বাকিরাও হবে। চীন ইতোমধ্যেই একটি 'অ্যাস্টেরয়েড ডিফ্লেকশন সিস্টেম' বা গ্রহাণু বিচ্যুতি ব্যবস্থা তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যাতে পৃথিবীর দিকে সরাসরি ধেয়ে আসা যেকোনো শহরের আকারের পাথরের টুকরো থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করা যায়।

আসা বস্তুগুলো শনাক্ত করার প্রযুক্তি এতটাই উন্নত হয়েছে যে আমরা সেগুলোকে পঁচিশ বছরেরও বেশি আগে শনাক্ত করতে পারি। অ্যাপোফিস (Apophis) নামে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের মতো বড়ো একটি গ্রহাণু আছে যা ২০০৪ সালে প্রথম দেখা গিয়েছিল এবং দ্রুত শনাক্ত করা হয়েছিল যে ২০২৯ সালে আমাদের আঘাত করার ২.৭ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে। সুখের বিষয়, পরে এটি পুনঃমূল্যায়ন করা হয় যে এটি ১০০ শতাংশ 'নিয়ার-মিস' বা অল্পের জন্য রক্ষা হবে, কারণ এটি পৃথিবীর ৩৭,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে দিয়ে যাবে। তবে এটা বেশ কাছে। এটি ২০২৯ সালেই ঘটবে; ১৩ এপ্রিল, যদি আপনি আপনার ডায়েরিতে তারিখটি টুকে রাখতে চান। কিছু সময়ের জন্য ভাবা হয়েছিল অ্যাপোফিস ২০৬৮ সালে আবার ঘুরে আসার সময় আমাদের আঘাত করতে পারে, কিন্তু ২০২১ সালের আপডেট গবেষণা দেখিয়েছে যে তা হবে না।

নিরাপত্তা ভয়ের পাশাপাশি যা এই ক্ষেত্রগুলোতে চুক্তি বাধাগ্রস্ত করে, সরকারি বাজেটের সমস্যাও রয়েছে, বিশেষ করে গণতন্ত্রে যেখানে এই বিষয়গুলো যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উন্মুক্ত। সমস্যাটি হলো এভারেট ডলম্যান যাকে 'ক্যাটরিনা সিনড্রোম' বলেন। হারিকেন ক্যাটরিনা নিউ অরলিন্সে আঘাত হেনেছিল

২০০৫ সালে, যাতে ১,৮০০-এরও বেশি মানুষ মারা যায়। এটিকে 'একশো বছরের' হারিকেন বলা হয়েছিল—এমন কিছু যা শতাব্দীতে একবার ঘটতে পারে। সম্ভাব্য 'একশো বছরের' ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে ভোটারদের উচ্চ কর দিতে রাজি করানো অনেক কঠিন, কিন্তু গভীর মহাকাশ থেকে আসা '১০,০০০-বছরের' ঘটনা... সেই প্ল্যাটফর্মে কে প্রচারণা চালাতে চায়?

CamScanner

তবুও, বিজ্ঞানী, মহাকাশ বিশেষজ্ঞ, যুদ্ধ কৌশলী এবং পরিবেশবাদীদের মধ্যে সচেতনতা রাজনীতিবিদদের কাছে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট সময় ধরে সতর্কঘণ্টা বাজছে।

এখানে আলোচিত কোনো কিছুই হয়তো ঘটবে না, কিন্তু পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো ছাড়া সেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করার প্রলোভন বাড়ে, বিশেষ করে যখন এক দেশ ভয় পায় অন্য দেশ হয়তো সুবিধা নিচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যেই মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আছি এবং এটি বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রায়শই মানুষ অন্য যুগের চুক্তির ওপর নির্ভর করে, বিশেষ করে আউটার স্পেস ট্রিটি।

আমাদের আরও স্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতা, ভাগ করা সম্পদ, বর্জ্য সংগ্রহ, মহাকাশযান নিষ্পত্তি, চলাচলের স্বাধীনতা, সংঘাত নিরসন, ডেটা প্রকাশ, পরিস্থিতিগত সচেতনতা এবং মহাকাশ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার প্রতি ভাগ করা প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন, যা একটি সম্মানিত নিয়ম-ভিত্তিক ব্যবস্থার মধ্যে হবে এবং যাতে সব পক্ষ একমত হবে। 'বিগ থ্রি' বা তিন বড়ো মহাকাশ শক্তি—চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া—বর্তমানে খুব কম বিষয়েই একমত এবং তারা জানে যে মহাকাশে যা ঘটে তা পৃথিবীতে যা ঘটে তার সম্প্রসারণ। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং একে অপরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান—চীনা এবং আমেরিকানরা উভয়ই মহাকাশের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক নিয়ম লিখতে চায়। অন্য সবাইকে তাদের বোঝাতে হবে যে সহযোগিতা করা তাদের স্বার্থেই।

মহাকাশ সম্পর্কে আমাদের যে আইনি ব্যবস্থাগুলো আছে সেগুলো সামুদ্রিক আইনের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রের ব্যাপক হওয়ার ধারেকাছেও নেই। সেগুলোকে ব্যাপকভাবে আপডেট করা দরকার এবং কিছু ক্ষেত্রে বাতিল করে নতুন করে তৈরি করা দরকার। প্রযুক্তি আইনকে ছাড়িয়ে গেছে। আইন ছাড়া, ভূ-রাজনীতি—এবং এখন মহাকাশ-রাজনীতি—একটি জঙ্গল।

CamScanner

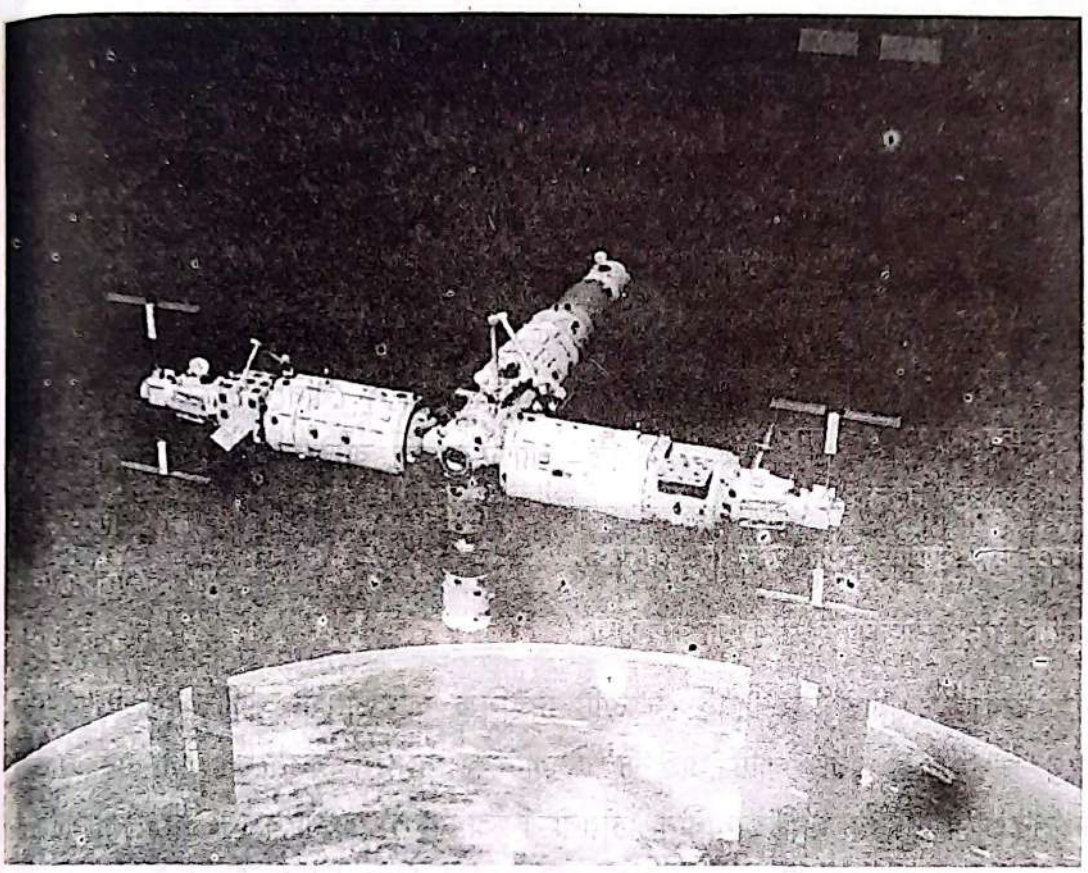
অধ্যায়-৫

চীন : লং মার্চ থেকে মহাকাশ অভিযান

(THE LONG MARCH . . . INTO SPACE)

'যে আগে পৌঁছায়, সে-ই প্রথমে সফল হয়।'

— চীনা প্রবাদ



চীনা তিয়ানগং মহাকাশ স্টেশনের চিত্রায়ন

সাল ২০৬১। পৃথিবীর উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে গেছে। বিশাল এক সূর্য থেকে বাঁচতে গ্রহটি ভ্রমণে বেরিয়েছে। এটি আর ঘোরে না কারণ পৃথিবীর একপাশে হাজার হাজার ফিউশন-চালিত ইঞ্জিন এটিকে আমাদের সৌরজগত জুড়ে চালিত করছে। সূর্য

থেকে এটি যত দূরে যাচ্ছে, ততই এটি ঠান্ডা হচ্ছে। অর্ধেক জনসংখ্যা মৃত এবং বেঁচে থাকা মানুষরা বিশাল ভূগর্ভস্থ শহরে বাস করে। কিন্তু পৃথিবীকে আলফা সেন্টাউরিতে পৌঁছাতেই হবে, যেখানে একটি পুরোপুরি ভালো, অপ্রসারিত সূর্য আছে যা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে দেবে। '৪.৫ আলোকবর্ষের যাত্রা শুরু হয় একটি মাত্র পদক্ষেপ দিয়ে', যেমনটা কনফুসিয়াস কখনো বলেননি।

এটি ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া সম্পূর্ণ পাগলাটে এবং উপভোগ্য চীনা সাই-ফাই মুভি 'দ্য ওয়ান্ডারিং আর্থ'-এর প্লট। মুক্তির পর এটি দেশের ভেতরে ব্যাপক হিট হয়েছিল, বক্স-অফিসের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। এটি আন্তর্জাতিকভাবে নেটফ্লিক্সে দেখানো হয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী এটি সর্বকালের পঞ্চম সর্বোচ্চ আয়ের অ-ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্রে পরিণত হয়েছে। এটি বেশ কয়েকটি স্তরে আকর্ষণীয়, বিশেষ করে এটি সফট পাওয়ার বা কোমল শক্তি এবং চীন কীভাবে মহাকাশ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে সে সম্পর্কে যা বলে তার জন্য।

পরিচালক ফ্র্যান্ট গো বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি আখ্যান বা ন্যারেটিভ রয়েছে যে মানবতা শেষ পর্যন্ত পৃথিবী ছেড়ে 'অন্তহীন সীমান্ত' বা অসীম মহাকাশে বসতি স্থাপন করবে এবং এটি আমেরিকান সায়েন্স ফিকশন সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু, তিনি যুক্তি দেন, চীনা আখ্যান হলো মহাকাশ সম্পদ ব্যবহার করে পৃথিবীতে জীবন উন্নত করা। এটি 'দ্য ওয়ান্ডারিং আর্থ'-এর অন্যতম থিম। গো 'দ্য হলিউড রিপোর্টার'-কে বলেছিলেন : 'হলিউড চলচ্চিত্রে যখন পৃথিবী এই ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়, তখন নায়ক সবসময় মহাকাশে বেরিয়ে পড়ে একটি নতুন বাড়ি খুঁজতে; যা খুব আমেরিকান পদ্ধতি—অ্যাডভেঞ্চার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ...কিন্তু আমার ছবিতে, আমরা পুরো পৃথিবীকে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি দল হিসেবে কাজ করি। এটি চীনা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে আসে—মাতৃভূমি, ইতিহাস এবং ধারাবাহিকতা।'

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এটি চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির (CCP) বার্তার সাথে খাপ খায় এবং পার্টি এই চলচ্চিত্রটিকে সমর্থন করেছে। গো-এর মুভিটি আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'চায়না ফিল্ম গ্রুপ কর্পোরেশন' দ্বারা প্রযোজিত হয়েছিল এবং যেমনটা চীনে স্বাভাবিক, এটিকে সিসিপি-র প্রচার বিভাগের অনুমোদন নিতে হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুপারিশ করেছিল যে এটি সারা দেশের স্কুলে দেখানো হোক। পার্টির সেন্ট্রাল কমিশন ফর ডিসিপ্লিন ইন্সপেকশন এটির প্রশংসা করতে বাধ্য বোধ করেছিল এবং বেইজিংয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রচারের জন্য তাদের অংশটুকু করেছিল, মুখপাত্র হুয়া চুনয়িং সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আমি জানি

এখনকার সবচেয়ে আলোচিত মুভি হলো "দ্য ওয়ান্ডারিং আর্থ"। আমি জানি না আপনারা দেখেছেন কি না। আমি এটি দেখার পরামর্শ দেবো।' ঠিক আছে, কিন্তু কেউ তাকে চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনি।

আরও একটি ন্যায্য কথা হলো, যদিও ছবিতে একটি 'ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট' বা বিশ্ব সরকার রয়েছে, তবুও এটি একটি চীনা নেতৃত্বাধীন পরিকল্পনা এবং চীনা নায়করাই পৃথিবীকে বাঁচায়, যদিও একজন বন্ধুভাবাপন্ন রাশিয়ান কসমোনটের কিছুটা সাহায্য ছিল। আমেরিকানদের এটি করার থেকে এটি একটি পরিবর্তন, যারা সাধারণত এসব করার সময় 'আই এম টু ওল্ড ফর দিস শিট!' (এসবের জন্য আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে!) জাতীয় কথা বলে। 'দ্য ওয়ান্ডারিং আর্থ'-এ এর মোটামুটি সমতুল্য দৃশ্য আসে যখন একজন সৈনিক বৃহস্পতি গ্রহের দিকে একটি অসম্ভব বড়ো মেশিনগান চালাতে চালাতে চিৎকার করে বলে, 'স্ক্রু ইউ, ড্যাম জুপিটার!" (তোর নিকুচি করি, শয়তান বৃহস্পতি!) এই স্ক্রিপ্ট লাইনটি সম্ভবত আপনাকে বলে দেবে আপনি সিনেমাটি দেখতে চান কি না।

তবে সিসিপি নেতৃত্ব অবশ্যই চায় আপনি ছবিটি দেখুন, কারণ 'দ্য ওয়ান্ডারিং আর্থ' 'শি জিনপিং চিন্তা'-র সাথে বেশ ভালোভাবে মিলে যায়। বেইজিং জানে যে তার ক্রমবর্ধমান মহাকাশ সক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশগুলোর দ্বারা হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। সিনেমার মতো সফট পাওয়ার ব্যবহার করে তারা বিদেশী দর্শকদের বোঝাতে পারে যে তাদের কার্যকলাপে ভয়ের কিছু নেই এবং একই সাথে দেশের ভেতরে জাতীয় গর্ব এবং আগ্রহ বাড়াতে পারে।

চীনা প্রেসিডেন্ট দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণাটি প্রচার করছেন যে চীনের মহাকাশ কর্মসূচি কারও জন্য হুমকি নয়; প্রকৃতপক্ষে, এটি আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে এবং মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করতে চায়। তাহলে কি তাদের মহাকাশ কর্মসূচি, যা সম্পূর্ণ এবং সরাসরি পিপলস লিবারেশন আর্মি (PLA) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তা কি সমস্ত মানবতার উপকারের জন্য?

তা নয়—কিন্তু আবার, অন্য কোনো দেশেরটাও নয়। তবে, চীনের মহাকাশ কর্মসূচি অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি সামরিকায়িত। চায়না ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (CNSA) 'স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফর ন্যাশনাল ডিফেন্স'-এর অধীনে আসে। এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে এটি 'সামরিক বাহিনী শক্তিশালী করতে' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 'জাতীয় প্রতিরক্ষা, সামরিক বাহিনী, জাতীয় অর্থনীতি এবং সামরিক-সম্পর্কিত সংস্থাগুলোর প্রয়োজন মেটায়'। রকেট উৎক্ষেপণ সাইটগুলো সরাসরি পিএলএ তাদের স্ট্র্যাটেজিক সাপোর্ট

CamScanner

ফোর্সের মাধ্যমে পরিচালনা করে, যারা মহাকাশ, সাইবার এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার মিশনের জন্য দায়ী। মহাকাশচারী বা টাইকোনাটদের (taikonauts) দায়িত্বে থাকা বিভাগটি 'সেন্ট্রাল মিলিটারি ইকুইপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট'-এর অধীনে আসে।

এর কোনোটিই গোপন নয়, কিন্তু চীন এটি প্রচার করতে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হয় না। চীনা ভাষার সরকারি ওয়েবসাইটগুলো সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে খোলামেলা, এমনকি ইউনিফর্ম পরা সিনিয়র কর্মকর্তাদের ছবিও প্রকাশ করে, কিন্তু তাদের ইংরেজি ভাষার সংস্করণগুলোতে এর খুব কম উল্লেখ থাকে।

শি জিনপিং বিশ্বাস করেন যে চীনের বিশ্বে আরও নেতৃত্বের ভূমিকা থাকা উচিত এবং চীন মহাকাশকে ভবিষ্যতের জন্য তার পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখে। আধুনিকীকরণের প্রতি এটি একটি 'টেকনো-জাতীয়তাবাদী' পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং পুরোপুরি বোঝে যে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাকে প্রযুক্তিগত নেতা হতে হবে।

১৯৫০-এর দশকে চেয়ারম্যান মাও শি-এর মতোই চিন্তা করছিলেন। তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে চীন মহাকাশে একটা আলুও পাঠাতে পারে না। কেউ জিজ্ঞেস করার সাহস করেনি কেন তিনি এমন কিছু চাইতে পারেন এবং ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে, তখনো একটি দরিদ্র এবং মূলত কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও, দূরপাল্লার মিসাইল এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

আমেরিকার ওয়ের্নহার ভন ব্রাউন এবং রাশিয়ার সের্গেই কোরোলেভ-এর চীনা সংস্করণ ছিলেন কিয়ান জুয়েসেন (১৯১১-২০০৯), দেশটির তৈরি অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী, যাকে 'চীনা রকেট্রি-এর জনক' হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ন্যাশনাল চিয়াও তুং ইউনিভার্সিটি (বর্তমানে সাংহাই জিয়াও টং ইউনিভার্সিটি) থেকে ক্লাসের সেরা হিসেবে স্নাতক হন, তারপর ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)-তে এবং পরে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (Caltech)-তে পড়াশোনা করতে যান, যেখানে তিনি প্রায় দুই দশক ছিলেন। সেখানে, প্রফেসর থিওডোর ভন কার্মান-এর তত্ত্বাবধানে, তিনি ক্যাম্পাসে রকেট তৈরির প্রচেষ্টা এবং তার ফলে উদ্বায়ী রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে দুর্ঘটনার কারণে 'দ্য সুইসাইড স্কোয়াড' ডাকনামের একটি দলের অংশ ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিয়ান জার্মানির ভি-১ এবং ভি-২ রকেটের প্রতি আমেরিকার প্রতিক্রিয়া এবং ম্যানহাটান প্রজেক্টে কাজ করেছিলেন, যা প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছিল। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এর অস্থায়ী পদ পাওয়ার পর, কিয়ানকে

CamScanner

জার্মানিতে পাঠানো হয়েছিল ভি-রকেট বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার নিতে, যার মধ্যে ভন ব্রাউনও ছিলেন। যুদ্ধের শেষে তাকে জেট প্রপালশন বা জেট চালনা বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

এই সবকিছুর কোনো মূল্য ছিল না যখন ১৯৪৯ সালে, কমিউনিস্ট পার্টি যখন চীনের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছিল, তখন আমেরিকানরা কিয়ানকে কমিউনিস্ট সহানুভূতিশীল হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। ১৯৫০ সালে তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বা নিরাপত্তা ছাড়পত্র কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে গৃহবন্দি করা হয়। এরপর চীনে ফেরার জন্য তার আবেদন মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখ্যান করে কারণ তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি খুব বেশি জানতেন। ১৯৫৫ সালে যখন তাকে শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তিনি চীনে রওনা হন এবং সাংবাদিকদের বলে যান যে তিনি আর কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখবেন না। তিনি তার কথা রেখেছিলেন। আমেরিকার ক্ষতি—এবং চীনের লাভ।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কমিউনিস্টরা যখন চীনে তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্ত করছিল, তখন তারা আমেরিকান এবং সোভিয়েতদের স্পেস রেসে বিলিয়ন ডলার খরচ করতে দেখছিল। কে জিতল সেই বড়াই করার অধিকারের চেয়ে চীনাদের কাছে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রকেট যত বড়ো এবং দূরপাল্লার হচ্ছিল, বেইজিং ততই শঙ্কিত হচ্ছিল যে সেগুলোকে সামরিকায়িত করা হতে পারে এবং চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। তাই কিয়ানকে বিজ্ঞানীদের একটি প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে লাগানো হয়েছিল যারা চীনের পারমাণবিক বোমা এবং দেশটির ডংফেং ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম তৈরিতে সাহায্য করেছিল।

১৯৫৬ সালে, 'ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহায়তার' চেতনায়, সোভিয়েতরা কিয়ানকে তাদের আর-১ রকেটের ব্লুপ্রিন্ট বা নকশা দিয়েছিল এবং চীনা ব্যালিস্টিক প্রোগ্রাম শুরু করতে বেইজিংয়ে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল। গোবি মরুভূমিতে একটি পরীক্ষার স্থান তৈরি করা হয়েছিল এবং ডজনখানেক চীনা ছাত্রকে প্রশিক্ষণের জন্য মস্কোতে পাঠানো হয়েছিল।

চীনারা আরও আধুনিক রকেটের অ্যাক্সেস চেয়েছিল, কিন্তু 'ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহায়তার' সীমা ছিল এবং রাশিয়ানরা তাদের সর্বশেষ প্রযুক্তি অন্য দেশে হস্তান্তরিত হতে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। চীনা ছাত্ররা সীমিত নথিপত্র কপি করে এবং তাদের প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান বের করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

মস্কো এবং বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন ইস্যুতে খারাপ হচ্ছিল, যার মধ্যে সুদূর পূর্বে একটি সীমান্ত বিরোধ এবং উভয়ই কমিউনিস্ট বিশ্বের নেতৃত্ব দাবি করছিল,

CamScanner

প্রত্যেকেই জোর দিয়ে বলছিল যে তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংস্করণটিই কমিউনিজমের সঠিক রূপ। চেয়ারম্যান মাও এও মনে করতেন যে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ পশ্চিমের 'রানিং ইয়েলো ডগ ক্যাপিটালিস্ট' বা 'পুঁজিবাদী হলুদ কুকুর' জাতিগুলোর বিরুদ্ধে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক নন।

১৯৬০ সালের মধ্যে সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু তারা যা জানত তার ওপর ভিত্তি করে চীনারা ডংফেং বা 'পুবের বাতাস' ক্লাসের মিসাইল তৈরি করতে সক্ষম হয়, যার স্বল্প, মধ্যম, অন্তর্বর্তী এবং শেষ পর্যন্ত আন্তঃমহাদেশীয় পাল্লার সক্ষমতা ছিল, যা সিলো বা মোবাইল লঞ্চার থেকে ছোঁড়া যেত। কিয়ান প্রযুক্তিগত জ্ঞানের এই দ্রুত আত্মীকরণ ব্যবহার করে চীনের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের তদারকি করেন এবং চীনা মহাকাশ কর্মসূচির ভিত্তি স্থাপন করেন।

কিয়ান একজন জাতীয় বীর এবং তাকে উৎসর্গ করে একটি সম্পূর্ণ জাদুঘর রয়েছে যেখানে ৭০,০০০ নিদর্শন রয়েছে। তার গল্পটি প্রমাণের ওপর ভিত্তি না করে কেবল সন্দেহের বশে বাইরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রত্যাখ্যান করার বিরুদ্ধে একটি সতর্কবার্তা। প্রাক্তন মার্কিন নৌসচিব ড্যান কিম্বল কিয়ানের প্রতি আমেরিকার আচরণকে বলেছিলেন 'এই দেশটি এযাবৎকালের সবচেয়ে বোকামিপূর্ণ কাজ'।

১৯৬৭ সালে মাও মহাকাশে একজন টাইকোনাট পাঠানোর আদেশ দেন এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম প্রার্থীদের বাছাই করা হয়। কিন্তু কালচারাল রেভোলিউশন বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিশৃঙ্খলায় দেশটি ডুবে যাওয়ায় প্রোগ্রামটি বাতিল করা হয়, যে সময়ে অনেক বিজ্ঞানীকে বন্দি বা হত্যা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, চীনের স্যাটেলাইট প্রোগ্রামের প্রধান ঝাও জিউঝাং-কে 'প্রতিবিপ্লবী' হিসেবে নিন্দা করা হয়েছিল এবং রেড গার্ডরা তাকে মারধর করেছিল। ধারণা করা হয় তিনি বেইজিংয়ের একটি লেকে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই বিপত্তিগুলো সত্ত্বেও, ১৯৭০ সালের ২৪ এপ্রিল চীনের প্রথম স্যাটেলাইট কক্ষপথে পাঠানো হয়। এটি আটাশ দিন ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এভাবে চীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জাপানের পরে কক্ষপথে স্যাটেলাইট পাঠানো পঞ্চম দেশে পরিণত হয়। যন্ত্রটির ভেতরের পাঁচটি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছিল 'দ্য ইস্ট ইজ রেড' গানটি পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য যাতে আমরা সবাই গানের কথাগুলো (প্রতি ত্রিশ সেকেন্ডে পুনরাবৃত্তি হওয়া) উপভোগ করতে পারি : 'পুব দিক লাল। সূর্য উঠেছে। চীন একজন মাও সে তুং-কে জন্ম দিয়েছে!' চীনে ২৪ এপ্রিল এখন 'স্পেস ডে' বা মহাকাশ দিবস।

CamScanner

সেখান থেকে, প্রোগ্রামটি দ্রুত এগিয়ে যায়। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ চীন নিয়মিতভাবে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করছিল এবং অন্য দেশগুলোকে তার সুবিধা দিচ্ছিল।

প্রথম কয়েক দশক ধরে, চীনের মহাকাশ কর্মসূচি মূলত সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জনের বিষয় ছিল, পাশাপাশি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট ব্যবহার করা এবং, দেশটি যখন শিল্পায়িত হতে শুরু করে, তখন কোথায় রাস্তা এবং রেলপথ তৈরি করতে হবে তা ঠিক করার জন্য। তবে এই শতাব্দীতে কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের কাছে চীনের অবস্থান বোঝাতে এর উপযোগিতা বুঝতে পেরেছে—অর্থাৎ, এটি এমন একটি দেশ যা সামরিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম এবং যার প্রধান শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চীন যখন ২০০৭ সালে একটি কাইনেটিক কিল ভেহিকল (KKV) ব্যবহার করে ইচ্ছাকৃতভাবে তার নিজস্ব আবহাওয়া স্যাটেলাইট ধ্বংস করে, তখন অন্যান্য দেশগুলো এর ফলে সৃষ্ট মহাকাশ বর্জ্য দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল কিন্তু মুগ্ধ এবং শঙ্কিত—হয়েছিল যে চীনারা বুলেটের মাধ্যমে বুলেট আঘাত করার সমতুল্য কাজ করে দেখিয়েছে : প্রায় ২৯,০০০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে ভ্রমণ করে, আঘাতের মাত্র এক সেকেন্ড আগে, কেকেভি তার গতিপথে তিনটি বিদ্যুৎ-গতির সমন্বয় করে ২-মিটার লম্বা স্যাটেলাইটটিকে সরাসরি আঘাত করে।

চীন বলেছিল তারা মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতার অংশ নয় কারণ তারা কখনো এমন কিছুতে জড়িত হবে না। যদি তাই হয়, তবে বেইজিং মহাকাশে শত্রু লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য ভূমি-ভিত্তিক নির্দেশিত-শক্তি অস্ত্র বা ডাইরেক্টেড-এনার্জি ওয়েপন নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে—এই অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন। এর অর্থ এটাও যে চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বড়ো বিল্ডিংগুলো, যেগুলোর ছাদ সরে যায় যাতে আকাশ দেখা যায় এবং গম্বুজগুলো যা টার্গেটিংয়ের জন্য স্থাপন করা যেতে পারে, সেগুলো সম্ভবত কেবল উৎসাহী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই ব্যবহার করেন।

২০২২ সালের শুরুর দিকে, বেইজিং তার মহাকাশ কর্মসূচির ওপর একটি 'পারস্পেকটিভ' বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে, যা শুরু হয় প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে : 'বিশাল মহাকাশ অন্বেষণ করা, মহাকাশ শিল্পের বিকাশ এবং চীনকে একটি মহাকাশ শক্তিতে পরিণত করা আমাদের অনন্ত স্বপ্ন।' পুরো নথি জুড়ে উল্লেখ রয়েছে কীভাবে মহাকাশ শিল্প চীনের প্রবৃদ্ধিতে এবং 'মহাকাশ অন্বেষণ ও ব্যবহার এবং মানুষের অগ্রগতির বিষয়ে বৈশ্বিক ঐকমত্য এবং সাধারণ প্রচেষ্টায়' অবদান রাখবে। নথিটি চীনের এযাবৎকালের অর্জনগুলোর তালিকা দিয়ে চলতে থাকে

এবং উদ্দেশ্যের বিবৃতি দিতে থাকে। পরবর্তী প্রজন্মের মনুষ্যবাহী মহাকাশযান, চাঁদে মানুষ নামানো, চাঁদে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা স্টেশন, গ্রহাণু এবং গভীর মহাকাশ অনুসন্ধানের পরিকল্পনা রয়েছে। 'জুপিটার সিস্টেমের অনুসন্ধান এবং আরও অনেক কিছু' (and so forth) নিয়ে একটি বাক্যও রয়েছে, যা কৌতূহল জাগায়, কিন্তু 'আরও অনেক কিছু' হয়তো অনুবাদে কিছু হারিয়েছে।

এর মিশন ভিশন বা লক্ষ্য হলো 'অবাধে প্রবেশ এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার কার্যকরভাবে মহাকাশ পরিচালনা করা'। 'অবাধে প্রবেশ' এবং 'কার্যকরভাবে পরিচালনা' অংশগুলো আমেরিকানদের এবং চীনকে স্বর্গে তার জায়গা নিতে অস্বীকার করার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি সতর্কবার্তা। ২০১৭ সালে এর লুনার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রামের প্রধান, ইয়ে পেজিয়ান বলেছিলেন : 'আমরা যদি এখন সেখানে না যাই যদিও আমরা তা করতে সক্ষম, তবে আমাদের বংশধররা আমাদের দোষারোপ করবে। যদি অন্যরা সেখানে যায়, তবে তারা দখল করে নেবে এবং আপনি চাইলেও যেতে পারবেন না। এটাই যথেষ্ট কারণ।'

নথিটি স্পষ্টভাবে আহ্বান জানিয়েছে যেন 'মহাকাশ বিষয়ক ব্যবস্থাপনায়' জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকে। এটি উল্লেখ করে যে ২০১৬ সাল থেকে চীন পাকিস্তান, সৌদি আরব, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং থাইল্যান্ডসহ উনিশটি দেশ ও অঞ্চল এবং চারটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে মহাকাশ চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এটি ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি, সুইডেন, জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসের সাথে সহযোগিতার ওপর জোর দেয়। এটি গর্ব করে বলে যে এটি বিভিন্ন দেশের জন্য স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রদান করেছে এবং লাওস ও মিয়ানমারের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তার সুবিধাগুলো খুলে দিয়েছে।

এসবই বেইজিং যাকে মহাকাশ শাসনে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের চেষ্টা হিসেবে দেখে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। বছরের পর বছর ধরে, আমেরিকার সাথে সহযোগিতার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান একজন টাইকোনাটকে ইউএস স্পেস শাটলে জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে একদল চীনা বিজ্ঞানীর হিউস্টনের জনসন স্পেস ক্রাফট সেন্টারে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই বছরের জানুয়ারিতে চ্যালেঞ্জার শাটল উৎক্ষেপণের তিয়াত্তর সেকেন্ড পরে বিস্ফোরিত হয় এবং সাতজন ক্রু সদস্যই মারা যান। সফরটি বাতিল করা হয় এবং সমস্ত 'গেস্ট প্রোগ্রাম' অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়।

এখন, ২০১১ সালের উলফ অ্যামেন্ডমেন্ট বা উলফ সংশোধনীর অধীনে কংগ্রেস নাসার চীনের সাথে সহযোগিতা করার ক্ষমতা সীমিত করার পর আর্টেমিস অ্যাকর্ডস থেকে চীনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ফ্র্যাঙ্ক উলফ-এর যুক্তি ছিল যে মহাকাশ অন্বেষণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং চীনের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক এমন যে যুক্তরাষ্ট্র তার ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সহযোগিতার ঝুঁকি নিতে পারে না। বিশেষ করে, নাসা কম্পিউটার এবং যৌথ ইউএস-চীনা গবেষণা থেকে মেধা সম্পদ (intellectual property) চুরির সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ ছিল, যা বেইজিং ব্যালিস্টিক মিসাইলসহ সংবেদনশীল সামরিক প্রযুক্তিতে প্রয়োগ করতে পারে।

চীনা হ্যাকাররা ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স, সেক্রেটারি অফ ডিফেন্সের অফিস, ইউএস নেভাল ওয়ার কলেজ, পেন্টাগন, একটি পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণাগার এবং হোয়াইট হাউসের কম্পিউটার সিস্টেমে সংক্ষিপ্তভাবে প্রবেশাধিকার পেয়েছে বলে জানা গেছে। আরও প্রথাগত গুপ্তচরবৃত্তির কার্যকলাপও উন্মোচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালে ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত আমেরিকান পদার্থবিদ শু কোয়ান-শেং বেইজিংয়ে মার্কিন রকেটের তরল হাইড্রোজেন ট্যাঙ্ক সম্পর্কে তথ্য পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। ২০১০ সালে বোয়িং-এর প্রাক্তন প্রকৌশলী ডংফান চুং চীনকে ৩,০০,০০০ পৃষ্ঠারও বেশি সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, যার মধ্যে ইউএস স্পেস শাটল সম্পর্কে ডেটাও ছিল।

বাদ পড়ার প্রতিক্রিয়ায় চীন আইএসএস-এর প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করেছে, অনেক দেশের সাথে কৌশলগত বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং একটি অভ্যন্তরীণ মহাকাশ শিল্প তৈরি করেছে যা অন্তত আমেরিকার মতোই অত্যাধুনিক দেখায়। এটি আমেরিকানদের কোনো ইনপুট বা পর্যবেক্ষণ ছাড়াই অর্জিত হয়েছে।

চিত্তাকর্ষক। এবং দ্রুত, যেহেতু ২০০৩ সালে প্রথম চীনা ব্যক্তি মহাকাশে গিয়েছিলেন : আটত্রিশ বছর বয়সি সামরিক পাইলট লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াং লিওয়েই। তার ক্যাপসুলটি কক্ষপথে পাঠানো হয়েছিল চীনাদের তৈরি একটি রকেট, চ্যাংঝং ২এফ-এর মাধ্যমে। ইয়াং লিওয়েই একুশ ঘণ্টার ফ্লাইটে পৃথিবীকে চৌদ্দবার প্রদক্ষিণ করেন—এবং চীন মহাকাশে মানুষ পাঠানো তৃতীয় দেশে পরিণত হয়। চায়না ডেইলি পত্রিকা একে 'গ্রেট লিপ স্কাইওয়ার্ড' বা 'আকাশের দিকে মহান উল্লম্ফন' বলে অভিহিত করেছিল।

অর্জন আসতেই থাকল। ২০১২ সালে প্রথম চীনা নারীকে মহাকাশে দেখা গেল—ফাইটার পাইলট মেজর লিউ ইয়াং। ২০১৪ সালে চীন ওয়েনচাং-এ তার নতুন, উপকূলীয় স্পেসপোর্ট বা মহাকাশ বন্দর সম্পন্ন করে, বিশেষ করে বড়ো-ব্যাসের

CamScanner

চ্যাংঝং রকেটগুলোর জন্য, যা জলের ওপর দিয়ে উৎক্ষেপণ করা প্রয়োজন। ২০১৬ সালে দুইজন টাইকোনাট চীনের তিয়ানগং ২ স্পেস স্টেশনে এক মাস কাটান যখন তাদের যানটি সফলভাবে এর সাথে ডক করে।

২০১৯ সালে চালকবিহীন চ্যাং'ই ৪ চাঁদের উলটো পিঠে বা ফার সাইডে অবতরণকারী প্রথম মহাকাশযান হয়ে ওঠে। মিশনটি ছিল চীনা এবং আমেরিকানদের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনার আরেকটি উদাহরণ। নাসাকে অবতরণ স্থানের তথ্য প্রদানে সাহায্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং পরে দুই দেশ সম্মত হয় যে সমন্বিত কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্প্রদায়ের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত আসে ২০২০ সালে যখন শেষ বেইদু (BeiDou) স্যাটেলাইটটি অবস্থানে বসানো হয়, যা আমেরিকান মালিকানাধীন জিপিএসকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি নেভিগেশন নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করে। বেইদু হলো প্লাউ (Plough) নক্ষত্রমণ্ডল বা বিগ ডিপার-এর চীনা শব্দ। এরপর ২০২১ সালে একজন চীনা নারী, ওয়াং ইয়াপিং-এর প্রথম স্পেসওয়াক বা মহাকাশে হাঁটা দেখা যায়।

সম্ভবত গত দশকে সবচেয়ে বড়ো মাইলফলক ছিল মঙ্গলে প্রদক্ষিণ, অবতরণ এবং তারপর একটি রোভার স্থাপন করা। তিয়ানওয়েন-১ মিশন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রহে পৌঁছায় এবং অবতরণের সঠিক স্থান খুঁজতে তিন মাস ব্যয় করে। ১৪ মে ল্যান্ডারটি অরবিটিং ভেহিকল বা প্রদক্ষিণকারী যান ছেড়ে দেয় এবং একটি সফট ল্যান্ডিং করে। এরপর ঝুরং (আগুনের দেবতা) রোভারটিকে মঙ্গলের ভূতত্ত্ব জরিপ, পানি অনুসন্ধান এবং শব্দ ও দৃশ্য ফেরত পাঠানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে গ্রহে তিনটি সক্রিয় রোভার রয়েছে : ঝুরং এবং নাসার আগের দুটি মিশনের পারসেভারেন্স এবং কিউরিসিটি।

এই সবকিছুই চীনে মহান গর্বের উৎস এবং কমিউনিস্ট পার্টির পুরাণের সাথে মিশে আছে। চীনের চ্যাংঝং (লং মার্চ) রকেটগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ১৯৩৪-৩৫ সালের চীনা গৃহযুদ্ধের সময় একটি বিখ্যাত সামরিক পশ্চাদপসরণের নামে, যেখানে রেড আর্মি দুর্গম ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে ৯,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিল। এটি মাওকে ক্ষমতায় আসতে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলোকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিল। এটি চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তিগত মিথ বা উপকথার অংশ এবং প্রায়শই মহত্ত্ব অর্জনের জন্য বীরত্বপূর্ণ ত্যাগের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চীনকে মহাকাশে মহত্ত্বের দিকে চালিত করা রকেটগুলোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা গভীর প্রতীকী।

CamScanner

মজার ব্যাপার হলো, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তার কিছু প্রকাশ্য ঘোষণা নরম করেছে এবং এর পরিবর্তে একটি পুরোনো ঐতিহাসিক সমষ্টিগত স্মৃতি থেকে জাতীয়তাবাদ এবং মিথের উপাদানগুলো গ্রহণ করেছে। মহাকাশ মিশন এবং সরঞ্জামের নামকরণে এটি প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে যে চালকবিহীন যানটি চাঁদ প্রদক্ষিণ করেছিল তার নাম ছিল চ্যাং'ই ১, যা চীনা লোকগাঁথা অনুযায়ী এক সুন্দরী নারীর নামে, যিনি তার স্বামীর কাছ থেকে অমরত্বের অমৃত চুরি করেছিলেন, তা পান করেছিলেন, চাঁদে উড়ে গিয়েছিলেন এবং এক মহাজাগতিক দেবী হয়েছিলেন। চ্যাং'ই-এর একটি পোষা খরগোশ ছিল যার নাম ইউতু ('জেড র‍্যাবিট' বা জেড পাথরের খরগোশ), যে এখন চাঁদে লাফালাফি করে এবং একটি হামানদিস্তায় অমরত্বের অমৃত পিষে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে চ্যাং'ই-এর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে চীন যখন ২০১৩ সালে চাঁদের পৃষ্ঠে চ্যাং'ই ৩ অবতরণ করায়, তখন সেখান থেকে যে লুনার রোভারটি নেমে এসেছিল তার নাম ছিল ইউতু।

এদিকে, স্পেস স্টেশন তিয়ানগং-এ, টাইকোনাটরা, যারা সেখানে শেনঝো ('ডিভাইন ভেসেল' বা স্বর্গীয় যান) ক্যাপসুলে করে যান, তারা তাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন যে তারা 'হেভেনলি প্যালেস' বা স্বর্গীয় প্রাসাদে আছেন, যা চীনা পুরাণে মহাবিশ্বের ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রাখা সেলেস্টিয়াল রুলার বা মহাজাগতিক শাসকের বাসস্থানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। 'টাইকোনাট' শব্দটি ম্যান্ডারিন এবং গ্রিকের মিশ্রণ, 'তাইকং' মানে 'কসমস' বা মহাবিশ্ব এবং 'নট' গ্রিক শব্দ 'নাবিক' থেকে। শব্দটি জনপ্রিয় করেছিলেন চীনা মহাকাশ বিশ্লেষক চেন ল্যান যিনি 'গো টাইকোনাটস!' নামে একটি ওয়েবসাইট চালান। একজন চীনা নভোচারীর দাপ্তরিক নাম হলো 'ইউহংইউয়ান' বা 'মহাবিশ্বের ভ্রমণকারী' (অথবা, আরও খারাপভাবে, 'ইউনিভার্সাল ট্রাভেল ওয়ার্কার')।

এই নামগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বিশ্বকে সংকেত দেয় যে মহাকাশ কেবল আমেরিকান এবং ইউরোপীয়দের এলাকা নয় এবং প্রতিটি আর্টেমিসের জন্য একটি চ্যাং'ই আছে।

চীনের নিজস্ব মহাকাশ কর্মসূচির বিকাশে বিপত্তি ছিল (যেমন রাশিয়া এবং আমেরিকার ছিল)। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৬ সালের ট্র্যাজেডি, যখন একটি রকেট উড্ডয়নের পরে বিস্ফোরিত হয় এবং মাটিতে অন্তত ছয়জনকে হত্যা করে। সঠিক বিবরণ এখনো জানা যায়নি—এটি একটি অনুস্মারকলিপি যে চীন অনেক দিক দিয়ে একটি রুদ্ধ সমাজ রয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে দুইবার পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী

চ্যাংঝং রকেটগুলোর জন্য, যা জলের ওপর দিয়ে উৎক্ষেপণ করা প্রয়োজন। ২০১৬ সালে দুইজন টাইকোনাট চীনের তিয়ানগং ২ স্পেস স্টেশনে এক মাস কাটান যখন তাদের যানটি সফলভাবে এর সাথে ডক করে।

২০১৯ সালে চালকবিহীন চ্যাং'ই ৪ চাঁদের উলটো পিঠে বা ফার সাইডে অবতরণকারী প্রথম মহাকাশযান হয়ে ওঠে। মিশনটি ছিল চীনা এবং আমেরিকানদের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনার আরেকটি উদাহরণ। নাসাকে অবতরণ স্থানের তথ্য প্রদানে সাহায্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং পরে দুই দেশ সম্মত হয় যে সমন্বিত কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্প্রদায়ের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত আসে ২০২০ সালে যখন শেষ বেইদু (BeiDou) স্যাটেলাইটটি অবস্থানে বসানো হয়, যা আমেরিকান মালিকানাধীন জিপিএসকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি নেভিগেশন নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করে। বেইদু হলো প্লাউ (Plough) নক্ষত্রমণ্ডল বা বিগ ডিপার-এর চীনা শব্দ। এরপর ২০২১ সালে একজন চীনা নারী, ওয়াং ইয়াপিং-এর প্রথম স্পেসওয়াক বা মহাকাশে হাঁটা দেখা যায়।

সম্ভবত গত দশকে সবচেয়ে বড়ো মাইলফলক ছিল মঙ্গলে প্রদক্ষিণ, অবতরণ এবং তারপর একটি রোভার স্থাপন করা। তিয়ানওয়েন-১ মিশন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রহে পৌঁছায় এবং অবতরণের সঠিক স্থান খুঁজতে তিন মাস ব্যয় করে। ১৪ মে ল্যান্ডারটি অরবিটিং ভেহিকল বা প্রদক্ষিণকারী যান ছেড়ে দেয় এবং একটি সফট ল্যান্ডিং করে। এরপর ঝুরং (আগুনের দেবতা) রোভারটিকে মঙ্গলের ভূতত্ত্ব জরিপ, পানি অনুসন্ধান এবং শব্দ ও দৃশ্য ফেরত পাঠানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে গ্রহে তিনটি সক্রিয় রোভার রয়েছে : ঝুরং এবং নাসার আগের দুটি মিশনের পারসেভারেন্স এবং কিউরিসিটি।

এই সবকিছুই চীনে মহান গর্বের উৎস এবং কমিউনিস্ট পার্টির পুরাণের সাথে মিশে আছে। চীনের চ্যাংঝং (লং মার্চ) রকেটগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ১৯৩৪-৩৫ সালের চীনা গৃহযুদ্ধের সময় একটি বিখ্যাত সামরিক পশ্চাদপসরণের নামে, যেখানে রেড আর্মি দুর্গম ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে ৯,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিল। এটি মাওকে ক্ষমতায় আসতে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলোকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিল। এটি চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তিগত মিথ বা উপকথার অংশ এবং প্রায়শই মহত্ত্ব অর্জনের জন্য বীরত্বপূর্ণ ত্যাগের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চীনকে মহাকাশে মহত্ত্বের দিকে চালিত করা রকেটগুলোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা গভীর প্রতীকী।

CamScanner

বজায় রাখার হলো, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তার কিছু প্রকাশ্য ঘোষণা নরম করেছে এবং এর পরিবর্তে একটি পুরোনো ঐতিহাসিক সমন্বিত সূত্র থেকে জাতীয়তাবাদ এবং মিথের উপাদানগুলো গ্রহণ করেছে। মহাকাশ মিশন এবং সরঞ্জামের নামকরণে এটি প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে যে চালকবিহীন যানটি চাঁদ প্রদক্ষিণ করেছিল তার নাম ছিল চাং'ই ১, যা চীনা লোকগাঁথা অনুযায়ী এক সুন্দরী নারীর নামে, যিনি তার স্বামীর কাছ থেকে অমরত্বের অমৃত চুরি করেছিলেন, তা পান করেছিলেন, চাঁদে উড়ে গিয়েছিলেন এবং এক মহাজাগতিক দেবী হয়েছিলেন। চাং'ই-এর একটি পোষা খরগোশ ছিল যার নাম ইউতু (জেড র‍্যাবিট' বা জেড পাথরের খরগোশ), যে এখন চাঁদে লাফালাফি করে এবং একটি হামানদিস্তায় অমরত্বের অমৃত পিষে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে চাং'ই-এর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে চীন যখন ২০১৩ সালে চাঁদের পৃষ্ঠে চাং'ই ৩ অবতরণ করায়, তখন সেখান থেকে যে সুমার রোভারটি নেমে এসেছিল তার নাম ছিল ইউতু।

এদিকে, স্পেস স্টেশন তিয়ানগং-এ, টাইকোনাটরা, যারা সেখানে শেনঝো ('ডিভাইন ভেসেল' বা স্বর্গীয় যান) ক্যাপসুলে করে যান, তারা তাদের তাপাকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন যে তারা 'হেভেনলি প্যালেস' বা স্বর্গীয় প্রাসাদে আছেন, যা চীনা পুরাণে মহাবিশ্বের ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রাখা সেলেস্টিয়াল রুলার বা মহাজাগতিক শাসকের বাসস্থানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। 'টাইকোনাট' শব্দটি ম্যান্ডারিন এবং গ্রিকের মিশ্রণ, 'তাইকং' মানে 'কসমস' বা মহাবিশ্ব এবং 'নট' গ্রিক শব্দ 'নাবিক' থেকে। শব্দটি জনপ্রিয় করেছিলেন চীনা মহাকাশ বিশ্লেষক চেন লান যিনি 'গো টাইকোনাটস!' নামে একটি ওয়েবসাইট চালান। একজন চীনা নভোচারীর দাপ্তরিক নাম হলো 'ইউহংইউয়ান' বা 'মহাবিশ্বের ভ্রমণকারী' (অথবা, আরও খারাপভাবে, 'ইউনিভার্সাল ট্রাভেল ওয়ার্কার')।

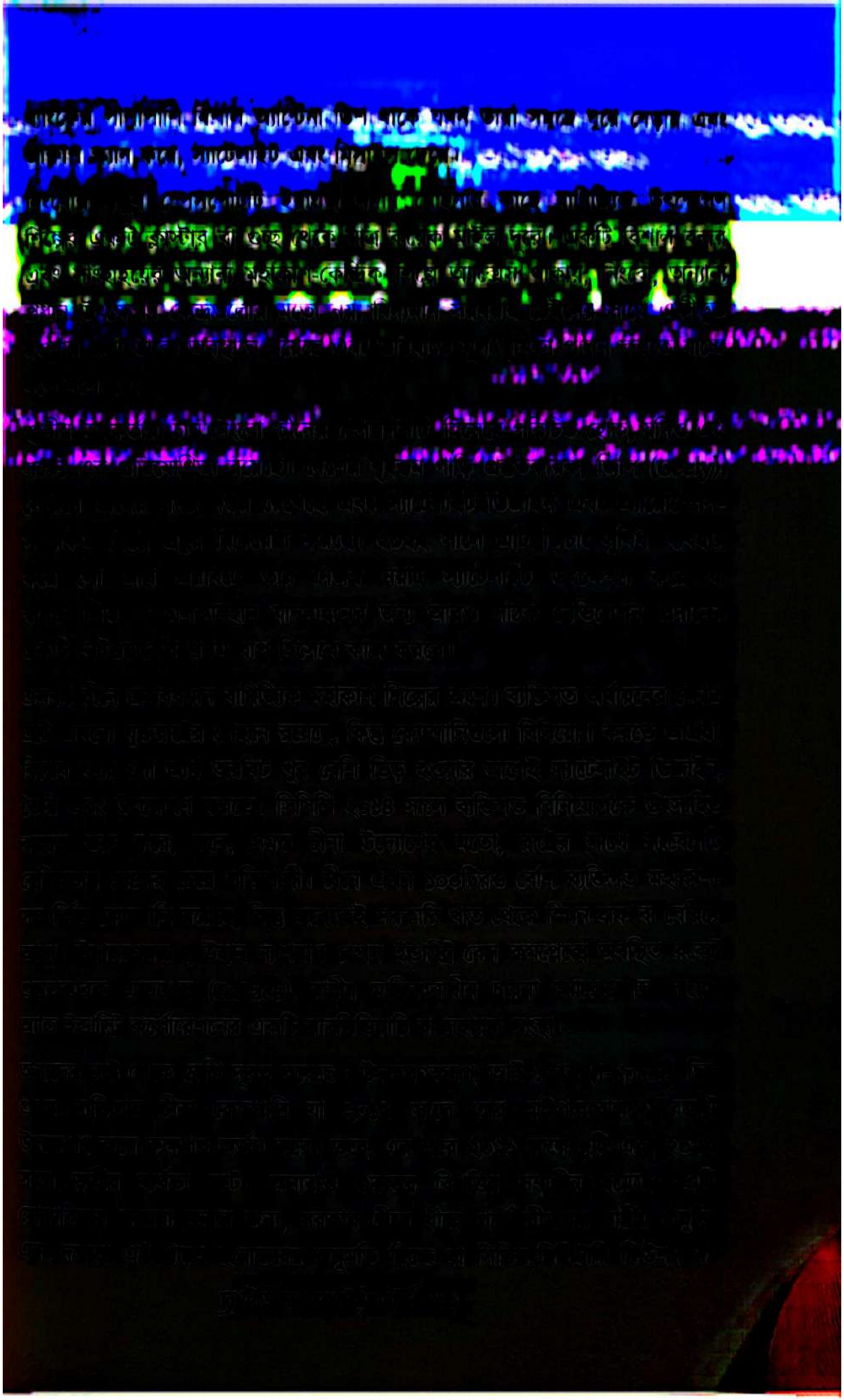
এই নামগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বিশ্বকে সংকেত দেয় যে মহাকাশ কেবল আমেরিকান এবং ইউরোপীয়দের এলাকা নয় এবং প্রতিটি আর্টেমিসের জন্য একটি চাং'ই আছে।

চীনের নিজস্ব মহাকাশ কর্মসূচির বিকাশে বিপত্তি ছিল (যেমন রাশিয়া এবং আমেরিকার ছিল)। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৬ সালের ট্র্যাজেডি, যখন একটি রকেট উত্তরণের পরে বিস্ফোরিত হয় এবং মাটিতে অন্তত ছয়জনকে হত্যা করে। সঠিক বিবরণ এখনো জানা যায়নি—এটি একটি অনুস্মারকলিপি যে চীন অনেক দিক দিয়ে একটি রুদ্ধ সমাজ রয়ে গেছে। ১৯৭২ সালে দুইবার পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী

অর্থনীতিকে দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তা এই সত্যটিকে আড়াল করা উচিত নয় যে এটি একটি কমিউনিস্ট জাতি, একটি কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা শাসিত যেখানে গোপনীয়তা সব স্তরে সরকারি নীতি।' চীন অনেক দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে [illegible] চীনের [illegible] যদিও উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও, এখন এটি [illegible] সাধারণ জ্ঞান যে [illegible] ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেগুলো প্রসারিত হচ্ছে।

চায়না ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (CNSA)-এর সারা দেশে বেশ কয়েকটি উৎক্ষেপণ সাইট রয়েছে। সবচেয়ে পুরোনোটি গোবি মরুভূমির জিউকুয়ানের কাছে, যেখান থেকে ইয়াং লিওয়েই ২০০৩ সালে উড্ডয়ন করেছিলেন। মরুভূমিতে তাইয়ুয়ান সুবিধাও রয়েছে, যা চীনের কিছু আবহাওয়া স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে কিন্তু এটি তার আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেমেরও অংশ। সিচুয়ান প্রদেশে জিচাং স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার রয়েছে এবং দক্ষিণ চীন সাগরের হাইনান দ্বীপের আরও আধুনিক ওয়েনচাং স্পেস লঞ্চ সাইটটি এখন টাইকোনাটদের চীনা মহাকাশ স্টেশনে নিতে এবং দীর্ঘ চালকবিহীন মিশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। পঞ্চম উৎক্ষেপণ সুবিধাটি সাংহাই থেকে উপকূল ধরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ড্রাইভের দূরত্বে পূর্বের বন্দর শহর নিংবোতে সম্পন্ন হচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যে এটি বছরে ১০০টি বাণিজ্যিক রকেট উৎক্ষেপণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে যাকে 'কুইক-ফায়ার' বা দ্রুতগতির লিফট-অফ বলা হয়।

নিংবো সাইটের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরালের কেনেডি স্পেস সেন্টারের সাথে মিল রয়েছে। উভয়ই উপকূলে, যার অর্থ রকেটগুলোকে স্থলের ওপর দিয়ে উড়তে হয় না এবং বায়ুমণ্ডল থেকে দ্রুত বের হওয়ার জন্য অনুকূল অক্ষাংশে রয়েছে। মিশন কন্ট্রোল সাধারণত বেইজিং বা মধ্য চীনের সিয়ান থেকে তদারকি করা হয়। নামিবিয়া, পাকিস্তান, কেনিয়া, সুইডেন, ভেনেজুয়েলা এবং আর্জেন্টিনাসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত চীনা গ্রাউন্ড-ট্র্যাকিং স্টেশনগুলোর একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কও রয়েছে, যা মহাকাশ ট্রাফিকের ওপর নজর রাখতে এবং চীনের স্যাটেলাইট ও মহাকাশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। সিএনএসএ-র মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা ট্র্যাকিং জাহাজের একটি বহরও রয়েছে। এগুলো দেখতে অদ্ভুত, তাদের ডেকে লেজারের



CamScanner

বেসামরিক-সামরিক মিশ্রণের একটি জাতীয় কৌশলের অংশ। এটি রাষ্ট্র, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং দেশের শীর্ষ গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ক্লাস্টারে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে আরও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সংযুক্ত করে। একটি খুব প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, নতুন কোম্পানিগুলোর কিছু ব্যর্থ হতে বাধ্য, কিন্তু এটি সমানভাবে নিশ্চিত যে কিছু কোম্পানি শক্তিশালী জাতীয় এবং সম্ভবত, বিশ্বব্যাপী খেলোয়াড় হিসেবে উঠে আসবে।

এই সবকিছুর মধ্যে চীনকে সাহায্য করবে একটি বিশাল, গতিশীল কর্মীবাহিনী। দেশটির দীর্ঘমেয়াদী জনতাত্ত্বিক সমস্যা থাকবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে—২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বয়স ষাটের বেশি হতে পারে—কিন্তু আপাতত এটি প্রচুর সংখ্যক বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী তৈরি করতে পারে। বেইহাং ইউনিভার্সিটিতেই ৩৭,০০০ ছাত্র রয়েছে। এই শতাব্দীতে প্রতি বছর চীন স্নাতক হওয়া প্রকৌশলীর সংখ্যা বাড়িয়েছে; এর জনসংখ্যার আকার বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পরিমাণের দিক দিয়ে প্রতিযোগিতা করার কোনো উপায় নেই।

নিকট ভবিষ্যতে, বেইজিং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্য তার বেইদু নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেমকে আরও উন্নত করতে চায়, কারণ তারা দেখেছে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে জিপিএস মার্কিন অর্থনীতিকে কতটা চাঙ্গা করেছে : আমেরিকান কৃষকরা তাদের জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের পরিকল্পনা করতে এটি ব্যবহার করে, ডেলিভারি পরিষেবাগুলো শহরগুলোতে আরও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লেনদেনের সময় নির্ধারণ করতে পারে এবং জাহাজের মালিকরা তাদের বহর বন্দরে যাওয়ার পথে ট্র্যাক করতে পারে। সমীক্ষাগুলো পরামর্শ দেয় যে জিপিএস মার্কিন অর্থনীতিকে ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে দিয়েছে, যার বেশিরভাগ প্রবৃদ্ধি গত দশকে এসেছে। বেইদু সিস্টেম ইতোমধ্যেই ৪০ কোটি মোবাইল ফোন এবং ৮০ লক্ষ যানবাহনে সংকেত পাঠায়। এর এনক্রিপ্ট করা সামরিক অ্যাপ্লিকেশন বেসামরিক সংস্করণের চেয়ে বেশি সঠিক এবং এটি পিএলএ এবং অন্যান্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হবে।

চীন আগামী দশকে অন্তত ১,০০০ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে চায়, যদিও এটি আরও অনেক বেশি হতে পারে। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্রমবর্ধমানভাবে তার পরিষেবাগুলো অফার করবে যারা রকেট উৎক্ষেপণ করতে পারে না বা তাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট নেই। এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে ব্যবহার করা হবে যাতে দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে সরিয়ে আনা যায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত স্যাটেলাইটগুলোর হার্ড এক্স-রে মডুলেশন টেলিস্কোপের মতো কিছু

উল্লেখযোগ্য বিজয় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা চীনের প্রথম এক্স-রে অ্যাস্ট্রোনমি স্যাটেলাইট, যা ব্ল্যাক হোল পর্যবেক্ষণ করে এবং মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে।

ইতোমধ্যে হয়তো একটি চীনা স্পেসপ্লেন বা মহাকাশবিমান সেবায় থাকতে পারে। যদি না থাকে, তবে তারা একটি তৈরি করবে। স্পেসপ্লেন হলো ডানাযুক্ত একটি রকেট যা উল্লম্বভাবে উড্ডয়ন করে, নিজেকে পৃথিবী থেকে ৮০০ কিলোমিটার ওপরে মহাকাশে নিয়ে যায়, ম্যানুভার বা কৌশল করতে পারে এবং বিমানের মতো অবতরণ করে। ২০১০ সাল থেকে আমেরিকানদের একটি আছে : এক্স-৩৭বি (X-37B), যা এখন অবসরপ্রাপ্ত স্পেস শাটলগুলোর মতো দেখতে কিন্তু ছোটো, প্রায় ৯ মিটার লম্বা। এটি মাত্র কয়েকটি মিশন উড়েছে। সেগুলো কী ছিল তা গোপন।

চীনা সংস্করণ—শেনলং বা 'ডিভাইন ড্রাগন' সম্পর্কে আরও কম জানা যায়। ধারণা করা হয় এটি অন্তত একবার মহাকাশে উড়েছে, কিন্তু তাও নিশ্চিত নয়। যা নথিপত্রে আছে তা হলো পাশ দিয়ে যাওয়া গ্রহাণুতে অবতরণ করা এবং সেগুলোর ভেতরের সম্পদের জন্য খনন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই শিলাগুলোর কিছু দশ কিলোমিটার চওড়া এবং এতে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কোটি কোটি ডলার মূল্যের ধাতু রয়েছে। চীনের অনেক স্টার্ট-আপ কোম্পানির মধ্যে একটি, অরিজিন স্পেস, ইতোমধ্যেই মহাকাশ বর্জ্য ধরতে এবং ধ্বংস করতে একটি রোবট প্রোটোটাইপ উৎক্ষেপণ করেছে এবং গ্রহাণু খনন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এটি বিকাশ করার ইচ্ছা রাখে।

মঙ্গলে আরেকটি প্রোব বা যান পাঠানোর ইচ্ছাও রয়েছে। সেখানে পৌঁছানোই যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির সাথে, কিছু মাটি এবং পাথরের নমুনা খুঁড়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। আরও দূরে, তারা বৃহস্পতি এবং শনিতে প্রোব পাঠাতে চায়।

কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রকল্পটি হলো চীনের আসন্ন চাঁদে অবতরণ।

২০২১ সালে চীন এবং রাশিয়া একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে যে তারা যৌথভাবে চাঁদে একটি ঘাঁটি তৈরি করবে যার নাম হবে ইন্টারন্যাশনাল লুনার রিসার্চ স্টেশন (ILRS)। তারা তিনটি ধাপ কল্পনা করে : প্রথমত, ২০২৬ সাল পর্যন্ত রিকনেসান্স বা নজরদারি, যার মধ্যে তিনটি মনুষ্যবাহী মিশন অন্তর্ভুক্ত; তারপর চাঁদে অবতরণ, তারপরে 'প্রত্যাবর্তন'—একটি মুনবেস বা চন্দ্রঘাঁটি যা ২০৩৬ সালের মধ্যে

CamScanner

বাসযোগ্য হবে। চীনা পক্ষের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে দুই দেশ 'চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনা করবে যাতে এই অঞ্চলে একটি লুনার রিসার্চ স্টেশনের মৌলিক কাঠামো নির্মাণ সহজতর হয়'। দক্ষিণ মেরুকে চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ এর বরফযুক্ত গর্তগুলো পানির সম্ভাব্য উৎস।

যখন চীন চাঁদের উলটো পিঠে বা ফার সাইডে একটি নন-ক্রুড বা চালকবিহীন যান অবতরণ করায়, তখন এটি পৃষ্ঠে চীনা পতাকা পুঁতে দেয় এবং এমন একটি অঞ্চলে পাথর খোঁড়া শুরু করে যা এটি একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করছে। কিছু রিপোর্ট বলছে চীন ২০২৮ সালের মধ্যেই চাঁদে স্থায়ী উপস্থিতি চায়, কিন্তু এটি উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাইরে মনে হয়; ২০৩০ সাল বেশি বাস্তবসম্মত এবং তাও চিত্তাকর্ষক হবে।

প্রথম যে কাঠামোটি তৈরি হবে তা খনন সক্ষম করবে, সেই সম্পদগুলো আহরণ করতে যা ঘাঁটিটিকে বড়ো হতে দেবে—এর মূলে আছে পানি, তাই দক্ষিণ মেরু। মস্কো এবং বেইজিং বলছে তারা ২০৩৫ সালের মধ্যে ঘাঁটিটি পুরোপুরি খোলার ইচ্ছা রাখে; আমেরিকান-নেতৃত্বাধীন আর্টেমিস প্রকল্প তার সময়সূচি সম্পর্কে আরও অস্পষ্ট।

চাঁদে একটি ঘাঁটি তৈরি করা ১৯৬৯ সালের চাঁদে অবতরণের মতোই একটি প্রজন্মের কল্পনাকে মোহিত করবে। সেখান থেকে আসবে প্রযুক্তিগত প্রতিভা এবং, সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে, যে জাতি বা জাতিগুলো এটি প্রথমে করবে তাদের সংকল্পের প্রতি প্রশংসা। এটি কেবল 'পতাকা পোঁতা' নয় : এটি সামরিক এবং বাণিজ্যিক উভয় সুবিধার জন্য 'হাই ফ্রন্টিয়ার' বা উচ্চ সীমান্ত দখল করার বিষয়। পুরস্কার হলো চাঁদের সম্ভাব্য সম্পদ এবং এটিকে মহাকর্ষীয় পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে সামরিক স্যাটেলাইট মোতায়েন করার ক্ষমতা যা প্রতিযোগীদের পক্ষে শনাক্ত করা কঠিন হবে।

দশক যত এগোবে মহাকাশের 'ভূগোল'-এর ওপর আরও দাবি করা হবে। চীন ইতোমধ্যেই একমাত্র দেশ যারা তাদের নিজস্ব স্পেস স্টেশন, তিয়ানগং ৩ পরিচালনা করছে। এটি একটি মুনবেসের মতো শিরোনাম তৈরি করে না, কিন্তু অ্যাস্ট্রোপলিটিক্যাল বা মহাকাশ-রাজনীতির দিক থেকে, একমাত্র সার্বভৌম স্টেশন থাকাটা বেশ বড়ো একটা ব্যাপার। সুপরিচিত আইএসএস হলো একটি 'সহিতামূলক কর্মসূচি' যার মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলো, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা জড়িত এবং এটি বিশটি ভিন্ন দেশের ২৬৬ জন নভোচারীকে আতিথ্য দিয়েছে। তবে, তিয়ানগং সম্পূর্ণভাবে চীনের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত এবং এটি ২০৩৭ সাল পর্যন্ত সেবায় থাকার কথা। ২০০৯ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে নির্মিত এবং উৎক্ষেপিত সংস্করণ ১ এবং ২ ছিল তৃতীয়টির জন্য পরীক্ষামূলক সংস্করণ, যা প্রায় তিনগুণ ভারী

এবং অনেক বড়ো। ডেপুটি চিফ ডিজাইনার বাই লিনহোউ বলেছেন ছয় মাসের মিশনে থাকা তিনজন টাইকোনাট মনে করবেন তারা যেন 'ভিলায় বাস করছেন'।

যদি তাই হয়, তবে এটি সব সুবিধাযুক্ত স্বপ্নের ছুটির গেটওয়ের চেয়ে বরং একটি সন্দেহজনক এয়ারবিএনবি (Airbnb) ভাড়ার মতো হবে। এতে মাত্র তিনটি মডিউল আছে, যেখানে আইএসএস-এর আছে সোলটি। তবুও, দৃশ্যগুলো ভালো এবং আরও ভালো হবে যখন জুনটিয়ান (Xuntian) স্পেস টেলিস্কোপ এতে যোগ দেবে। যদিও এটি হাবল টেলিস্কোপের আকারের সমান, একটি ২-মিটার-ব্যাসের আয়নাসহ, জুনটিয়ানের দেখার ক্ষেত্র বা ফিল্ড অফ ভিউ ৩০০ গুণ বেশি এবং এমন একটি ক্যামেরা রয়েছে যা ২.৫ বিলিয়ন বা ২৫০ কোটি পিক্সেল ক্যাপচার করতে সক্ষম। তিয়ানগং-এ টাইকোনাটরা মহাকাশ চিকিৎসা, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোগ্রাভিটি কম্বাশন বা দহন, ফ্লুইড ফিজিক্স বা তরল পদার্থবিজ্ঞান, থ্রিডি প্রিন্টিং, রোবোটিক্স, ডাইরেক্টেড-এনার্জি বিম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা করছেন। স্টেশনটি সাধারণত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার ওপরে থাকে এবং আইএসএস-এর মতো, কখনো কখনো খালি চোখে দৃশ্যমান হয়।

আইএসএস-কে ২০৩১ সালের মধ্যে বাতিল করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে, চীনের জন্য একটি ছোটো জানালা খুলতে পারে। আর্টেমিস কর্মসূচিতে লুনার গেটওয়ে অন্তর্ভুক্ত—চাঁদ প্রদক্ষিণকারী একটি ছোটো স্টেশন যা ঘন ঘন ভ্রমণের সময় স্পেসশিপ, ক্রু, ল্যান্ডিং মডিউল এবং রোভারগুলোকে পুনরায় সরবরাহ করার জন্য একটি হাব বা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে (যেমনটি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব)। কিন্তু গেটওয়ে তৈরিতে কোনো গুরুতর বিলম্ব হলে তিয়ানগং অতিথিদের জন্য উন্মুক্ত একমাত্র জায়গা হয়ে থাকবে এবং সেটি হবে চীনা আতিথেয়তা, সহযোগিতার মনোভাব এবং... নেতৃত্বের একটি প্রদর্শন।

বেইজিং ইতোমধ্যেই বলেছে যে তারা আন্তর্জাতিক নভোচারীদের সফর আয়োজন করতে চায় এবং 'বাইরের মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বের সমস্ত দেশের সাথে' কাজ করতে চায়। এটি বিভিন্ন দেশের জমা দেওয়া উনপঞ্চাশটি তালিকা থেকে স্টেশনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'টিউমারস ইন স্পেস' নামে একটি নরওয়েজিয়ান-নেতৃত্বাধীন গবেষণা কর্মসূচি বেছে নেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সাল থেকে এটি মহাকাশে পাওয়া মাইক্রোগ্রাভিটি এবং বিকিরণ কীভাবে টিউমারের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তা দেখার জন্য নির্ধারিত।

চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র হাই-টেক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিষয়ে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আগামী দশকটি কাটাতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যে দুটি ক্ষেত্র পৃথিবীতে

CamScanner

এবং মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশ, মহাকাশে মানবতার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহযোগিতা সম্ভব। উলফ অ্যামেন্ডমেন্টকে স্লেজহ্যামারের মতো কিছুর পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সাহায্য করবে এবং এমনকি যখন সেটিতে কাজ করা হচ্ছে, যেহেতু সংশোধনীটি কেবল নাসার জন্য নির্দিষ্ট, তাই মার্কিন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের পারস্পরিক সুবিধার দ্বিপাক্ষিক পথ অন্বেষণ করার সুযোগ রয়েছে।

আমেরিকান এবং সোভিয়েতদের মধ্যে 'দেতঁত' (Détente) বা উত্তেজনা প্রশমন সয়ুজ-অ্যাপোলো 'হ্যান্ডশেক ইন স্পেস' বা মহাকাশে করমর্দন দ্বারা সাহায্য পেয়েছিল। স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের পর, আইএসএস-এ রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ছিল একটি সেতু যার ওপর অন্তত একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেত। চাঁদে ফেরা আরেকটি সুযোগ।

কোনো পক্ষ মহাকাশে সেই লাফ দিতে সক্ষম বা ইচ্ছুক কি না তা নির্ভর করে পৃথিবীতে তাদের সম্পর্কের ওপর।

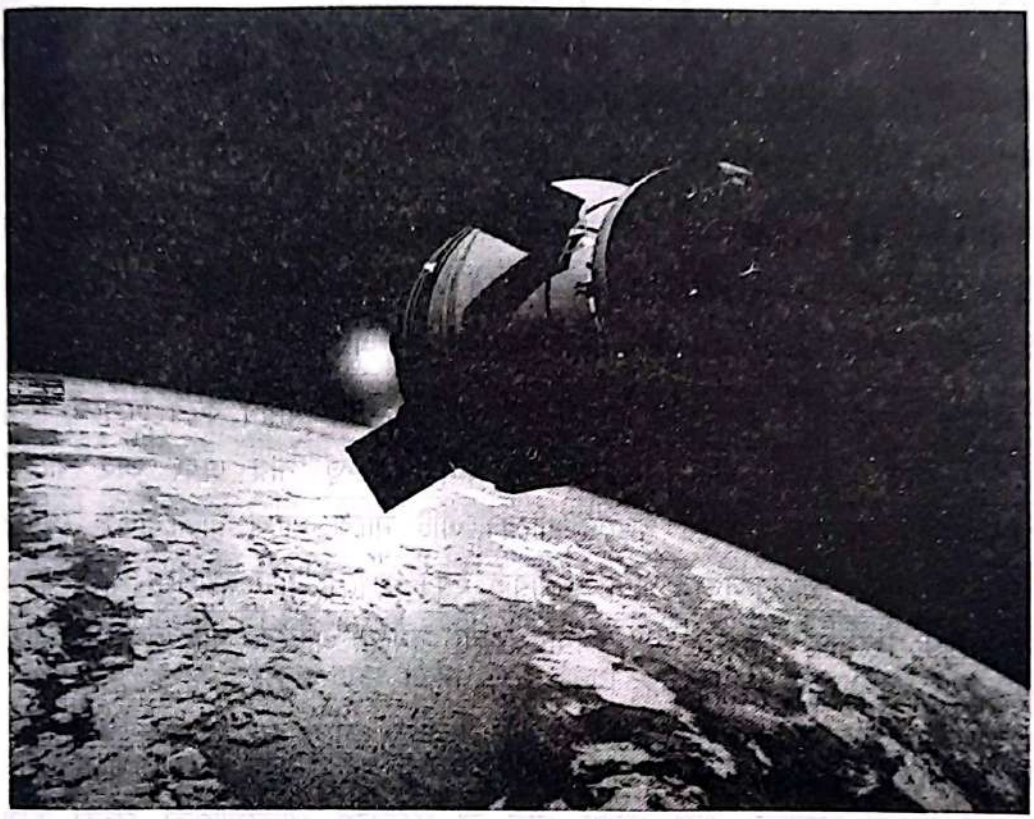
অধ্যায়-৬

যুক্তরাষ্ট্র : ভবিষ্যতের পথে প্রত্যাবর্তন

(THE USA : BACK TO THE FUTURE)

'মানুষ যখন লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, তখন তাদের ফিরে আসা উচিত নয়।'

— প্লুটার্ক



এসএলএস এক্সপ্লোরেশন আপার স্টেজ এবং ওরিয়ন মহাকাশযান, যা চাঁদে ফেরা এবং গভীর মহাকাশ অনুসন্ধানে নাসার কর্মসূচির অংশ।

সেখানে গিয়েছি, কাজ সেরেছি এবং এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ মানুষ নাসার টি-শার্ট কিনেছে। তাহলে কেন আবার ফিরে যাওয়া?

শেষবার যখন মানুষ চাঁদে ছিল তা অর্ শতাব্দীরও বেশি সময় আগের কথা : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২, যখন ইউজিন 'জিন' সারনান এবং হ্যারিসন স্মিট চাঁদের বুকে হাঁটা একাদশ এবং দ্বাদশ ব্যক্তি হয়েছিলেন। তখন থেকেই আমেরিকানরা প্রশ্ন করে আসছে আবার সেখানে যাওয়া উচিত কি না।

বিতর্কের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উত্তর রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে মহাকাশ অনুসন্ধান খুবই ব্যয়বহুল এবং মানবতার মনোযোগ আরও পার্থিব সমস্যাগুলোর দিকে থাকা উচিত। অন্যরা যুক্তি দেন যে আমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সরাসরি সেখানে যাওয়া। বর্তমানে তর্কে তারাই জিতেছেন যারা বলেন আমাদের বিভিন্ন কারণে চাঁদে ফিরে যেতে হবে, যার মধ্যে একটি হলো চাঁদ হবে লাল গ্রহে (মঙ্গল) যাওয়ার যাত্রাবিরতি বা স্টেজিং পোস্ট; এই দশকের শেষেই সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।

চীনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিতর্কের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। সেখানে এটা ধরে নেওয়া হয় যে মহাকাশ অনুসন্ধান জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঘোষণায় উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে : 'মহাকাশ স্বপ্ন চীনকে আরও শক্তিশালী করার স্বপ্নের অংশ'।

স্বাভাবিকভাবেই, বেইজিংয়ের পলিটব্যুরো জনমত জরিপ, বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং বাজেটের ওপর গণতান্ত্রিক নজরদারির মতো বিরক্তির ঊর্ধ্বে। তাই, চীনের মহাকাশ কর্মসূচি স্থিতিশীল। যুক্তরাষ্ট্রের সমতুল্য? খুব একটা নয়।

মহাকাশ আমেরিকান জনগণের বিশাল অংশের কল্পনাকে ধারণ করে চলেছে, কিন্তু একটি নীতি হিসেবে এটি নির্বাচনে খুব কমই গুরুত্ব পায় এবং তাই বাজেট পরিকল্পনায় সহজেই পিছিয়ে পড়তে পারে। এটি মাঝে মাঝে রাজনৈতিক খেয়াল এবং অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কখনো এটি ফ্যাশনে থাকে এবং অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার অন্য সময়ে এটিকে ব্যয়বহুল মাথাব্যথা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

চাঁদে অবতরণের পরের বছরগুলোতে এটি বিশেষ করে সত্য ছিল। আমেরিকান প্রযুক্তি বিজয়ী হয়েছিল এবং স্পেস রেস বা মহাকাশ প্রতিযোগিতা জেতা হয়ে গিয়েছিল। জনস্বার্থ কমে গিয়েছিল; তহবিলও তাই। আমেরিকান লেখক টম উলফ স্মরণীয়ভাবে বলেছিলেন, চাঁদে অবতরণ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'নীল আর্মস্ট্রংয়ের জন্য একটি ছোটো পদক্ষেপ, মানবজাতির জন্য এক বিশাল লাফ এবং নাসার জন্য পেটে লাথি'।

১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট কেনেডির দশকের শেষের আগেই চাঁদে মানুষ পাঠানোর বক্তৃতায় ১৯৬০-এর দশকের শুরুর আমেরিকার আশাবাদ এবং উদ্যম ফুটে উঠেছিল। মার্কিন মহাকাশ কর্মসূচির ক্ষেত্রে, মহাকাশ এবং ভূ-রাজনীতির সম্পর্কের এই আত্মবিশ্বাস এবং বোঝাপড়ার সাথে আর কোনো কিছুই মেলেনি, যদিও রোনাল্ড রিগ্যানের প্রশাসন কাছাকাছি এসেছিল। কেনেডির অলঙ্কার বা রেটরিক ছিল পুরোপুরি তার সময়ের এবং সেই সময়টা ছিল স্নায়ু যুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার।

মনুষ্যবাহী সবকটি চন্দ্র অবতরণই রিচার্ড নিক্সনের প্রেসিডেন্সি বা রাষ্ট্রপতির মেয়াদে (১৯৬৯-৭৪) ঘটেছিল, কিন্তু তিনি তার পূর্বসূরিদের কাছ থেকে অ্যাপোলো প্রকল্পটি পেয়েছিলেন। নাসা ১৯৮০ সালের মধ্যে একটি মুনবেস বা চন্দ্রঘাঁটি তৈরি এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে মঙ্গলে নভোচারী পাঠানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, কিন্তু নিক্সন স্পেস শাটলের পক্ষে সেগুলো বাতিল করে দেন, যা ১৯৮১ সালে সেবায় আসে। তিনি অ্যাপোলো ১১ মিশনকে 'সৃষ্টির পর থেকে বিশ্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সপ্তাহ' বলেছিলেন, কিন্তু বিজয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সহযোগীদের বলছিলেন যে আমেরিকান নভোচারীদের চাঁদে যাওয়া অব্যাহত রাখার প্রয়োজন তিনি দেখছেন না। তিনি অ্যাপোলো মিশনের খরচ এবং বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং জানতেন যে প্রথম চন্দ্র অবতরণের পর জনস্বার্থ কমে আসছে।

তাই ১৯৭২ সালে অ্যাপোলো ১৭-এর হ্যারিসন 'জ্যাক' স্মিট এবং জিন সারনান চাঁদে শেষ মনুষ্যবাহী ফ্লাইটের পাইলট ছিলেন। সারনান যখন ল্যান্ডিং মডিউলের দিকে শেষ কয়েক পা ফেলছিলেন, তিনি থামলেন এবং ধুলোয় তার মেয়ে ট্রেসির নামের আদ্যক্ষর আঁকতে হাঁটু গেড়ে বসলেন—টিডিসি (TDC)। তারপর তিনি একটি ছোটো বক্তৃতা দিলেন, যা শেষ হয়েছিল এভাবে : 'আমরা যেভাবে এসেছি সেভাবেই চলে যাচ্ছি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমরা ফিরে আসব : সমস্ত মানবজাতির জন্য শান্তি এবং আশা নিয়ে।' হ্যাচ বা দরজা বন্ধ হলো, তার আঙুলগুলো যানের ইগনিশন বা প্রজ্জ্বলন বোতামের ওপর ঘুরছিল এবং তিনি পরে স্মরণ করেছিলেন, চাঁদ থেকে বলা শেষ কথাগুলো ছিল : 'ওকে জ্যাক, লেটস গেট দিস মাদার আউট অফ হেয়ার' (ঠিক আছে জ্যাক, চলো এই জায়গা থেকে বের হই)।

এটি এমন একটি প্রকল্পের অদ্ভুত সমাপ্তি ছিল যা মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অর্জন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যখন ল্যান্ডিং মডিউলটি মূল মহাকাশযানের সাথে ডক বা সংযুক্ত হলো তখন ক্রু একটি লাইভ প্রেস কনফারেন্স করেছিল। মার্কিন নেটওয়ার্কগুলো এটি সম্প্রচার করার প্রয়োজন বোধ করেনি।

চাঁদ ইতিহাস হয়ে গিয়েছিল এবং তাও ব্যয়বহুল ইতিহাস। নাসার এক-কালীন ব্যবহারযোগ্য (disposable) রকেটের চেয়ে কম খরচের বিকল্প প্রয়োজন ছিল এবং এমন একটি প্রকল্প যা হোয়াইট হাউসের কাছে যৌক্তিক প্রমাণ করা যায়। পুনঃব্যবহারযোগ্য স্পেস শাটলের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে কম খরচে মানুষ এবং পে-লোড বা মালামাল লো আর্থ অরবিট বা নিম্ন পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানোর উপায় দেওয়া। এটি দ্বিতীয়টি করতে পেরেছিল, কিন্তু মূল বাজেট প্রক্ষেপণের চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক খরচে এবং মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যা প্রযুক্তিগত নকশার ত্রুটি প্রকাশ করেছিল।

১৯৮১ সালে প্রথম অরবিটাল টেস্ট ফ্লাইট হয়েছিল এবং পরবর্তী ত্রিশ বছরে শাটল প্রোগ্রাম ১৩৫টি মিশনে উড়েছিল। অনেক অর্জনের মধ্যে শাটলগুলো মির স্পেস স্টেশনের সাথে ডক করেছিল, হাবল স্পেস টেলিস্কোপ কক্ষপথে নিয়ে গিয়েছিল এবং আইএসএস তৈরিতে সাহায্য করেছিল। তবে, ১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে চ্যালেঞ্জার-এর বিস্ফোরণ ছিল এই কর্মসূচির জন্য একটি বিপর্যয়। তার বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ক্রুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন : 'ভবিষ্যৎ দুর্বল হৃদয়ের মানুষের জন্য নয়; এটি সাহসীদের জন্য। চ্যালেঞ্জার ক্রু আমাদের ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা তাদের অনুসরণ করা চালিয়ে যাব।' তদন্তে উঠে আসে যে নাসা কর্মকর্তারা অনেক বেশি অনুমান করেছিলেন যে শাটল উৎক্ষেপণের সময় ছোটোখাটো ত্রুটি সহ্য করতে পারবে এবং প্রোগ্রামটি প্রায় তিন বছর বন্ধ ছিল, এরপর উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রকেট বুস্টারে অসংখ্য নকশা পরিবর্তন করে ফিরে আসে।

সামরিক ফ্রন্টে রিগ্যান 'স্টার ওয়ার্স'—স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ—সমর্থন করেছিলেন, যা মহাকাশে এবং মাটিতে মিসাইল ও লেজারের একটি নেটওয়ার্কের প্রস্তাব করেছিল। এটি কখনো তৈরি হয়নি, লেজার তৈরিতে অসংখ্য প্রযুক্তিগত অসুবিধা এবং এই যুক্তিতে রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে যে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারণ হবে। তবে, প্রযুক্তির ওপর করা কিছু কাজ বর্তমান মিসাইল প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ. ডব্লিউ. বুশ (১৯৮৯-৯৩) চাঁদ এবং মঙ্গলে ঘাঁটি তৈরির সমর্থক ছিলেন কিন্তু কংগ্রেসকে উন্নয়নের জন্য তহবিল দিতে রাজি করাতে পারেননি। তার উত্তরসূরি, বিল ক্লিনটন (১৯৯৩-২০০১), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সময়ে দায়িত্বে ছিলেন। তার দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝপথে আইএসএস-এর নির্মাণ শুরু হয়, কিন্তু চাঁদ বা তার বাইরের বিষয় নিয়ে খুব একটা কথা হয়নি।

পরিস্থিতি পাল্টে যায় যখন জর্জ এইচ. ডব্লিউ.-এর ছেলে জর্জ ডব্লিউ. প্রেসিডেন্ট হন (২০০১-৯)। ২০০৩ সালে স্পেস শাটল কলাম্বিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় ভেঙে পড়লে দ্বিতীয় শাটল বিপর্যয় ঘটে, আবারও সাতজন ক্রুর সবাই মারা যান। প্রাথমিক টেস্ট ফ্লাইটের পর, শাটলের প্রতি সাতষট্টিটি ফ্লাইটে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার অনুপাত ছিল। নাসা বলেছিল শাটলগুলো প্রতি মাসে উৎক্ষেপণ করতে পারে, কিন্তু বাস্তবে প্রতি তিন মাসে একটির বেশি ওড়াতে হিমশিম খেত এবং এমন খরচে যা বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোকে তাদের স্যাটেলাইট কক্ষপথে পাঠানোর বিকল্প খুঁজতে বাধ্য করেছিল। পরের বছর বুশ পুরো বহরকে অবসরে পাঠানোর এবং ২০২০ সালের মধ্যে চাঁদে ফেরার দিকে মনোনিবেশ করার একটি রূপরেখা দেন।

নাসাকে আরও আধুনিক মনুষ্যবাহী মহাকাশযান, একটি লুনার ল্যান্ডার এবং দুটি নতুন রকেট তৈরির জন্য তহবিল দেওয়া হয়েছিল। নাসার তৎকালীন পরিচালক, মাইকেল গ্রিফিন, পরিকল্পনাগুলোকে 'অ্যাপোলো অন স্টেরয়েড' (স্টেরয়েড নেওয়া অ্যাপোলো) হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। বিলম্ব এবং খরচ বেড়ে গিয়েছিল কারণ নাসা বাজেটের চেয়ে ৩.১ বিলিয়ন ডলার বেশি খরচ করেছিল। ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আসেন, যিনি 'সেখানে গিয়েছি, কাজ সেরেছি' দৃষ্টিভঙ্গির ছিলেন। তার প্রথম কাজগুলোর একটি ছিল তহবিল কেটে দেওয়া। পরিবর্তে, তিনি বলেছিলেন আমেরিকার উচিত একটি ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে তাকানো— গ্রহাণু এবং মঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাওয়া। খুব একটা কিছু ঘটেনি এবং তারপর 'দ্য ডোনাল্ড' (ট্রাম্প) এলেন।

প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রেসিডেন্ট বুশের পরিকল্পনা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন; এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওবামার পরিকল্পনা ছিঁড়ে ফেললেন। গ্রহাণু বাদ। চাঁদ আবার ফ্যাশনে ফিরল। শুধু ট্রাম্প ওবামা প্রশাসনের বেশিরভাগ কাজ উলটে দিতে আগ্রহী ছিলেন তা নয়; মহাকাশ ভ্রমণ সস্তা হচ্ছিল, প্রযুক্তি উন্নত হয়েছিল, চাঁদে পানি এবং মূল্যবান ধাতু থাকতে পারে এবং বেইজিং দেখে মনে হচ্ছিল তারা চীনের জন্য এক বিশাল লাফ দিতে যাচ্ছে।

ট্রাম্প ২০১৭ সালে যে আর্টেমিস কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য হলো এই দশকে চাঁদে নারী ও পুরুষ পাঠানো এবং ২০৩০-এর দশকে সেখানে একটি ঘাঁটি তৈরি করা, শেষ পর্যন্ত মঙ্গলে যাওয়ার আগে। মার্কিন করদাতাদের প্রকল্পটির জন্য ৯৩ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং তা কেবল ২০২৫ সাল পর্যন্ত।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন পরিকল্পনাটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন এবং কর্মসূচির তদারকি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে দিয়েছিলেন। নাসা তার লক্ষ্যগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকার তার বাজেটের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু এটি শিক্ষণীয় যে বাইডেন এটিকে মোটামুটি উপেক্ষা করেছিলেন কারণ তিনি মার্কিন মহাকাশ নীতির সামরিক এবং বাণিজ্যিক দিকগুলোতে বেশি মনোযোগী ছিলেন।

এটি ব্যাপকভাবে জনগণের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৬৯ সালে, ৫৩ শতাংশ আমেরিকান মনে করতেন যে মার্কিন মহাকাশ নীতির সুবিধাগুলো আর্থিক খরচের উপযুক্ত, কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মাত্র ৪০ শতাংশ তা মনে করতেন। ১৯৮০-এর দশক থেকে এই সংখ্যাটি ৫০ শতাংশের ওপরে রয়েছে। ২০২১ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মাত্র ২৪ শতাংশ উত্তরদাতা নাসার বাজেটকে খুব বেশি বলে মনে করেছেন। একই পোলে মহাকাশে সরকারের সম্পৃক্ততার জন্য জনগণের অগ্রাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রায় ৬৩ শতাংশ মানুষ মনে করতেন যে প্রধান ইস্যু হওয়া উচিত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সাহায্য করা, যেখানে ৬২ শতাংশ বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীতে আঘাত হানতে পারে এমন গ্রহাণুগুলো পর্যবেক্ষণ করা একটি প্রধান অগ্রাধিকার। তবে, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মানুষ চাঁদ বা মঙ্গলে নভোচারী পাঠানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

এই পরিসংখ্যানগুলো অগ্রাধিকারের প্রতিফলন, মহাকাশে আগ্রহের অভাবের নয়। অনেক দেশে এটা মেনে নেওয়া হয় যে মহাকাশ ভ্রমণ রাষ্ট্রের বিষয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ ক্ষেত্র। আমেরিকানরা যুক্তি দিতে বেশি প্রস্তুত যে ব্যক্তিগত শিল্পের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত এবং মহাকাশ ভ্রমণের অবিশ্বাস্য চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করার জন্য তারা আরও সুসজ্জিত হতে পারে। এই মনোভাবের প্রভাব স্পষ্ট। বাণিজ্যিক খাতে, আমেরিকান কোম্পানিগুলো এগিয়ে আছে। বিনিয়োগ এবং প্রতিযোগিতা বাড়ছে কারণ ব্যাবসাগুলো হাই ফ্রন্টিয়ার বা উচ্চ সীমান্তে খননের সম্ভাবনাগুলোর খরচ এবং সুবিধা বিবেচনা করছে।

তবে পোলে এটাও উঠে এসেছে যে, বেশিরভাগ আমেরিকান বিশ্বাস করেন চীন মহাকাশে মার্কিন নেতৃত্বের জন্য একটি 'বড়ো হুমকি' এবং তারা মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখতে চান। তা সত্ত্বেও, চাঁদে ঘাঁটি তৈরির ক্ষেত্রে শীতল যুদ্ধের মতো 'স্পেস রেস জেতার' একই জরুরি অবস্থা নেই। কিন্তু সামরিক ফ্রন্টে, যুক্তরাষ্ট্র চীন বা রাশিয়ার যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর।

CamScanner

আগের অধ্যায়ে আমরা চীনা সরকারের মহাকাশ নীতি এবং লক্ষ্যগুলো দেখেছি। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলোও উল্লেখযোগ্যভাবে একই রকম। এটি ভালো এবং খারাপ। ভালো এই অর্থে যে উভয়ই সহযোগিতার কথা বলে—উদাহরণস্বরূপ, তার ২০২২ সালের স্পেস প্রায়োরিটিজ ফ্রেমওয়ার্ক বা মহাকাশ অগ্রাধিকার কাঠামো নথিতে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে এটি 'প্রদর্শন করবে কীভাবে মহাকাশ কার্যকলাপ একটি দায়িত্বশীল, শান্তিপূর্ণ এবং টেকসই পদ্ধতিতে পরিচালনা করা যায়'। কিন্তু এটি আরও বলে : 'মহাকাশ কার্যকলাপের বৈশ্বিক শাসন শক্তিশালী করতে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দেবে।' চীন এবং রাশিয়ার মতে তারা দেবে না।

নথিটি সেই দুটি দেশের নাম উল্লেখ করে না, তবে পরের অনুচ্ছেদটি কাদের লক্ষ্য করে তা বোঝা কঠিন নয় : 'প্রতিযোগী দেশগুলোর সামরিক মতবাদ মহাকাশকে আধুনিক যুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কাউন্টারস্পেস বা প্রতি-মহাকাশ সক্ষমতা ব্যবহারকে মার্কিন সামরিক কার্যকারিতা কমানো এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ জেতার উপায় হিসেবে দেখে।' তাই, 'আগ্রাসন রুখতে... যুক্তরাষ্ট্র একটি আরও স্থিতিস্থাপক জাতীয় নিরাপত্তা মহাকাশ অবস্থানে তার রূপান্তর ত্বরান্বিত করবে।'

উত্তেজনা কিছু সময় ধরে বাড়ছে। চীনের ২০০৭ সালের KKV স্যাটেলাইট ধ্বংসের অল্প পরেই, চীন সন্দেহ করেছিল যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজস্ব একটি মিসাইল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে পালটা বার্তা পাঠাচ্ছে। তবে, আমেরিকার নিজস্ব একটি টপ-সিক্রেট বা অতি-গোপন গুপ্তচর স্যাটেলাইট ধ্বংস করা যে চীনের কাজের প্রতিক্রিয়া ছিল না, তা সমানভাবে বিশ্বাসযোগ্য।

২০০৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ১০:২৬ ইএসটি-তে, ইউএসএস লেক এরি থেকে ছোঁড়া একটি মিসাইল মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। চার মিনিট পরে এটি ২৪০ কিলোমিটার উচ্চতায় ইউএসএ-১৯৩ (USA-193) স্যাটেলাইটকে আঘাত করে। এটি কোনো মেয়াদোত্তীর্ণ স্যাটেলাইট ছিল না, বরং আধুনিকতম টপ-সিক্রেট স্পাইওয়্যারে ঠাসা একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র ছিল। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে কক্ষপথে যাওয়ার অল্প পরেই, আমেরিকানরা স্যাটেলাইটটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল, যা ছিল একটি একতলা বাসের সমান। এটি পৃথিবীতে পড়লে ধ্বংসাবশেষ থেকে ঝুঁকি কম ছিল, কিন্তু যন্ত্রটিতে তখনো টাইটানিয়াম ট্যাঙ্কে প্রায় ১,০০০ পাউন্ড অত্যন্ত বিষাক্ত হাইড্রাজিন জ্বালানি ছিল, যার গলনাঙ্ক অনেক বেশি। নাসা প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশকে জানিয়েছিল যে স্যাটেলাইটটির অনিয়ন্ত্রিত পুনঃপ্রবেশের সম্ভাব্য হতাহতের সংখ্যা এমন কোনো ঘটনার সাথে যুক্ত সংখ্যার চেয়ে বেশি। তিনি এটিকে গুলি করে নামানোর জন্য 'অপারেশন বার্নট ফ্রস্ট' অনুমোদন করেন।

CamScanner

মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল লেক এরির ইজিস ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের পরীক্ষার বছরগুলোতে এনগেজ করা বা মোকাবিলা করা যেকোনো লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে দ্রুত এবং বেশি উচ্চতায় ভ্রমণ করা একটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা। এটি কোনো রিহার্সাল বা মহড়া ছিল না। আমেরিকানদের জন্য এটি ছিল অজানা এলাকা। তারা স্যাটেলাইটের ফায়ের ট্র্যাকের দিকে তাক করছিল। একটি বাঁকে যাওয়া

আলো খালকানিতে বিস্ফোরিত হয়। ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু আলো [illegible] ASAT দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্যের চেয়ে অনেক কম পরিমাণে।

বেইজিং এবং মস্কো অনেকদিন ধরে ভূস্টেশনারি মহাকাশে আমেরিকার শীতল যুদ্ধের সামরিক কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা হিসেবে তাকিয়েছিল। প্রশ্নটি হলো, তারা কি আধুনিক ASAT যুদ্ধে নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা করা শুরু করতে পারে, কিন্তু এটি তা করেছিল। সেই থেকে, মহাকাশে মার্কিন সামরিক ক্ষমতা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯ সালে সরকার 'স্পেস ফোর্স' বা মহাকাশ বাহিনী চালু করে, যা মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর ছয়টি শাখার (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, মেরিনস, কোস্টগার্ড, বিমান বাহিনী) মধ্যে সবচেয়ে নতুন। এর একজন চার-তারকা জেনারেল আছেন, যিনি সামরিক বাহিনীর অন্যান্য প্রধানদের সাথে জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের সদস্য। এটি জিপিএস স্যাটেলাইটের জন্য দায়ী, যা মিসাইল উৎক্ষেপণ শনাক্ত করতে পারে এবং এর গ্রাউন্ড-বেসড বা ভূমি-ভিত্তিক জ্যামার রয়েছে যা শত্রু স্যাটেলাইটের ট্রান্সমিশন ব্লক করতে পারে। এটি মহাকাশ বর্জ্যও ট্র্যাক করে।

এর বাজেট—বার্ষিক প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলার—আধুনিক যুদ্ধে মহাকাশের কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে সচেতনতার সাথে সম্ভবত বাড়বে। বর্তমানে এটি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো, মাত্র ১৬,০০০ সামরিক ও বেসামরিক কর্মী দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করছেন, যার মধ্যে পেন্টাগনের সদর দপ্তর, কলোরাডোর শাইয়েন মাউন্টেন এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের বিমান বাহিনী ঘাঁটি অন্তর্ভুক্ত। একটি তরুণ সংগঠন হিসেবে এর শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির অভাব রয়েছে কিন্তু, বিপরীতভাবে, একটি 'স্টার্ট-আপ' হিসেবে এটি নতুন ধারণা থেকে উপকৃত হতে পারে। কম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, এর লোগো নিয়ে আরও ভাবা উচিত ছিল। এটি স্টার ট্রেকের স্টারফ্লিট কমান্ডের সাথে এতটাই মিলে যায় যে জর্জ তাকেই (ওরফে 'সুলু'—পুরোনো পাঠকদের জন্য) মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আমরা এ থেকে কিছু রয়্যালটি আশা

করছি...'। ভালো দিক হলো, এর নীতিবাক্যে চমৎকার অনুপ্রাস বা মিল রয়েছে : 'সেম্পার সুপ্রা' (semper supra), যার অর্থ 'সর্বদা ওপরে'।

এর শুরু থেকেই এর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। স্পেস ফোর্স যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন কিছু সমালোচক বলেছিলেন এটি মহাকাশকে 'সামরিকায়িত' করেছে, কিন্তু তারা এই বিষয়টি উপেক্ষা করেন যে মহাকাশ তখনই সামরিকায়িত হয়েছে যখন মানুষ প্রথম বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সেখানে গিয়েছিল। স্পেস ফোর্স ইউএস এয়ার ফোর্সের মধ্যে ইতোমধ্যে একই ধরনের কাজ করা ইউনিটগুলো থেকে তৈরি করা হয়েছিল এবং, যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র শীতল যুদ্ধের সময় একে অপরের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে স্যাটেলাইট ব্যবহার করছিল। 'মহাকাশ একটি যুদ্ধক্ষেত্র'—এই মন্ত্রকে আক্রমণাত্মক বলা যেতে পারে, কিন্তু এটি একটি বাস্তব সত্য।

ব্যবহারিক দিক থেকে, স্পেস ফোর্সের কি গভীর মহাকাশ পর্যন্ত সামরিক শক্তি প্রজেক্ট বা প্রদর্শন করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত, নাকি এর উচিত নজরদারি, মিসাইল সতর্কতা, যোগাযোগ, পজিশনিং এবং নেভিগেশনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী যুদ্ধ-পরিষেবাগুলোকে সমর্থন করা? বর্তমানে পরের পদ্ধতিটিই জয়ী হচ্ছে বলে মনে হয়। যদিও এর নামটি চাঁদে শত্রু বাঙ্কারে লেজার ফায়ার করা মার্কিন স্পেসপ্লেনের দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়, তবে মনে হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর অনেক বড়ো শাখাগুলো অনিবার্য টেরিটরি বা এলাকা দখলের লড়াইয়ে জিতবে এবং মহাকাশ যুদ্ধের প্রকাশ্য আক্রমণাত্মক দিকের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখবে।

সামরিক দিক থেকে, যুক্তরাষ্ট্রের চীনের ওপর স্পষ্ট আধিপত্য রয়েছে—আপাতত। ২০২১ সালে ইউএস স্পেস ফোর্সের জেনারেল ডেভিড ডি. থম্পসন সতর্ক করেছিলেন : 'বাস্তবতা হলো, সংক্ষেপে, গড়ে তারা আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ হারে তাদের মহাকাশ সক্ষমতা তৈরি করছে, মাঠে নামাচ্ছে এবং আপডেট করছে, যার অর্থ খুব শীঘ্রই, আমরা যদি আমাদের উন্নয়ন এবং সরবরাহ সক্ষমতা ত্বরান্বিত না করি, তবে তারা আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।' তার সময়সীমা ছিল ২০৩০। জেনারেল থম্পসনের পূর্বাভাস হয়তো সঠিক হতে পারে, কিন্তু চীনের যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতার কাছাকাছি যেতেও এখনো অনেক পথ বাকি। চীনা সামরিক মহাকাশ কার্যকলাপের বাজেট অস্পষ্ট, কিন্তু প্রায় নিশ্চিতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক কম। ২০২৩ সালের শুরুর দিকে কক্ষপথে মোটামুটি ৪,৯০০টি সক্রিয় স্যাটেলাইট ছিল; এর মধ্যে প্রায় ৩,০০০টি আমেরিকান এবং প্রায় ৫০০টি চীনা।

ওয়াশিংটন আর্লি-ওয়ার্নিং বা আগাম-সতর্কবার্তা স্যাটেলাইটে প্রচুর বিনিয়োগ করছে যা সেন্সর ব্যবহার করে ব্যালিস্টিক এবং হাইপারসনিক মিসাইল থেকে আসা ইনফ্রারেড তাপ স্বাক্ষর শনাক্ত করে। তারপর তারা নিরাপদে পৃথিবীতে সামরিক কমান্ড সেন্টারে ডেটা পাঠায়। এগুলো লো আর্থ অরবিটে যুক্তরাষ্ট্র যে স্যাটেলাইটের 'ট্র্যাকিং লেয়ার' তৈরি করছে তার অংশ। ২০২৮ সালের মধ্যে তারা আশা করছে এর ১০০টি উচ্চ, গতির ম্যানুভারযোগ্য বা কৌশলী মিসাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ঢাল হিসেবে কাজ করবে।

লেজার অস্ত্র তৈরিতেও অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে যা শেষ পর্যন্ত মহাকাশে মোতায়েন করা হবে। ইউএস নেভি ২০১৪ সাল থেকে লেজার ওয়েপন সিস্টেমের সংস্করণ ব্যবহার করছে, কিন্তু ২০২২ সালে এর সক্ষমতা উন্নত হয়েছে বলে দেখানো হয় যখন নৌবাহিনী সফলভাবে একটি অল-ইলেকট্রিক, হাই-এনার্জি লেজার ব্যবহার করে একটি দ্রুতগামী ক্রুজ মিসাইল গুলি করে নামায়। শক্তির একটি অদৃশ্য রশ্মি মিসাইলটিকে লক্ষ্য করে এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরে এর কিছু অংশ কমলা হয়ে জ্বলে ওঠে, তারপর এর ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হয় এবং এটি নিচে পড়ে যায়। একবার সিস্টেমটি তৈরি হয়ে গেলে, আসল 'কিল শট' বা ধ্বংসকারী শটের জন্য বিদ্যুতের খরচ মাত্র কয়েক ডলার। তুলনায়, একটি মাত্র গাইডেড মিসাইলের দাম দশ হাজার এমনকি লক্ষ ডলার হতে পারে। যতদূর জানা যায়, লেজারগুলো কেবল পৃথিবীতে মোতায়েন করা হয়েছে, কিন্তু যদি কোনো মহাকাশচারী দেশ তাদের স্যাটেলাইটকে এগুলো দিয়ে সজ্জিত করে, তবে অন্যরা তা অনুসরণ করবে।

একটি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্র হবে 'গোপন-কিন্তু-এতটা-গোপন-নয়' পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্পেসপ্লেন। স্পেস ফোর্সের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে চালকবিহীন এক্স-৩৭বি (X-37B) বিমান যা মহাকাশে দুই বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছে, যা সম্ভবত এর ষষ্ঠ মিশন ছিল। এত দিন ধরে এটি কী করছিলো তার বেশিরভাগই শ্রেণিবদ্ধ বা গোপন এবং স্পেস ফোর্সের সাদামাটা বিবৃতি যে এটি 'একটি নির্ভরযোগ্য, পুনর্ব্যবহারযোগ্য, চালকবিহীন মহাকাশ পরীক্ষা প্ল্যাটফর্মের প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য একটি পরীক্ষামূলক পরীক্ষা কর্মসূচি' চীনা এবং রাশিয়ান দাবিগুলোকে শান্ত করার সম্ভাবনা কম যে এটি একটি অস্ত্র। অপারেশনের এক পর্যায়ে, একটি রাশিয়ান প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রধান দাবি করেছিলেন যে বিমানটি তিনটি পারমাণবিক বোমা বহন করছে যা এটি কক্ষপথ থেকে মস্কোর ওপর ফেলতে পারে।

পদার্থবিজ্ঞান এবং সামরিক কৌশল উভয়ের সাথে এই ধারণার অসামঞ্জস্যতা এটিকে অসম্ভব এবং বোকামির স্কেলে কোথাও রাখে। আরেকটি দাবি যে এক্স-৩৭বি রাশিয়ার

CamScanner

ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে ব্যবহৃত হচ্ছিল তা কম আজগুবি, কিন্তু তখনো, স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে পারে না বিমানটি তা কী করতে পারে তা বোঝা কঠিন। সম্ভবত এক্স-৩৭বি-র একটি সামরিক দিক রয়েছে, কিন্তু উড্ডয়নের আগে এতে পারমাণবিক অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, হাজার হাজার গ্যালন রকেট জ্বালানি ব্যবহার করে, তা হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমি জানি না এটি কী করে। তবে আমি একটা চাই।

স্পেস ফোর্সে যা-ই ঘটুক না কেন—তারা উঁচুতে লক্ষ্য স্থির করেছে। ২০২০ সালে, একটি নথি মার্কিন মহাকাশ স্বার্থ রক্ষার ভৌগোলিক সীমা সংজ্ঞায়িত করেছিল। শব্দচয়ন ইঙ্গিত দেয় যে এর কোনো সীমা নেই। এটি বলে : 'এখন পর্যন্ত, সেই মিশনের সীমা ছিল পৃথিবীর কাছাকাছি, জিওস্টেশনারি রেঞ্জ (২২,২৩৬ মাইল) পর্যন্ত। নতুন মার্কিন সরকারি এবং বেসরকারি খাতের কার্যক্রম সিসলুনার স্পেসে প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে, ইউএসএসএফ (USSF)-এর স্বার্থের পরিধি ২,৭২,০০০ মাইল এবং তার বাইরেও প্রসারিত হবে—রেঞ্জে দশগুণেরও বেশি বৃদ্ধি।' 'বাইরে' অংশটির অসীম রেঞ্জ রয়েছে।

এই নথিটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে আগে যা নাসার এলাকা ছিল, এখন তা সামরিক বাহিনীরও। প্রতিযোগিতা যদি সেখানে হতে যায়, তবে স্পেস ফোর্স সেখানে থাকবে, কিন্তু এলাকাটি বিশাল। লো আর্থ অরবিটে স্যাটেলাইটের ওপর নজর রাখা যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু প্রধান খেলোয়াড়রা এখন সেখানে এবং চাঁদের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কী করছে তা দেখারও চেষ্টা করবে।

দুটি কৌশলগতভাবে সংযুক্ত। এক জাতির লো আর্থ অরবিটের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাত্ত্বিকভাবে অন্যদের সিসলুনার স্পেসে ভ্রমণ আটকাতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বিশাল দূরত্বের কারণে, পৃথিবী-ভিত্তিক রাডার এবং টেলিস্কোপ তাদের মধ্যে চলাচলকারী সমস্ত ট্রাফিক পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। আপাতত, তারা মূলত লো আর্থ অরবিটে যা আছে তা ট্র্যাক করে। তারা চাঁদের ঠিক পেছনে ল্যাগ্রঞ্জ পয়েন্ট ২ অঞ্চলে সরাসরি দেখতে পায় না, যেখানে চীনের স্যাটেলাইট চাঁদের উলটো পিঠের ওপর স্থায়ী নজরদারি দেয়, যে জায়গাটিতে তারা একটি ঘাঁটি তৈরির কথা বিবেচনা করছে।

হাজার হাজার কিলোমিটার ওপরে সামরিক স্যাটেলাইট স্থাপন করা যে প্রথমে করবে তাকে সুবিধা দেবে। সেগুলো হয়তো নজরদারির জন্য হতে পারে, কিন্তু প্রতিযোগীরা চিন্তিত হবে যে সেগুলো সশস্ত্র এবং তাদের স্যাটেলাইট বা এমনকি মহাকাশযানে 'নিচে' গুলি করতে পারে। চাঁদে একটি ঘাঁটি তৈরি করার খুব বেশি মানে নেই যদি আপনি সেখানে যেতে এবং ফিরে আসতে না পারেন কারণ প্রতিপক্ষ পথে দাঁড়িয়ে আছে।

স্পেস ফোর্স উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এটি সিসলুনার হাইওয়ে প্যাট্রোল সিস্টেম (Cislunar Highway Patrol System) তৈরি করবে বলে জানিয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'চিপস' (CHPS) সম্ভবত ১৯৭০-এর দশকের একটি ব্যাপক জনপ্রিয় এবং আরও বেশি চটকদার টিভি ট্রাফিক কপ সিরিজের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু স্পেস ফোর্সের সৌভাগ্যবশত বেশিরভাগ মানুষ এটি মনে রাখবে না। সিএইচপিএস-এ একটি মহাকাশযান 'ভিড় থেকে অনেক দূরে' টহল দেবে এবং 'চাঁদ এবং তার বাইরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিরক্ষা' প্রদান করবে। এই 'মহাজাগতিক পুলিশদের' বিভিন্ন দায়িত্ব থাকতে পারে। মূল্যবান ধাতুর একটি বড়ো চালান নিয়ে যাচ্ছেন? আমরা আপনাকে এসকর্ট করতে পারি, ম্যাম। বিপজ্জনকভাবে চালাচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্য পাশে থামান, স্যার। নিয়ন্ত্রণহীন স্যাটেলাইট দ্রুত গতিতে যাচ্ছে; হ্যাজার্ড লাইট জ্বালানো ভালো।

তাত্ত্বিকভাবে এটি চাঁদ পর্যন্ত প্রসারিত হবে না, কারণ আউটার স্পেস ট্রিটি বলে 'মহাজাগতিক বস্তুগুলোতে সামরিক ঘাঁটি, স্থাপনা এবং দুর্গ স্থাপন, যেকোনো ধরণের অস্ত্রের পরীক্ষা এবং সামরিক মহড়া পরিচালনা নিষিদ্ধ থাকবে।' তবে, এটি অনুমতি দেয় 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা অন্য কোনো শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে সামরিক কর্মীদের ব্যবহার' এবং 'চাঁদের শান্তিপূর্ণ অন্বেষণের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো সরঞ্জাম ও সুবিধার' ব্যবহারের অনুমতি দেয়। সেখান থেকে এটা যুক্তি দেওয়া খুব বেশি দূরে নয় যে নাসার ভেতরে আপনার সামরিক অফিসাররা, যারা চাঁদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, তাদের আত্মরক্ষার উপায় প্রয়োজন, বর্তমান পরিস্থিতি [যেকোনো সময় বছরের বর্তমান পরিস্থিতি বসান] বিবেচনায়।

এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে তিন বড়ো মহাকাশ জাতির কাছে চাঁদে সামরিক ঘাঁটি তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সমীক্ষা নেই। সর্বোপরি, শীতল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত এবং আমেরিকান উভয়ই সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখেছিল। আমেরিকান পক্ষের একটি ডিক্লাসিফাইড বা অবমুক্ত করা 'গোপন' নথিতে একটি লুনার-বেসড আর্থ বোম্বার্ডমেন্ট সিস্টেম বা চন্দ্র-ভিত্তিক পৃথিবী বোমাবর্ষণ ব্যবস্থা রাখার জন্য একটি ভূগর্ভস্থ সামরিক ঘাঁটি তৈরির আলোচনা ছিল। বর্তমান তিন বড়ো শক্তির কৌশলে অনুরূপ কিছু আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু যদি কোনো দেশ চাঁদের কৌশলগত অবস্থানগুলো দখল করতে শুরু করে যেখানে পানি, হিলিয়াম, টাইটানিয়াম এবং অন্যান্য সম্পদ রয়েছে এবং তারপর অন্য দেশগুলোকে পিছু হটতে বলে, তবে একটি সামরিক অচলাবস্থা বা স্ট্যান্ড-অফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শক্তভাবে সংজ্ঞায়িত চুক্তি এবং বিশ্বাস-গঠনের ব্যবস্থা জরুরিভাবে প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া, চাঁদ আমাদের সবার জন্য হওয়া

CamScanner

বাদশটি নভোচারী, কসমোনট এবং টাইকোনাটদের নতুন প্রজন্মের পায়ের নিচে চাঁদের ধুলোয় পরিণত হবে।

নাসা—তার পেছনে স্পেস ফোর্স নিয়ে—এখন চাঁদে ফেরার পথে। সামরিক এবং বেসামরিক মার্কিন মহাকাশ কার্যকলাপের মধ্যে ক্রসওভার বা আদান-প্রদান আছে, কিন্তু উভয় পক্ষই এর বেশিরভাগ আলাদা রাখার চেষ্টা করে। তবে নভোচারীদের ক্ষেত্রে, যোগ্য প্রার্থীদের একটি সীমিত পুল বা ভাণ্ডার রয়েছে এবং তাই ঐতিহ্যগতভাবে বেশিরভাগই সামরিক বাহিনী থেকে এসেছেন এবং পুরুষ ছিলেন। তবে, ২০২০ সালে চাঁদে ফেরার আর্টেমিস মিশনের জন্য নাসা নভোচারীদের দলটি প্রার্থীদের পটভূমি বৈচিত্র্যময় করার এজেন্সির প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করেছে। আঠারো জন নামকৃত ব্যক্তির মধ্যে, মাত্র দশ জন সক্রিয়-সেবা সামরিক কর্মী ছিলেন, নয় জন নারী এবং চার জন অশ্বেতাঙ্গ ছিলেন। উদ্দেশ্য হলো যে চাঁদে হাঁটা প্রথম নারী এবং প্রথম অশ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি হবেন আমেরিকান।

গায়ের রং এবং লিঙ্গই শেষবার মানুষ সেখানে থাকার সময়ের একমাত্র পার্থক্য নয়। আরেকটি পার্থক্য হলো কম্পিউটিং ক্ষমতা। যখন আর্মস্ট্রং প্রথম পদক্ষেপ ফেলেছিলেন এবং সারনান শেষটি, তখন তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলো আজকের আপনার স্মার্টফোনের চেয়ে কয়েক মিলিয়ন গুণ কম শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হলো এবার আমরা সেখানে থাকার জন্য যাচ্ছি।

নভোচারীরা স্পেস লঞ্চ সিস্টেমের (SLS) ওপর ওরিয়ন মহাকাশযানে চড়ে পথের বেশিরভাগ অংশ যাবেন—এসএলএস হলো নাসার তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট। এটি স্পেসএক্স-এর স্টারশিপের সাথে প্রতিযোগিতায় রয়েছে এবং যদিও নাসা তার বিশাল শিশুটিকে ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক হবে, প্রতিদ্বন্দ্বীটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং তাই সস্তা হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পরিকল্পনা হলো চাঁদের কাছে একটি লুনার গেটওয়ে স্পেস স্টেশন তৈরি করা এবং এটিকে ওরিয়নের ডকিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা।

গেটওয়ে হলো নাসা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এবং জাপানি ও কানাডিয়ান স্পেস এজেন্সিগুলোর একটি যৌথ উদ্যোগ। এর মডিউলগুলো স্পেসএক্স ফ্যালকন হেভি রকেটের মাধ্যমে একাধিক মিশনে পৌঁছে দেওয়া হবে। গেটওয়ে থেকে, নভোচারীরা হিউম্যান ল্যান্ডিং সিস্টেম ক্রাফট বা যানটি নিতে পারেন চাঁদের পৃষ্ঠে নামার যাত্রার জন্য। ফিরতি যাত্রায় প্রক্রিয়াটি উলটে যাবে।

এই পরিকল্পনায় গেটওয়ে মূল চাবিকাঠি। এটি চাঁদের চারপাশে একটি অত্যন্ত উপবৃত্তাকার বা ইলিপ্টিক্যাল কক্ষপথে অবস্থিত হবে। এর মানে হলো কখনো কখনো এটি পৃষ্ঠের তুলনামূলক কাছে থাকবে, যা অবতরণ মিশন সহজতর করবে, কিন্তু কক্ষপথের নির্দিষ্ট পয়েন্টে এটি পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসবে, যা হোম প্ল্যানেট বা নিজ গ্রহ থেকে আসা নভোচারী এবং সরবরাহগুলো তুলে নেওয়া সহজ করবে। যদি পদ্ধতিটি কাজ করে, তবে মানুষকে মঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার জন্য এটি পুনরাবৃত্তি করা হতে পারে। ধারণাটি হলো পৃথিবীর ওপর নির্ভরতা কমানো।

গেটওয়েতে একটি হ্যাবিটেশন অ্যান্ড লজিস্টিকস আউটপোস্ট (HALO) মডিউল থাকবে যেখানে নভোচারীরা চাঁদে সফরের মাঝখানে নব্বই দিন পর্যন্ত থাকতে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারবেন। হ্যালো (HALO) পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে একটি যোগাযোগ রিলে সিস্টেম হিসেবে এবং রোভার যানগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেও ব্যবহৃত হবে।

হ্যালো-তে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর একটি হবে বিকিরণ মাত্রা পরিমাপ করা। নভোচারীরা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বাইরে গেলে তারা উচ্চ-শক্তির চার্জযুক্ত কণার সংস্পর্শে আসেন যা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। আইএসএস লো আর্থ অরবিটে রয়েছে, যা সেখানে কর্মরত নভোচারীদের ওপর বিকিরণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কিন্তু গেটওয়ে অনেক বেশি মাত্রার বিকিরণের মুখোমুখি হবে। এটি ভেতরে বসবাসকারীদের রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হবে, কিন্তু তবুও দীর্ঘ সময় ধরে বিকিরণ এবং শরীরের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সঠিক পরিমাপ সংগ্রহ করবে।

২০৩০ সালের মধ্যে, গেটওয়ে তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত, টেস্ট রান সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং প্রথম নভোচারীদের চাঁদে পৌঁছে দেওয়া উচিত। আর্টেমিস সময়সূচি কয়েকবার পিছিয়েছে, কিন্তু ২০২২ সালের শেষের দিকে চালকবিহীন আর্টেমিস ১ মিশনের সফল উৎক্ষেপণের অর্থ হলো হেভি-লিফট এসএলএস রকেট তার প্রথম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। এটি যে ওরিয়ন মহাকাশযানটি নিয়ে গিয়েছিল তা চাঁদের বাইরে ৬৪,০০০ কিলোমিটার ভ্রমণ করেছিল, যা মানুষকে বহন করার জন্য ডিজাইন করা কোনো মহাকাশযানের দূরত্বের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। একই বছর নাসার মাইক্রোওয়েভ আকারের ক্যাপস্টোন (Capstone) মহাকাশযান গেটওয়ে কোথায় তৈরি করতে হবে তা নির্ধারণে সাহায্য করতে চাঁদের চারপাশে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৌঁছায়।

চন্দ্র অবতরণ স্থানটি এখনো বেছে নেওয়া হয়নি, তবে এটি দক্ষিণ মেরুর কাছে হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি হবে একটি প্রথম ঘটনা কারণ অ্যাপোলো নভোচারীরা কখনো কোনো মেরুর কাছাকাছি যাননি। বিজ্ঞানীরা এখনো আর্টেমিস বেস ক্যাম্প বা ঘাঁটি স্থাপনের জন্য সেরা জায়গা খুঁজছেন, যা প্রথমে কয়েক দিনের জন্য নভোচারীদের আতিথ্য দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ চন্দ্রঘাঁটি হয়ে উঠবে যেখানে থাকার জায়গা, রেডিয়েশন শিল্ড বা বিকিরণ ঢাল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যানবাহন এবং একটি ল্যান্ডিং প্যাড থাকবে।

নভোচারীদের পৃষ্ঠে যে পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে এবং সূর্যালোকিত ও ছায়াযুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে তাপমাত্রার বিশাল পরিবর্তনের কারণে, নাসা প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করছে নতুন প্রজন্মের স্পেসসুট, রোভার যান এবং ক্যামেরা ডিজাইন করার জন্য। প্রথম আমেরিকান স্পেসসুটগুলো ছিল উন্নত বিমানের উচ্চ-উচ্চতার ফ্লাইট সুট। প্রতিটি পরবর্তী প্রজন্ম আগেরটির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এবং সর্বশেষ সংস্করণটি বর্তমানে আইএসএস-এর বাইরে স্পেসওয়াকে ব্যবহৃত সুটগুলোর চেয়ে একটি গুরুতর উন্নতি। নাসা এগুলোকে এক্সপ্লোরেশন এক্সট্রাভেহিকুলার মোবিলিটি ইউনিটস বা সংক্ষেপে এক্সইএমইউ (xEMUs) বলে, যদিও আর্টেমিস স্পেসসুট বলাটা হয়তো সহজ হতো।

প্রথম দেখায় এগুলো অ্যাপোলো সুটের মতোই মনে হয় যা আমরা বাজ অলড্রিন এবং নীল আর্মস্ট্রংকে পরতে দেখেছিলাম, কিন্তু এক্সইএমইউ-গুলো মোটেও অতটা সীমাবদ্ধ নয়। এগুলোর পা, কোমর এবং বাহুর নড়াচড়া উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে এবং পরিধানকারীকে চাঁদে আসলে হাঁটতে দেয়, বিশ্রীভাবে খরগোশের মতো লাফানোর (bunny-hop) পরিবর্তে এবং হেলমেটের ওপরে বস্তু তুলতে দেয়। আগের সুটগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করত যতক্ষণ না সেগুলো স্যাচুরেশন পয়েন্ট বা সম্পৃক্ত বিন্দুতে পৌঁছায়; নতুন সংস্করণটি এটি শোষণ করবে এবং তারপর মহাকাশে পাম্প করে বের করে দেবে। ইলেকট্রনিক্সের ক্ষুদ্রায়নের ফলে ব্যাকপ্যাকে মূল সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিলিপি রাখা সম্ভব হয়েছে, ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা শব্দ এবং আলোসহ। হেলমেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং এতে একটি এইচডি ক্যামেরা এবং ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড বা কণ্ঠস্বর-চালিত মাইক্রোফোন রয়েছে যা একটি উচ্চ-গতির ডেটা লিঙ্কের সাথে সংযুক্ত... 'নাসা – সাইমন অ্যান্ড গারফঙ্কেল-এর "হোমওয়ার্ড বাউন্ড" বাজাও।'

সুটগুলো বিকিরণ এবং -১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এবং জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে ছয় দিনের জন্য পূর্ণ লাইফ

সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নাসা এগুলোকে 'ব্যক্তিগত মহাকাশযান' বলে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর এই সমস্ত টেকনো-জাদুকরী সত্ত্বেও, আমাদের সাহসী অভিযাত্রীদের এখনো ন্যাপী বা ডায়াপার পরতে হবে।

নতুন রোভার যানগুলোও লিক না করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। স্পেস এক্সপ্লোরেশন ভেহিকল (SEVs) নামের এই যানগুলো তাদের বিংশ শতাব্দীর সমতুল্য 'মুন বাগি'-র মতো দেখতে মোটেও নয়। নতুন মডেলগুলোতে প্রেসারাইজড বা চাপযুক্ত কেবিন থাকবে যা দুইজন নভোচারীকে তাদের সুট না পরেই ১০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে দীর্ঘ দূরত্ব ড্রাইভ করতে দেবে, তারপর তারা সুট পরে স্পেসওয়াকে বের হতে পারবে।

এসবকিছুরই খরচ আছে। অনেক। কিন্তু শীতল যুদ্ধের ব্যয়ের তুলনায়, এটি সস্তা। ১৯৬০-এর দশকে নাসার বার্ষিক ব্যয় ফেডারেল বাজেটের ৪ শতাংশে পৌঁছেছিল; আজ এটি মোটামুটি ০.৫ শতাংশ। পার্থক্য হলো সোভিয়েতদের হারিয়ে চাঁদে পৌঁছানোকে তখন মূল্যবান বলে মনে করা হতো। প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে পরিষেবা কেনার কারণেও খরচ কমেছে, যারা উদ্ভাবন করেছে এবং রকেট উৎক্ষেপণের খরচ কমিয়েছে।

আর্টেমিস কর্মসূচির সমস্ত পর্যায়ে, লঞ্চ রকেট থেকে রোভার পর্যন্ত, প্রাইভেট ফার্মগুলোর সাথে সহযোগিতা জড়িত। কিছু কোম্পানি মহাকাশ অন্বেষণে সহায়ক ভূমিকায় সন্তুষ্ট, কিন্তু বেশ কয়েকটি তাদের নিজস্ব মিশন এবং পরবর্তী মুনাফা তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার ইচ্ছা রাখে।

স্পেসএক্স নাসার কাছ থেকে লুনার ল্যান্ডিং মডিউল তৈরির চুক্তি জিতেছে যা গেটওয়ে থেকে নভোচারীদের চাঁদে পৌঁছে দেবে। এটি ইতোমধ্যেই আমেরিকান নভোচারীদের আইএসএস-এ আনা-নেওয়া করে। ২০১০ সালে স্পেসএক্স প্রথম প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ, পরিচালনা এবং পুনরুদ্ধার করে। দুই বছর পরে এটি প্রথম প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে এমন একটি যান উৎক্ষেপণ করে যা আইএসএস-এ পৌঁছায়। ২০২০ সালে এটি স্টারলিঙ্ক চালু করে, যা, যেমনটি আমরা অধ্যায় ৪-এ দেখেছি, ব্রডব্যান্ড সিগন্যাল সরবরাহ করে এবং বৃহত্তম স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন হয়ে উঠেছে। পরের বছর এটি প্রথম কোম্পানি হিসেবে অপেশাদার নভোচারীদের মহাকাশে পাঠায়। যখন একটি স্পেসএক্স রকেট ওপরে ওঠে, তখন এর প্রথম স্টেজ প্রায় দশ মিনিট পরে ফিরে আসে এবং সাধারণত, অবতরণ করে, আবার ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত। কোম্পানিটি রকেট

CamScanner

উৎক্ষেপণের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে স্টার্ট-আপগুলো বোয়িং-এর মতো হেভিওয়েটদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

ইলন মাস্কের পরিকল্পনা আছে। বড়ো, বিশাল পরিকল্পনা। যেমনটি আমরা দেখেছি, এর মধ্যে রয়েছে মঙ্গলে নভোচারী পাঠানো—শীঘ্রই। কেন যাওয়া? মাস্কের মতে, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষকে দুঃখিত বা বিষণ্ন করার মতো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু আমি মনে করি মহাকাশচারী সভ্যতায় পরিণত হওয়া এমন একটি বিষয় যা আপনাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্তেজিত করে।'

অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্টিন রিস মঙ্গলের দিকে মহাকাশযান যাওয়ার বিরোধী নন, কিন্তু এটি অগ্রাধিকার নয়। তিনি গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন যে মাস্কের ধারণাগুলো একটি 'বিপজ্জনক বিভ্রম... মঙ্গলে বাসযোগ্য করার চেয়ে পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা অনেক সহজ'।

জেফ বেজোসও দ্বিমত পোষণ করেন এবং তার পরিকল্পনা ভিন্ন। আমাজনের প্রাক্তন সিইও এবং ব্লু অরিজিনের প্রতিষ্ঠাতা শহর তৈরি করতে চান, তবে বাড়ির কাছে। তিনি যুক্তি দেন যে আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য গ্রহগুলো সেরা জায়গা নয়; এর পরিবর্তে তিনি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকারী বিশাল গম্বুজযুক্ত শহর তৈরি করার লক্ষ্য রাখেন। ওটা ডোমড (domed - গম্বুজযুক্ত), ডুমড (doomed - অভিশপ্ত) নয়।

স্বল্প মেয়াদে, ব্লু অরিজিন একটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ডিজাইন করেছে যা তারা আশা করে নাসা মুনবেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যবহার করবে। কোম্পানিটি ইতোমধ্যেই তার পুনর্ব্যবহারযোগ্য নিউ শেপার্ড রকেটে করে পর্যটকদের মহাকাশে আনা-নেওয়া করার ব্যাবসায় রয়েছে, যার নাম মহাকাশে প্রথম আমেরিকান অ্যালান শেপার্ডের নামে রাখা হয়েছে। বেজোস নিজেই এই ট্রিপ নিয়েছেন, যেমনটি নিয়েছেন উইলিয়াম শ্যাটনার, ওরফে ক্যাপ্টেন জেমস টি. কার্ক, যিনি নব্বই বছর বয়সে এই উচ্চতায় পৌঁছানো সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হয়েছেন।

ফিরে আসার পর তিনি কান্নায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন, যাত্রাকে তার 'সবচেয়ে গভীর অভিজ্ঞতা' বলে অভিহিত করেছিলেন।

ব্লু অরিজিনের বিশাল নিউ গ্লেন (জন গ্লেনের নামে) রকেটটি অর্থ প্রদানকারী গ্রাহকদের জন্য লো আর্থ অরবিটে ৪৫ টন পর্যন্ত কার্গো বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং বেজোসের এর বাইরেও পরিকল্পনা রয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি নিউ আর্মস্ট্রং রকেটের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। হ্যাঁ, নীল আর্মস্ট্রং।

CamScanner

রিচার্ড ব্র্যানসনের ভার্জিন গ্যালাকটিক ব্লু অরিজিনকে কয়েক দিনের ব্যবধানে মহাকাশে হারিয়ে দিয়েছিল, যদিও বেজোস এটি মেনে নেননি। ব্র্যানসনের রকেট একটি প্লেন থেকে উৎক্ষেপিত, তাকে প্রায় ৮৩ কিলোমিটার ওপরে নিয়ে গিয়েছিল। নাসা যা পৃথিবীর সীমানা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে তার মোটামুটি ওপরে। কিন্তু নিউ শেপার্ড ১০০ কিলোমিটার ওপরে গিয়েছিল, কারমান লাইনের ওপরে, যে উচ্চতাকে ফেডারেশন অ্যারোনটিক ইন্টারন্যাশনাল মহাকাশ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই উভয় কোম্পানিই সঠিক—নির্ভর করে আপনি কোথায় রেখা টানছেন তার ওপর।

ভার্জিন গ্যালাকটিক সাব-অরবিটাল পর্যটনে মনোনিবেশ করছে। প্রতি ফ্লাইট প্রায় ৪,৫০,০০০ ডলারে গ্রাহক বেস ছোটো, কিন্তু নিখুঁতভাবে ধনী। যদি ব্র্যানসন সঠিক হন, তবে কোম্পানির লাভ করার জন্য এবং গণবাজারের জন্য দাম কমানোর জন্য যথেষ্ট বহু-কোটিপতি সেখানে আছেন। এটি আশাবাদী মনে হতে পারে, কিন্তু ১৯০৩ সালে রাইট ভাইদের প্রথম ফ্লাইট এবং ১৯১৪ সালে (ফ্লোরিডায়) প্রথম নিয়মিত যাত্রী বিমান পরিষেবার মধ্যে মাত্র দশ বছরের একটু বেশি সময় ছিল এবং ট্রেনের চেয়ে বিমানে বেশি আমেরিকান ভ্রমণ করতে মাত্র আরও চার দশক সময় লেগেছিল।

ভার্জিন গ্যালাকটিক এবং ব্লু অরিজিনের এখন মহাকাশ পর্যটনের জন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। সিয়েরা স্পেস লঞ্চ প্যাডের নতুন বাচ্চা তাদের ড্রিম চেজার স্পেসপ্লেন নিয়ে, যা প্রথমে নাসার জন্য সাপ্লাই ক্রাফট হিসেবে ব্যবহার করা হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনাকে আপনার স্বপ্নের ছুটি দেওয়ার কথা—বা দুঃস্বপ্নের, আপনার মেজাজের ওপর নির্ভর করে।

এই কোম্পানিগুলো তুলে ধরে যে আমরা এখন বাণিজ্যিক মহাকাশ যুগে ভালোভাবে প্রবেশ করেছি। ব্যক্তিগত কর্পোরেশনের তৈরি এবং মালিকানাধীন যানবাহনে মহাকাশে প্রবেশ একটি ধাপ পরিবর্তন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এখন আর কেবল স্যাটেলাইট-সম্পর্কিত কার্যকলাপ থেকে মুনাফা করার চেষ্টা করছে না বরং মহাকাশ পর্যটন, দীর্ঘ-দূরত্বের পরিবহণ পরিষেবা, চাঁদ ও গ্রহাণু খনন এবং জিরো গ্রাভিটিতে থ্রিডি প্রিন্ট-ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

২০১০ সালে মেড ইন স্পেস, ইনক. (MIS) ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায় দুই রুমের একটি স্টার্ট-আপ ব্যাবসা। চার বছর পরে একটি এমআইএস জিরো-জি প্রিন্টার আইএসএস-এ পাঠানো হয়, যেখানে নভোচারী ব্যারি 'বুচ' উইলমোর এটি আনপ্যাক করেন এবং মহাকাশে তৈরি প্রথম পার্ট বা অংশটি প্রিন্ট করেন। ঠিক আছে, এটি কেবল প্রিন্টারটির জন্যই একটি ফেসপ্লেট ছিল, কিন্তু এটি ছিল বেশ বড়ো একটি

CamScanner

প্রথম পদক্ষেপ। পরে, উইলমোর বুঝতে পারেন তার একটি নির্দিষ্ট র‍্যাচেট রেঞ্চ বা রেঞ্চ দরকার। পৃথিবীতে এমআইএস কয়েক লাইন কোড টাইপ করে এবং আইএসএস-এ পাঠায় যেখানে উইলমোর যথাযথভাবে রেঞ্চটি প্রিন্ট করে নেন। এমআইএস-এর এখন মহাকাশে বড়ো ধাতব বিম থ্রিডি-প্রিন্ট করার জন্য নাসার সাথে ৭৪ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি রয়েছে। ওগুলো ওপরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে এটি অনেক সস্তা।

এমআইএস ৫,০০০-এরও বেশি আমেরিকান মহাকাশ-সম্পর্কিত কোম্পানির মধ্যে একটি। তারা রাষ্ট্রীয় সত্তার চেয়ে বেশি উদ্ভাবনী এবং ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ মহাকাশ ভ্রমণের খরচ নাটকীয়ভাবে কমাতে সফল হয়েছে, যা নাসাকে উঁচুতে লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করেছে।

নাসা সবসময় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর সাথে সহযোগিতা করেছে, কিন্তু স্টার্ট-আপগুলোর আধিক্য এবং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এটিকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছে। এটি বেশ কয়েকটির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার মাধ্যমে এটি তাদের চন্দ্রের মাটি সংগ্রহের জন্য অর্থ প্রদান করবে। ফিগুলো নগণ্য—একটি কোম্পানি চুক্তি জেতার জন্য মাত্র ১ ডলার চেয়েছিল—কিন্তু চুক্তিগুলো উভয় পক্ষের উপকার করে। কোম্পানিগুলো সম্পদ আহরণ অনুশীলন করতে পারে এবং নাসা এমন নজির তৈরি করে যা পরে তারা বাণিজ্যিকভাবে চাঁদে কাজ করার ব্যাবসায়িক এবং আইনি নিয়ম হিসেবে যুক্তি দেবে।

২০২২ সালের শেষের দিকে জাপানি কোম্পানি আইস্পেস (ispace) একটি স্পেসএক্স রকেটের ওপর তাদের মুন ল্যান্ডার উৎক্ষেপণ করে যা চাঁদের দক্ষিণ মেরুর দিকে যাচ্ছিল জলীয় বরফ খুঁজতে। নাসা যা পাওয়া যাবে তার 'মালিকানা' দাবি করেছে, যা আবারও প্রশ্ন তোলে চাঁদের মালিক কে। জাপান, ইউএই এবং লুক্সেমবার্গ আইন পাস করেছে যা তাদের কোম্পানিগুলোকে এই ধরনের লেনদেনে জড়িত হওয়ার অনুমতি দেয় এবং আমেরিকানরা ওবামা প্রশাসনের অধীনে ২০১৫ সালে একই ধরনের আইন পা[illegible]ছিল। ব্যক্তিগত ব্যাবসাগুলোর এখনো তাদের নিজস্ব মুনবেসের জন্য উন্নত প্রকল্প[illegible] নেই, কিন্তু সম্ভবত মার্কিন, চীনা এবং রাশিয়ান ফার্মগুলো তাদের নিজ দেশের তৈরি যেকোনো 'সার্বভৌম' ঘাঁটির সুবিধা নেবে।

নাসা ছোটো প্রকল্পগুলোর একটি পরিসর নিয়ে কাজ করছে, যেমন রোবোটিক গভীর মহাকাশ অন্বেষণের জন্য সোলার সেইল প্রোপালশন বা সৌর পাল চালনা এবং লেজার যোগাযোগ ব্যবস্থা, কিন্তু ফোকাস হলো আর্টেমিস, গেটওয়ে এবং একটি মুনবেস।

যুক্তরাষ্ট্র কেন ফিরে যাবে—এই যুক্তি মীমাংসিত হওয়ার আগেই সম্ভবত এটি তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি যেমন আছে, ভূ-রাজনীতি এবং এখন মহাকাশ-রাজনীতির বাস্তবতা ইঙ্গিত দেয় যে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উভয়ই বৃহৎ শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরবর্তী পর্যায়ে যাচ্ছে। যদি কেউ না যায়, তবে অন্যজনের জন্য চাঁদের 'মালিক' হওয়ার পথ খোলা থাকবে। সেখানে পাওয়া চন্দ্রের পানি এবং বিরল মৃত্তিকা ধাতু নবায়নযোগ্য সম্পদ নয়।

আমেরিকানরা শেষবার চাঁদে গিয়েছিল অনেক দিন হয়ে গেছে। পৃষ্ঠে পোঁতা ছয়টি আমেরিকান পতাকা এখন সূর্যের রশ্মিতে সাদা হয়ে গেছে। নাসার লুনার রিকনেসান্স অরবিটার ২০১২ সালে সেগুলোর মধ্যে পাঁচটিকে এখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। অ্যাপোলো ১১-এর পতাকাটি উলটে গিয়েছিল যখন অলড্রিন এবং আর্মস্ট্রং উড্ডয়ন করেছিলেন। পতাকাগুলো নাইলনের তৈরি এবং সম্ভবত আরও কয়েক দশকের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের উচিত অ্যাপোলো ১১-এর পতাকাটি উদ্ধার করে একটি জাদুঘরে রাখা এবং সেই সাথে- আর্মস্ট্রংয়ের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা এবং এটিকে চূড়ান্ত 'ওয়াক অফ ফেম' হিসেবে সংরক্ষণ করা। এখন ফিরে যাওয়ার একটা কারণ আছে।

আমি কিন্তু রাশিয়ার কথা বলিনি!?

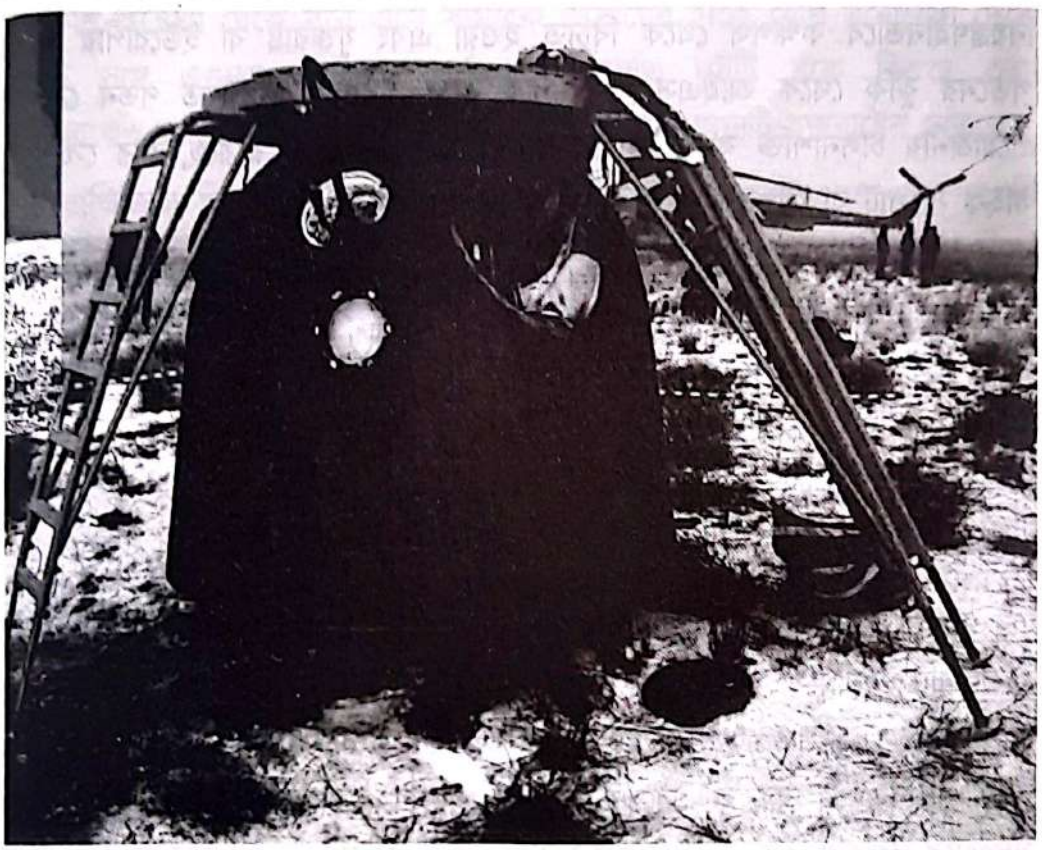
অধ্যায়-৭

রাশিয়া : পশ্চাদমুখী যাত্রা

(RUSSIA IN RETROGRADE)

"পৃথিবীই মানুষের ঘরবাড়ি, কিন্তু বিকাশের জন্য তাকে একসময় এর বাহিরে যেতে হয়।"

— 'মহাকাশযাত্রার জনক' কনস্ট্যান্টিন সোলকোভস্কি



১২ মার্চ ২০১৫ সালে কাজাখস্তানের জেজকাজগান শহরের কাছে অবতরণের পর রাশিয়ান সয়ুজ টিএমএ-১৪এম মহাকাশযান।

রাশিয়া প্রমাণ করেছে যে ঘন জনবসতিপূর্ণ বেসামরিক অঞ্চলের দিকে রকেট নিক্ষেপ করার ক্ষমতা এবং সদিচ্ছা—উভয়ই তাদের আছে। তবে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণে

যে দক্ষতার জন্য তারা বিশ্বজুড়ে পরিচিত, তা বর্তমানে দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, রুশ সেনারা যেদিন ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু করে, ঠিক সেই দিনই যুক্তরাষ্ট্র সরকার মস্কোর বিরুদ্ধে বিস্তৃত পরিসরের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয়। এসব নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ছিল এমন ব্যবস্থাও, যার লক্ষ্য ছিল মহাকাশ কর্মসূচিসহ রাশিয়ার বিমান ও মহাকাশ শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এ উদ্দেশ্যে সেমিকন্ডাক্টর, লেজার, সেন্সর এবং নেভিগেশন সরঞ্জামের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা রসকসমস (Roscosmos)-এর তৎকালীন প্রধান দিমিত্রি রোগোজিন এই ঘোষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ১৯৯৮ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) পরিচালনায় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে কাজ করে আসছে। তবে নিজের আট লক্ষ অনুসারীর উদ্দেশে করা এক টুইটে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করে দেন, তাহলে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ভূখণ্ডে পতনের ঝুঁকি থেকে আইএসএস-কে কে রক্ষা করবে?' পৃথিবীতে পতন ঠেকাতে প্রয়োজনীয় চালনাশক্তি বা প্রপালশন ব্যবস্থা রাশিয়ার হাতে রয়েছে, আর স্টেশনের লাইফ সাপোর্ট বা জীবনধারণ ব্যবস্থার দায়িত্ব আমেরিকার।

এটি ছিল তার গতানুগতিক আচরণ। এর আগেও রোগোজিন নিজের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, যখন তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমেরিকান নভোচারীরা বহু বছর ধরে ব্যবহৃত রাশিয়ান রকেটের বদলে ট্রাম্পোলিন বা লাফানোর যন্ত্র ব্যবহার করে আইএসএস-এ যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরদিন তিনি আরও কটাক্ষপূর্ণ ভঙ্গিতে বক্তব্য বদলে বলেন, "ওদের অন্য কিছুতে চড়ে উড়তে দিন—ঝাড়ুতে।"

এর জবাব দেয় আমেরিকার স্পেসএক্স। যেমনটি আমরা দেখেছি, ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই ইউক্রেনে স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছিল। ৯ মার্চ স্পেসএক্সের একটি ফ্যালকন ৯ রকেট একগুচ্ছ স্যাটেলাইট নিয়ে উৎক্ষেপণের মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে অবস্থান করছিল। সেই ইভেন্টের লাইভ সম্প্রচারে দর্শকরা শুনতে পান, লঞ্চ ডিরেক্টর জুলিয়া ব্ল্যাক তার দলকে বলছেন, 'সময় এসেছে আমেরিকান ঝাড়ু ওড়ানোর এবং স্বাধীনতার শব্দ শোনার।"

এরপর মিঃ রোগোজিন প্রবীণ মার্কিন নভোচারী স্কট কেলিকে 'মূর্খ' বলে কটাক্ষ করেন। তিনি এমনকি ইঙ্গিত দেন যে রাশিয়া চাইলে একজন নাসা নভোচারীকে আইএসএস-এ ফেলে রেখে আসতে পারে। পাশাপাশি তিনি একটি সয়ুজ রকেটের

গায়ে আঁকা আমেরিকান পতাকার ওপর টেপ লাগিয়ে দেওয়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। এর জবাবে স্কট কেলি বলেন, "ওই পতাকাগুলো আর সেগুলো থেকে আসা বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া আপনাদের মহাকাশ কর্মসূচির কোনো মূল্যই থাকত না। চাইলে আপনি ম্যাকডোনাল্ডসে চাকরি খুঁজে দেখতে পারেন—যদি রাশিয়ায় এখনো ম্যাকডোনাল্ডস থেকে থাকে।" বাস্তবে অবশ্য তখন আর রাশিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডস ছিল না।

একদিকে এসব ঘটনাকে বেশ মজাদার কথার লড়াই বা বচসা বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম কয়েক দশক ধরে গড়ে ওঠা একটি মহাকাশ অংশীদারিত্বের ভেঙে পড়া—এমন এক সম্পর্কের অবসান, যা বিজ্ঞান, দেতঁত বা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং সামগ্রিকভাবে মানবতার জন্যই উপকারী ছিল। মহাকাশে ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের রেখাগুলো নতুন করে আঁকা হচ্ছিল। ২০২২ সালের ঘটনাবলি এই আশঙ্কা আরও জোরালো করে তোলে যে রাশিয়া ধীরে ধীরে মহাকাশ অন্বেষণ থেকে সরে এসে সামরিক প্রয়োগের দিকে বেশি মনোযোগ দেবে। একই সঙ্গে এগুলো মহাকাশ কার্যক্রমকে কার্যত দুইটি ব্লকে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে—একটি চীনের নেতৃত্বে এবং অন্যটি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে।

এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ এবং এর পরপরই আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পর মস্কো ঘোষণা দেয় যে তারা আর যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রকেট ইঞ্জিন বিক্রি করবে না। তবে এটি আমেরিকার জন্য খুব বড়ো ধাক্কা ছিল না, কারণ তারা ইতোমধ্যেই মহাকাশসংক্রান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনছিল। রাশিয়া আরও জানায়, তারা আইএসএস-এ যৌথ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে জার্মানির সঙ্গে কাজ বন্ধ করবে। এর পালটা জবাবে জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে সব ধরনের বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা স্থগিত করে দেয়। এর মধ্যে ছিল একটি যৌথ রুশ-জার্মান প্রকল্পের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত জার্মান-নির্মিত একটি স্পেস টেলিস্কোপ বন্ধ করে দেওয়া, যা কৃষ্ণগহ্বর অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

এদিকে রসকসমস ফরাসি গায়ানার ইউরোপীয় স্পেসপোর্ট থেকে সয়ুজ রকেট উৎক্ষেপণ বন্ধ করে দেয় এবং সেখান থেকে তাদের কর্মীদের প্রত্যাহার করে নেয়। গায়ানা স্পেস সেন্টার সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখান থেকে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মতো উচ্চ-প্রোফাইল মিশনগুলো উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির (ইএসএ) এক্সোমার্স কর্মসূচিকে বড়ো ধরনের বিলম্বের মুখে ফেলে—যে কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল মঙ্গল গ্রহে একটি মিশন পাঠানো। শেষ পর্যন্ত ১২ জুলাই ইএসএ আনুষ্ঠানিকভাবে রসকসমসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং মঙ্গলে যাওয়ার বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করে। হয়তো চূড়ান্ত আঘাতটি আসে কয়েক দিন

আগেই, যখন রসকসমস আইএসএস-এ অবস্থানরত কসমোনটদের একটি ছবি প্রকাশ করে, যেখানে তারা ইউক্রেনের রাশিয়ান বাহিনীর দখলে থাকা দুইটি অঞ্চলের পতাকা হাতে ধরে রয়েছে।

রসকসমস আরও জানায় যে লন্ডনভিত্তিক ওয়ানওয়েব (OneWeb)-এর জন্য তারা ৩৬টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে না, যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যায় যে এসব স্যাটেলাইট সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না। স্যাটেলাইটগুলো কাজাখস্তানের রুশ-নিয়ন্ত্রিত বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে উৎক্ষেপণের কথা ছিল।

এছাড়া রসকসমস দাবি করে যে ওয়ানওয়েবের শেয়ারহোল্ডার তালিকা থেকে ব্রিটিশ সরকারকে সরে দাঁড়াতে হবে, কারণ যুক্তরাজ্য ২০২০ সালে কোম্পানিটিকে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষায় সহায়তা করেছিল।

এই শর্তগুলো ওয়ানওয়েব প্রত্যাখ্যান করে এবং জানায় যে তারা ওই উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে তাদের সব উৎক্ষেপণ কার্যক্রম স্থগিত করছে। পরে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও, স্পেসএক্স ওয়ানওয়েবের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে সহায়তা করে।

এই দুঃখজনক পালটাপালটি ঘটনার ফলে একাধিক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যার মধ্যে দিমিত্রি রোগোজিনও ছিলেন। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে রসকসমসের প্রধান পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তবে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ছিল রাশিয়া নিজেই এবং তার মহাকাশ কর্মসূচি, যা এখন ক্রমশ অবনতির পথে এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

রাশিয়া ইতোমধ্যেই রকেট ইঞ্জিন বিক্রি, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ পরিষেবা এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) নভোচারী পরিবহণের ক্ষেত্রে বাজারের অংশ হারাতে শুরু করেছিল। ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস শাটল কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, নাসাকে আইএসএস-এ পৌঁছাতে রুশ সয়ুজ মহাকাশযানের ওপর নির্ভর করতে হতো—এখান থেকেই রোগোজিনের সেই কুখ্যাত 'ঝাড়ু' বা ব্রুমস্টিক নিয়ে বিদ্রুপের জন্ম। তবে ২০২০ সাল থেকে নাসার হাতে স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুলের বিকল্পও চলে আসে, যা এই নির্ভরশীলতাকে অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

আইএসএস-এর বিশেষ ও জটিল পরিস্থিতির কারণে, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বিতর্ক সত্ত্বেও একটি কার্যকর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া ২০৩০ সাল পর্যন্ত স্টেশনের কার্যকাল বাড়াতে নাসাকে সহায়তা করতে আগ্রহী নয় বলেই মনে হচ্ছে। মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার সম্পর্কের চরম অবনতির প্রেক্ষাপটে, নাসা যে মার্কিন নেতৃত্বাধীন লুনার গেটওয়ে প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য রসকসমসকে আমন্ত্রণ জানাবে—এ সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

একইভাবে, ধারণা পর্যায়ে থাকা একাধিক বাণিজ্যিক স্পেস স্টেশনে অংশীদার হওয়ার জন্য বেসরকারি মার্কিন কোম্পানিগুলোও রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহ দেখাবে বলে মনে হয় না।

ফলে এমন এক সময়ে রাশিয়া বৈশ্বিক মহাকাশ সহযোগিতা, তহবিল এবং দক্ষ জনশক্তির বড়ো একটি অংশ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যখন এই খাতটি কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাকাশ বিজ্ঞান বা বিশ্বতত্ত্বে রাশিয়ার সেরা সময় সম্ভবত ইতোমধ্যেই পেছনে চলে গেছে। ভবিষ্যতে তাদের অবস্থান হয়তো চীন-রাশিয়া বা সিনো-রাশিয়ান অংশীদারিত্বে একটি গৌণ বা জুনিয়র সদস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। একসময় বিজ্ঞান ও মানব অভিযাত্রার আকাশে যে লাল তারাটি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করত, বর্তমান পরিস্থিতি সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগ থেকে অনেক দূরে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় স্পুটনিক উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠানো পর্যন্ত একের পর এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছিল। চাঁদে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলেও তাদের মহাকাশ অভিযানের সক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরে বজায় ছিল। তারা শুক্র ও মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত অভিযান চালায় এবং মহাকাশে দীর্ঘমেয়াদি মানব উপস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উন্নয়নে মনোযোগ দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে তারা লো আর্থ অরবিটে প্রথম স্পেস স্টেশন স্যালুট-১ (Salyut 1) সহ একাধিক মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ করে। তবে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা স্থায়ী হয়নি।

১৯৯১ সালের শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং পরের বছরের শুরুতে সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচির স্থলাভিষিক্ত হয় রাশিয়ান ফেডারেল স্পেস এজেন্সি, যা পরবর্তীতে রসকসমস নামে পরিচিত হয়। অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, ১৯৯০-এর দশকজুড়ে রুশ সরকার মহাকাশ বাজেটে ব্যাপক কাটছাঁট করে।

এছাড়া এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্পর্ক কখনোই পুরোপুরি মসৃণ বা উজ্জ্বল ছিল না। আইএসএস-কে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ের একাধিক ঘটনা রাশিয়ার অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে অসন্তোষ ও বিরক্তির জন্ম দিয়েছে।

২০১৮ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা টাস (TASS) মার্কিন নভোচারী সেরেনা আউনিয়ন-চ্যাম্বেলরকে নিয়ে একটি বিস্ময়কর ও বিতর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কোনো ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন না করেই প্রতিবেদনে কার্যত তাকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) 'তীব্র মানসিক সংকটে' ভোগার অভিযোগ আনা হয়

এবং দাবি করা হয় যে তিনি নাকি সেখানে ডক করা একটি সয়ুজ ক্যাপসুলে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ছিদ্র করেছিলেন। টাসের ওই মানহানিকর প্রতিবেদনের যুক্তি ছিল—এই ছিদ্রটি ধীরে ধীরে পুরো স্টেশনকে চাপমুক্ত করে দিত, যাতে পরিস্থিতির অজুহাতে তাকে দ্রুত পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো।

বাস্তবে একটি ছিদ্র পাওয়া গিয়েছিল এবং সেটি মেরামতও করা হয়। তবে এটি ঠিক কোথায় এবং কখন সৃষ্টি হয়েছিল, তা কখনোই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। ফলে এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায়নি যে ছিদ্রটি মহাকাশে নয়, বরং পৃথিবীতেই তৈরি হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু একজন আমেরিকান নভোচারী ইচ্ছাকৃতভাবে মহাকাশে এমন বিপজ্জনক কাজ করেছেন—এই ধারণা যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে কেউ দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। তথাকথিত 'প্রমাণ' সংগ্রহের নামে রাশিয়া এমনকি দুইজন ক্রু সদস্যকে স্পেসওয়াকে পাঠায়। একপ্রকার গোয়েন্দা ক্লুজো বা পোয়ারোর মহাকাশ সংস্করণের মতো তারা সঙ্গে ছুরি নিয়ে সয়ুজ যানের বাইরের ইনসুলেশনের অংশ কেটে 'অপরাধস্থল' তদন্ত করে। তবে ঘটনাটি নিয়ে রাশিয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক তদন্ত প্রতিবেদন আজ পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি।

২০২১ সালে আরও একটি গুরুতর ও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে। সুখবর ছিল—রাশিয়ার প্রায় ২০ টন ওজনের নাউকা (Nauka) ল্যাবরেটরি মডিউল সফলভাবে আইএসএস-এর সঙ্গে ডক করতে সক্ষম হয়। রুশ ভাষায় 'নাউকা' শব্দের অর্থ 'বিজ্ঞান' এবং এই মডিউলটি রসকসমসকে নতুন বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পরিচালনার সুযোগ দেয়, পাশাপাশি স্টেশনে একটি অতিরিক্ত টয়লেটও যোগ হয়। তবে দুঃসংবাদ ছিল, ডকিং সম্পন্ন হওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পর হঠাৎ নাউকার থ্রাস্টারগুলো সক্রিয় হয়ে যায়, যার ফলে পুরো আইএসএস নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঘুরতে শুরু করে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে মার্কিন ও রুশ মিশন কন্ট্রোলের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করা হয় এবং স্টেশনের অপর পাশের থ্রাস্টারগুলো চালু করে সেটিকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা এই জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে তখনই, যখন নাউকার জ্বালানি ফুরিয়ে যায়। রসকসমস শুরুতে ঘটনাটি নিয়ে খুব কম তথ্য প্রকাশ করলেও, পরে তারা দায় চাপায় নাউকার প্রপেলান্ট বা চালক ট্যাঙ্কে ব্যবহৃত ইউক্রেনীয়-নির্মিত যন্ত্রাংশের ওপর।

তবে এসব ঘটনার কোনোটিই ২০২১ সালের আরেকটি ঘটনার মতো উদ্বেগজনক ছিল না—যখন রাশিয়া নিজস্ব একটি অচল স্যাটেলাইট ধ্বংস করে এবং এর ফলে বিপুল পরিমাণ মহাকাশ বর্জ্য আইএসএস-এর কক্ষপথের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্প্রদায় একযোগে রাশিয়ার পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানায়।

CamScanner

এই সব ঘটনাই রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যকার মহাকাশ সহযোগিতার ক্রমাবনতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাস্তবে এই সম্পর্কের অবনমন শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলের আগেই, তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডটি দখল করে নেওয়ার ঘটনা সেই পতনের গতি আরও দ্রুততর করে তোলে।

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন কখনোই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রভাব উলটে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা গোপন করেননি। তিনি একাধিকবার সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'রাশিয়ার অন্য নাম' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সাবেক ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলো প্রথম সুযোগেই ন্যাটোতে যোগ দেওয়ায়, পুতিন উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন যে তার দৃষ্টিতে ন্যাটো ক্রমশ রাশিয়ার সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে।

এই শতাব্দীতে তিনি রাশিয়াকে আবারও একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন, যার প্রধান হাতিয়ার ছিল সামরিক বাহিনী। সোভিয়েত সামরিক কাঠামো ভেঙে পড়ার পর, ১৯৯২ সালে মস্কো রাশিয়ান স্পেস ফোর্সেস বা রুশ মহাকাশ বাহিনী গঠন করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বাহিনী বিভিন্ন কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় এবং বর্তমানে এটি রাশিয়ান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স ফোর্সেস-এর একটি উপ-শাখা হিসেবে কাজ করছে। বিমান ও মহাকাশ—এই দুই ক্ষেত্রের সব সামরিক দায়িত্ব একীভূত করে একটি কার্যকর একক কমান্ড গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সংযুক্তি করা হয়েছিল। এই দিক থেকে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় প্রায় চার বছর এগিয়ে ছিল।

রাশিয়ান স্পেস ফোর্সেস-এর নিজস্ব ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে মহাকাশে সম্ভাব্য হুমকি পর্যবেক্ষণ, আক্রমণ প্রতিহত করা, মহাকাশযান নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ এবং সামরিক ও বেসামরিক স্যাটেলাইট ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

২০০৩ সালে রাশিয়ান অ্যারোস্পেস ডিফেন্স ফোর্সেস-এর শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব গভীরভাবে লক্ষ্য করে, কীভাবে মার্কিন বাহিনী স্যাটেলাইটের সহায়তায় সৈন্য, সরঞ্জাম ও অবকাঠামোকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তু করে ইরাকের প্রায় পাঁচ লাখ সেনার বাহিনীকে কার্যত ধ্বংস করে দেয়। মার্কিন স্থলবাহিনী যখন ইরাকের ভেতরে প্রবেশ করে, তখন দেশটির সেনাবাহিনী আর কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার অবস্থায় ছিল না।

সামরিক বিশ্লেষকেরা উল্লেখ করেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি রেলওয়ে সেতু ধ্বংস করতে প্রায় ৯,০০০ বোমা ফেলতে হতো, যার জন্য ৪,৫০০ বার বিমান উড্ডয়ন প্রয়োজন ছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে একই লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে প্রয়োজন

হতো প্রায় ১৯০টি বোমা, আর কসোভোতে সেটি নেমে আসে মাত্র এক থেকে তিনটি ক্রুজ মিসাইলে। ইরাক আক্রমণের সময়, স্যাটেলাইট-নির্দেশিত একটি মাত্র ক্ষেপণাস্ত্রই যথেষ্ট ছিল। এতে মস্কো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে মহাকাশভিত্তিক সামরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছে এবং সেই ব্যবধান ঘোচানোর চেষ্টা শুরু করে।

এই প্রেক্ষাপটে রাশিয়া গ্লোনাস (GLONASS) বৈশ্বিক অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের জিপিএস-এর রাশিয়ান সমতুল্য। ২৪টি স্যাটেলাইট নিয়ে গঠিত গ্লোনাস নক্ষত্রমণ্ডল ১৯৯৫ সালে সম্পূর্ণ হয়েছিল, যা জিপিএসের তুলনায় মাত্র দুই বছর পরে। পূর্ণ বৈশ্বিক কভারেজ বজায় রাখতে নিয়মিত নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ জরুরি, যাতে বিকল বা মেয়াদোত্তীর্ণ স্যাটেলাইটগুলো প্রতিস্থাপন করা যায়। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে মহাকাশ কর্মসূচির বাজেট প্রায় ৮০ শতাংশ কমে যায়। এর ফল হিসেবে ২০০১ সালের মধ্যে মাত্র ছয়টি গ্লোনাস স্যাটেলাইট কার্যকর ছিল, যা এমনকি রাশিয়ার ভূখণ্ড কাভার করার জন্যও যথেষ্ট ছিল না। এটি মস্কোর কৌশলগত স্বার্থের জন্য এক গুরুতর ধাক্কা ছিল, কারণ গ্লোনাস নিশ্চিত করে যে রাশিয়ার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তু সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারবে।

২০০০ সালে পুতিন ক্ষমতায় আসার পর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি শুরু হয় এবং তিনি গ্লোনাস পুনরুদ্ধারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। এর বাজেট তিনি দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ান। এর ফলে ২০১১ সালের মধ্যে গ্লোনাস আবার ২৪টি স্যাটেলাইটে পূর্ণ হয় এবং এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ বৈশ্বিক কভারেজ প্রদান করতে সক্ষম হয়। যদিও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে মোবাইল ফোন ও গাড়ি নির্মাতাদের তাদের পণ্যে গ্লোনাস সমর্থন যুক্ত করানো রাশিয়ার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে, তবুও এর সামরিক সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং ব্যবস্থাটির নির্ভুলতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।

গ্লোনাসের ওপর এই জোরালো মনোযোগ স্পষ্ট করে যে সামরিক বাহিনীর জন্য পরিস্থিতিগত সচেতনতা ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যা কেবল স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। সিরিয়া ও ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানে গ্লোনাস ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে উচ্চ-নির্ভুল অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। এ কারণে ইউক্রেনীয় হ্যাকাররা গ্লোনাসকে লক্ষ্যবস্তু করার চেষ্টা করেছিল, যদিও তাদের সাফল্য ছিল সীমিত। ক্রেমলিন এই ব্যবস্থাগুলোর ওপর যত বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে, ততই এগুলো সুরক্ষিত রাখতে বিনিয়োগ করাটা তাদের কাছে যুক্তিসংগত হয়ে উঠেছে।

CamScanner

এর পাশাপাশি, রাশিয়া তার প্রতিপক্ষের স্যাটেলাইট ব্যবস্থায় আঘাত হানার সক্ষমতাও গড়ে তুলেছে। এর একটি উপায় হলো নিজের একটি স্যাটেলাইটকে অন্য দেশের স্যাটেলাইটের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। এ ধরনের কৌশলের বৈধ ব্যবহারও আছে—যেমন মহাকাশ বর্জ্যের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পরিদর্শন করা। তবে একইভাবে এর মাধ্যমে কোনো স্যাটেলাইট আটকানো, তরল পদার্থ ছিটিয়ে অন্ধ করে দেওয়া, কিংবা এমনকি গুলি চালানোর সম্ভাবনাও থাকে। যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করেছে যে রুশ স্যাটেলাইটগুলো তাদের আমেরিকান স্যাটেলাইটকে 'স্টকিং' বা অনুসরণ করছে।

২০২০ সালে মার্কিন স্পেস কমান্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, যখন তারা দেখতে পায় রাশিয়ার কসমস ২৫৪২ স্যাটেলাইট নিজের ভেতর থেকে আরেকটি স্যাটেলাইট ছেড়ে দিচ্ছে। অন্যান্য রুশ স্যাটেলাইটের কাছাকাছি থাকার পরিবর্তে, কসমস ২৫৪৩ তখন একটি মার্কিন সামরিক নজরদারি স্যাটেলাইটের দিকে অগ্রসর হয়। আরও ভীতিকর বিষয় হলো, পরবর্তীতে সেটি বাইরের মহাকাশে একটি উচ্চগতির প্রজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে দেয়, যা মহাকাশে সামরিক উত্তেজনাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়।

এই ঘটনাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে রাশিয়া মহাকাশে যুদ্ধ পরিচালনার সক্ষমতা গড়ে তুলতে নানা ধরনের বিকল্প নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে কিছু ব্যবস্থা দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য, অর্থাৎ যেগুলোকে বেসামরিক বা বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের আড়ালে রেখে সামরিক অভিপ্রায় অস্বীকার করা যায়। আবার কিছু ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে যুদ্ধ প্রতিরোধের যুক্তিতে—অর্থাৎ নিবৃত্তিমূলক বা ডিটারেন্ট হিসেবে—ন্যায্যতা দেওয়া হয়।

স্যাটেলাইটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ মহাকাশে আঘাত হানার জন্য ভূমি-ভিত্তিক অস্ত্রও উন্নয়ন করছে। ২০২১ সালে পরিচালিত অ্যান্টি-স্যাটেলাইট (ASAT) পরীক্ষাটি ছিল এমন বহু ঘটনার একটি, যা দেখায় যে রাশিয়া বুঝতে পেরেছে—মহাকাশে সরাসরি সামরিক শক্তির দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা প্রতিপক্ষের মূল অবকাঠামো অচল বা ধ্বংস করার সক্ষমতা প্রদর্শনের পথ বেছে নিচ্ছে। যে অকেজো স্যাটেলাইটটি তারা ধ্বংস করেছিল, সেটি ছিল তাদের বৃহত্তমগুলোর একটি। তারা চাইলে আরও ছোটো এবং কম বর্জ্য সৃষ্টিকারী স্যাটেলাইট বেছে নিতে পারত। কিন্তু তারা স্পষ্টতই একটি বার্তা দিতে চেয়েছিল। ক্রেমলিনের দৃষ্টিতে, এটি ছিল এক ধরনের যুক্তিসঙ্গত 'বীমা পলিসি'।

একই যুক্তি প্রযোজ্য একটি পরিবর্তিত মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান থেকে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের প্রকল্পের ক্ষেত্রেও। এই বিমানটি এমনিতেই সুপারসনিক, অর্থাৎ শব্দের

চেয়েও দ্রুত গতিতে উড়ে। ধারণা করা হয়, এই রকেট একটি ছোটো স্যাটেলাইট বহনে সক্ষম—সম্ভবত এমন একটি স্যাটেলাইট, যেটি অস্ত্র নিক্ষেপ করতেও পারবে।

ইতোমধ্যেই কার্যকর একটি ব্যবস্থা হলো পেরেসভেট (Peresvet) লেজার সিস্টেম, যা বিশেষভাবে স্যাটেলাইট মোকাবিলার জন্য তৈরি। এগুলো ট্রাকে বসানো লেজার ইউনিট, যেগুলো রাশিয়ার পাঁচটি মোবাইল আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিভিশনের সঙ্গে মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, রাশিয়ার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিদেশি স্যাটেলাইটগুলোকে লক্ষ্য করে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ব্যাহত করা, যাতে এই ইউনিটগুলোর গতিবিধি ট্র্যাক করা না যায়। তবে এটি স্পষ্ট নয় যে পেরেসভেট কেবল 'ড্যাজল' করতে পারে, নাকি 'ব্লাইন্ড' করতেও সক্ষম।

ড্যাজল বলতে বোঝায়, স্যাটেলাইটের সেন্সরগুলোকে এত বেশি আলোয় আচ্ছন্ন করা যে সেগুলো সাময়িকভাবে কার্যকারিতা হারায়। আর ব্লাইন্ডিং মানে স্যাটেলাইটের ইমেজিং বা ছবি তোলার ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এই পাঁচটি ইউনিটের কোনোটি বাস্তবে এসব সক্ষমতা সফলভাবে প্রয়োগ করেছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য নেই।

বেশিরভাগ বিশ্লেষকের ধারণা, পেরেসভেট কেবল ড্যাজল করার ক্ষমতাই রাখে। তবে নির্ভরযোগ্য অনলাইন সাময়িকী *স্পেস রিভিউ* জানায়, রাশিয়া কালিনা (Kalina) নামে পরিচিত একটি নতুন ও আরও শক্তিশালী ব্যবস্থার মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে প্রস্তুত হচ্ছে। ২০২২ সালে প্রকাশিত এক গভীর অনুসন্ধানে গুগল আর্থের স্যাটেলাইট ছবি ও উন্মুক্ত পেটেন্ট নথি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রাশিয়ার ক্রোনা (Krona) স্পেস সার্ভেইলেন্স কমপ্লেক্স এমন একটি উন্নত লেজার সিস্টেম নিয়ে কাজ করছে, যা একটি স্যাটেলাইট সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।

ক্রোনা কমপ্লেক্সটি জর্জিয়ার সীমান্তের কাছে, জেলেনচুকস্কায়া শহরের ঠিক পশ্চিমে, প্রায় দুই কিলোমিটার উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। সেখানে নতুন করে মাটি খোঁড়া হয়েছে এবং একটি টেলিস্কোপ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে নকশা করা একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। *স্পেস রিভিউ*-এর তথ্য অনুযায়ী, নির্মাণ দরপত্রের প্রযুক্তিগত নথিতে উল্লেখ রয়েছে যে ভবনটি +৪০ থেকে -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কাজ করতে পারবে এবং রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করার ক্ষমতা রাখবে। গম্বুজটির দুটি অংশ রয়েছে, যা দশ মিনিটেরও কম সময়ে খুলে ফেলা যায়, ফলে টেলিস্কোপটি পুরো আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

এই ভবনটি একটি টানেলের মাধ্যমে আরেকটি ভবনের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে একটি লিডার (Lidar—Light Detection and Ranging) যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। লিডার

একটি স্যাটেলাইটের দিকে আলোর পালস পাঠায় এবং সেই আলো ফিরে আসতে কত সময় লাগে তা মেপে স্যাটেলাইটটির অবস্থান, গতি ও গতিপথ সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা দেয়। যন্ত্র যত উন্নত হয়, পরিমাপ তত বেশি নিখুঁত হয়।

কালিনা কার্যকর হলে, এই পর্যায়ে এসে লেজারটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর ওপর ফোকাস করে ফায়ার করা শুরু করবে। যেহেতু লেজার বিমকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যেতে হবে, তাই সেটিকে অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে। আলো যত বেশি শক্তিশালী হবে, ক্ষতির সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। বেশিরভাগ পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট লো আর্থ অরবিটে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মাত্র কয়েকশ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থান করে। ধারণা করা হয়, কালিনা একটানা কয়েক মিনিট ধরে একটি স্যাটেলাইটকে লক করে ট্র্যাক করতে পারবে এবং এই সময়ের মধ্যে সেটিকে ড্যাজল বা ব্লাইন্ড—দুটোই করতে সক্ষম হবে। *স্পেস রিভিউ*-এর অনুমান অনুযায়ী, এই সিস্টেম রাশিয়াকে যেকোনো এক সময়ে প্রায় ১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা পর্যবেক্ষণের বাইরে রাখতে সক্ষম করবে—যা আয়তনে পর্তুগালের চেয়েও বড়ো।

কালিনা একটি স্যাটেলাইটের নির্দিষ্ট অংশ নির্বাচন করে সেখানে লেজারের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতেও সক্ষম হবে। এর ফলে স্যাটেলাইটের ক্যামেরা বা ইঞ্জিন পুড়ে যেতে পারে এবং সেটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। সিডি প্লেয়ার বা অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত লেজারের তুলনায় এ ধরনের লেজার হাজার হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। কালিনার নকশা এমন যে কয়েক মিটার ব্যাসের টেলিস্কোপ থেকে ছোঁড়া একাধিক লেজার বিম পরস্পরের সমান্তরালে চলবে, ফলে শক্তি ছড়িয়ে পড়বে না। সিস্টেমটি কার্যকর হলে, এটি এমনকি জিওস্টেশনারি কক্ষপথের মতো অনেক উঁচুতে থাকা স্যাটেলাইটগুলোকেও অচল করে দিতে সক্ষম হতে পারে।

একবার মোতায়েন হলে, এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি সহজেই অস্বীকার করা সম্ভব। লেজার বিম চোখে দেখা যায় না, ফায়ার করার সময় কোনো বিকট শব্দ হয় না, আর পরে ধোঁয়া বা বিস্ফোরণের চিহ্নও থাকে না। তখন মস্কো বলতে পারে—'ওটা কী? লেজার? যুদ্ধের অস্ত্র? আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। উত্তর কোরিয়ায় খুঁজে দেখেছেন?'

এখন কল্পনা করুন, এমন অস্ত্র যদি মহাকাশে থেকে নয়, বরং মহাকাশ থেকেই ছোঁড়া হয়। সেক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডল না থাকায় বিমকে বিচ্যুত বা দুর্বল করার কোনো বাধা থাকবে না। ফলে অস্ত্রটি আকারে ছোটো হতে পারে, আর লক্ষ্যবস্তু হতে পারে অনেক বড়ো—যেমন একটি স্পেস স্টেশন।

কালিনা সেই নতুন প্রজন্মের অস্ত্রব্যবস্থাগুলোর একটি, যেগুলোকে পুতিন 'সুপারোরুঝিয়ে' বা 'সুপার অস্ত্র' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই তালিকায় রয়েছে

হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, যেগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে চলার সময় দিক ও উচ্চতা পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে লক্ষ্যবস্তু দেশগুলোর পক্ষে ক্ষেপণাস্ত্রটির গতিপথ আগাম নির্ধারণ করা এবং প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

২০১৮ সাল থেকে মহাকাশে রাশিয়ার সামরিক কর্মকাণ্ড চীনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো মার্কিন মহাকাশ শ্রেষ্ঠত্বকে দুর্বল করা এবং তাদের অবকাঠামোর জন্য হুমকি সৃষ্টি করা। এই সহযোগিতার শিকড় রয়েছে ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে। ১৯৮৯ সালে তিয়ানানমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়নের পর চীনের ওপর বিভিন্ন প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। একই সময়ে রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসছিল। এই প্রেক্ষাপটে বেইজিং ও মস্কো ধীরে ধীরে মহাকাশ নীতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার পথে এগোতে শুরু করে।

২০১৮ সালের মধ্যেই রাশিয়া ও চীন রকেট ইঞ্জিন, স্পেস প্লেন, স্যাটেলাইট নেভিগেশনসহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে মহাকাশ বর্জ্য পর্যবেক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে, যেমনটি আগেই দেখা গেছে, এই শেষ বিষয়টি যতটা নিরীহ শোনায়, বাস্তবে ততটা নয়। কারণ আপনার হাতে যদি একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেটিই খুব সহজে একটি গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থায় রূপ নিতে পারে।

এই সহযোগিতা এবং মহাকাশ-সংক্রান্ত অস্ত্র প্রযুক্তিতে অগ্রগতিই মূলত ব্যাখ্যা করে কেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধের লক্ষ্যে উত্থাপিত যৌথ রুশ-চীনা প্রস্তাবগুলোর প্রতি সন্দেহ পোষণ করে আসছে। ২০০৮ ও ২০১৪ সালে উত্থাপিত খসড়া চুক্তিগুলোর পাঠ্য নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে এবং সেগুলোর সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো—যা বলা হয়েছে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, যা বলা হয়নি।

খসড়াগুলোতে 'শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য' ও 'অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ'-এর মতো শব্দগুচ্ছ থাকলেও, অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাব ও চুক্তির মতোই এগুলো বাইরের মহাকাশে কোন অস্ত্রকে অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হবে—সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেয় না। একইভাবে, এক দেশের স্যাটেলাইট অন্য দেশের স্যাটেলাইটের কতটা কাছে যেতে পারবে, সে সম্পর্কেও কোনো সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আরও গুরুতর সমস্যা হলো—কালিনার মতো ভূমি-ভিত্তিক অ্যান্টি-স্যাটেলাইট অস্ত্রের উন্নয়ন, পরীক্ষা কিংবা মজুদের বিষয়টি এসব খসড়ায় কার্যত অনুল্লেখিত। এই অস্পষ্টতা মস্কো ও বেইজিং—উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক।

রাশিয়া ও চীন ভালোভাবেই জানে যে প্রচলিত সামরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে, আর আধুনিক প্রচলিত যুদ্ধ ব্যাপকভাবে স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল। তাই পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইটে আঘাত হানতে সক্ষম এমন অস্ত্রগুলো নিষিদ্ধ করার বিষয়ে তারা খুব একটা আগ্রহ দেখায় না।

আগেই যেমন বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র 'ডাইরেক্ট-অ্যাসেন্ট' অ্যান্টি-স্যাটেলাইট অস্ত্রের ওপর বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব দিয়েছে, কারণ এসব অস্ত্র মহাকাশ বর্জ্য সৃষ্টি করতে পারে। একই সঙ্গে নতুন প্রযুক্তির ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো মোকাবিলার জন্য তারা আরও বিস্তৃত ও সমন্বিত আন্তর্জাতিক চুক্তির আহ্বান জানিয়েছে। তবে এ ধরনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐকমত্যে পৌঁছানো কঠিন বলেই মনে হচ্ছে, বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্র নিজেও ভূমি থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র ও অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে তুলনামূলকভাবে বেশি সম্ভাব্য যে দৃশ্যপটটি সামনে আসছে, তা হলো—রাশিয়া ও চীন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর করবে, বিশেষ করে ২০৩৫ সালের মধ্যে 'চাঁদের পৃষ্ঠে এবং/অথবা কক্ষপথে' একটি আন্তর্জাতিক চন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র (International Lunar Research Station) স্থাপনের মতো যৌথ উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে।

প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা *নো-হাউ* স্থানান্তরের অংশ হিসেবে রাশিয়া ও চীন একে অপরের স্যাটেলাইট নেভিগেশন ব্যবস্থা—রাশিয়ার গ্লোনাস (GLONASS) এবং চীনের বেইদু (BeiDou)—পারস্পরিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এর অর্থ হলো, যদি ভবিষ্যতে কোনো এক দেশ তৃতীয় কোনো পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং তার নিজস্ব যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সে অন্য দেশের সিস্টেম ব্যবহার করে সেই ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারবে।

শুনতে এটি উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক বা 'উইন-উইন' পরিস্থিতি মনে হলেও, বাস্তবে একটি বড়ো সমস্যা রয়েছে—পুতিনের ভাষায় বললে, "আমাদের একটা সমস্যা আছে।"

এই অংশীদারিত্বে রাশিয়া ক্রমশ জুনিয়র পার্টনার বা কনিষ্ঠ অংশীদারের ভূমিকায় চলে যাচ্ছে, অথচ ইতিহাস, আত্মপরিচয় ও রাজনৈতিক মানসিকতার দিক থেকে রাশিয়া কোনো ক্ষেত্রেই জুনিয়র পার্টনার হতে চায় না। মস্কোর রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, গৌরবময় কিংবদন্তি এবং দেখানোর মতো অসংখ্য পদক। কিন্তু বেইজিংয়ের হাতে রয়েছে অর্থনৈতিক শক্তি ও শক্তিশালী অবকাঠামো এবং তারা আর কেবল তাল মেলানোর খেলায় নেই। একসময় প্রচলিত ধারণা ছিল যে চীনের মহাকাশ প্রযুক্তি

মূলত রাশিয়ান প্রযুক্তির নকল বা পুনর্গঠিত সংস্করণ। সেই ধারণা এখন অনেক আগেই অচল হয়ে গেছে।

আজ চীনের নিজস্ব একটি কার্যকর স্পেস স্টেশন রয়েছে, রাশিয়ার নেই। চীন চাঁদের উলটো পিঠে—ফার সাইডে—সফলভাবে মহাকাশযান নামাতে পেরেছে, রাশিয়া তা পারেনি। ভারী রকেট বা হেভি-লিফট উৎক্ষেপণ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিতেও চীন এগিয়ে, আর দেশটির মহাকাশভিত্তিক বেসরকারি খাত তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গতিশীল ও উদ্ভাবনী।

বাস্তবতা হলো, রাশিয়ার চীনের প্রয়োজন যতটা, চীনের রাশিয়ার প্রয়োজন তার চেয়ে কম। এর অর্থ দাঁড়ায়, মস্কোকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে বেইজিং যথেষ্ট হিসেবি ও সতর্ক থাকবে। বিশেষ করে পশ্চিমা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে, চীন রাশিয়াকে উচ্চপ্রযুক্তি সরবরাহ করতে অনাগ্রহী—কারণ তাতে নিজেদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঝুঁকি রয়েছে।

এই 'বন্ধুত্বে' চীনের দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, অংশীদারিত্বটি রাশিয়ার জন্য কিছু বাস্তব সুবিধা নিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে সরে দাঁড়ানোর পর, দীর্ঘ সময়ের জন্য মহাকাশে কসমোনট পাঠানোর একমাত্র বাস্তবসম্মত প্ল্যাটফর্ম হবে চীনের স্পেস স্টেশন। চীনের সহায়তা ছাড়া রাশিয়ার পক্ষে চাঁদে নিজস্ব ঘাঁটি নির্মাণ করাও কার্যত অসম্ভব। এই অংশীদারিত্ব রাশিয়াকে এখনো একটি প্রধান মহাকাশ শক্তি হিসেবে প্রতিযোগিতায় থাকার সুযোগ দেয়, আর চীনকে তুলনামূলক কম দামে রুশ তেল ও গ্যাস কেনার সুযোগ করে দেয়।

এই চুক্তির পেছনে আরও একটি বৃহত্তর কৌশল রয়েছে—মার্কিন নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনামূলকভাবে শিথিল জোটের বিপরীতে একটি বিকল্প শক্তি-ব্লক গড়ে তোলা এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশকে সেই ব্লকে টেনে আনা। কিন্তু রাশিয়ার মহাকাশ কর্মসূচির ক্ষেত্রে, এটি এমন এক প্রস্তাব যা অনেক দেশই গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে।

রাশিয়া একসময় ছিল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির শীর্ষে—কাটিং-এজ। এখন পরিস্থিতি এমন যে তাকে ধীরে ধীরে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সে নিজেই নিজেকে কোণঠাসা করছে। নতুন আইন অনুযায়ী, রাশিয়ার কোনো গণমাধ্যম যদি দেশের মহাকাশ শিল্প সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যও প্রকাশ করে, তবে সেই নিবন্ধ, টুইট বা পোস্টে একটি বাধ্যতামূলক দাবিত্যাগ যুক্ত করতে হবে : "এই প্রতিবেদন (উপাদান) একটি বিদেশি গণমাধ্যম দ্বারা তৈরি বা বিতরণ করা হয়েছে, যা বিদেশি এজেন্টের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং/অথবা একটি রাশিয়ান আইনি সত্তা দ্বারা প্রকাশিত, যা বিদেশি এজেন্টের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।"

রাশিয়ায় 'বিদেশি এজেন্ট' হিসেবে চিহ্নিত হওয়া কখনোই ভালো বিষয় ছিল না—এমনকি সেরা সময়েও। আর বর্তমান সময় তো মোটেও সেরা নয়। এর ফলে মহাকাশ বিষয়ে প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ান জনগণ সরকার অনুমোদিত, প্রায়শই সরলীকৃত ও একপাক্ষিক বিবরণ ছাড়া অন্যান্য তথ্য থেকে কার্যত বঞ্চিত হবে।

২০১৯ সালের একটি জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৩১ শতাংশ রাশিয়ান নিয়মিতভাবে মহাকাশসংক্রান্ত খবর অনুসরণ করে। প্রায় ৫৯ শতাংশ নাগরিক চেয়েছিল যে দেশটি তার মহাকাশ কার্যক্রম বজায় রাখুক এবং ৫৩ শতাংশ বিশ্বাস করত যে রাশিয়া তা করতে সক্ষম হবে।

সবকিছু সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে পতনের লক্ষণ দেখা দিলেও মস্কো এখনো 'শীর্ষ লিগে' থাকার পরিকল্পনা ছেড়ে দেয়নি।

রাশিয়ার নতুন 'মুকুটের রত্ন' হলো তাদের সবচেয়ে আধুনিক মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র—ভোস্তোচনি কসমোড্রোম (Vostochny Cosmodrome)। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর, রাশিয়ার নিজস্ব ভূখণ্ডে কোনো বড়ো স্পেসপোর্ট ছিল না; বাইকোনুর থেকে উৎক্ষেপণের জন্য তাদের কাজাখস্তানকে ভাড়া দিতে হতো। এই বিব্রতকর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেতে ক্রেমলিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং ভোস্তোচনিকে তার সমাধান হিসেবে বেছে নেয়।

ভোস্তোচনি কসমোড্রোমের মাধ্যমে রাশিয়া সোভিয়েত অতীতের উত্তরাধিকার থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে চায় এবং একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে চায় যে তাদের সামরিক ও বেসামরিক মহাকাশ কর্মসূচির প্রধান উপাদানগুলো সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সীমান্তের ভেতরেই থাকবে। এর মধ্য দিয়ে মস্কো কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে।

২০০৭ সালে রাশিয়ার সুদূর-পূর্বের আমুর ওব্লাস্টে ভোস্তোচনি কসমোড্রোমের নির্মাণ শুরু হয়। এটি মস্কো থেকে প্রায় ৮,০০০ কিলোমিটার দূরে এবং চীনের সীমান্ত থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নিকটতম শহর হলো ব্লাগোভেশচেনস্ক, যেখানে জনসংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০। শহরটি আমুর নদীর উত্তর তীরে এবং নদীর ওপারে আধুনিক হাই-রাইজ অ্যাপার্টমেন্ট ও অফিস ব্লক দিয়ে আলোকিত চীনা শহর হেইহে দেখা যায়। পঞ্চাশ বছর আগে হেইহে ছিল একটি ঘুমন্ত গ্রাম; এখন এটি ২৫০,০০০ জনের বাসস্থান এবং চীনের মহাকাশ, অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়েছে—রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটি চিহ্ন।

ভোস্তোচনি কসমোড্রোমের নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হলো আমুর ওব্লাস্টে অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলা। অঞ্চলটি রাশিয়ার অন্যতম অনুন্নত এবং বিচ্ছিন্ন এবং তাই অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কসমোড্রোমটি একটি সাবেক আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল ঘাঁটিতে নির্মিত হওয়ায় বিদ্যমান রেললাইন ও অন্যান্য অবকাঠামোর সুবিধা ব্যবহার করা সম্ভব। এর প্রত্যন্ত অবস্থান রকেট উৎক্ষেপণের সময় শহুরে এলাকায় আঘাতের ঝুঁকি কমায়। তাছাড়া, এখানকার অক্ষাংশ এমন যে রকেটগুলো বাইকোনুর থেকে উৎক্ষেপিত রকেটের প্রায় সমান ওজন বহন করতে সক্ষম। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান হাইওয়ের কাছে অবস্থিত হওয়ায় সাইটটি নতুন শহর গড়ার এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট বড়ো।

নির্মাণের সময় ভোস্তোচনি বাজেটের চেয়ে বেশি খরচে তৈরি হয় এবং স্থানীয় দুর্নীতিতে জর্জরিত ছিল, যা রাশিয়ার প্রায় সব শিল্পকেই প্রভাবিত করেছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন সরাসরি জোর দিয়ে বলেছেন, এটি কার্যত একটি 'জাতীয় প্রকল্প', কিন্তু শীর্ষ কর্মকর্তারা শত শত মিলিয়ন ডলার লুটেছে। অন্তত ১৭০ মিলিয়ন ডলার লুট হওয়ার অভিযোগে কর্মকর্তাদের মধ্যে ডজনখানেককে গ্রেপ্তার এবং কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বর্তমানে রকেটগুলো সাইট থেকে উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে, তবে আরও কয়েকটি ছোটো প্রকল্প শেষ হতে অন্তত এক দশক সময় লাগতে পারে। ফলে আরও তহবিলের অপব্যবহার বা দুর্নীতির সুযোগ এখনো রয়েছে। সাইটের প্রধান প্রবেশদ্বারে লেখা আছে : "তারায় যাওয়ার পথ এখান থেকে শুরু হয়।" কেউ সাহস করে যোগ করেনি, "যদি টাকা ফুরিয়ে যায়।"

উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও, আমেরিকান ও চীনা মহাকাশ কর্মসূচির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, সরঞ্জাম ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। তবে, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলি বর্তমানে এগোচ্ছে।

২০২৬ সালের মধ্যে ভোস্তোচনি থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য দুই-ধাপের রকেট 'আমুর' (Amur) উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে। এটি দেখতে ফ্যালকন ৯-এর মতো হলেও ছোটো এবং মাত্র ১০.৫ টন কার্গো বহন করতে সক্ষম। এটি সয়ুজ ২-এর একটি আপগ্রেড, কিন্তু ফ্যালকন ৯-এর অর্ধেকও বহন করতে পারবে না।

রাশিয়ার নতুন অরবিটাল সার্ভিস স্টেশন (ROSS)-এর নকশা সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু কক্ষপথে পৌঁছানোর সময়সূচি ২০২৫ থেকে ২০২৮-এ পিছিয়ে গেছে। কিছু বিশেষজ্ঞ ২০৩০ সালের কথাই বলছেন। রসকে আইএসএস-এর তুলনায় ছোটো করা হয়েছে

এবং বছরে মাত্র চার মাস কসমোনটরা অবস্থান করবে, যা গবেষণার সুযোগ সীমিত করবে। এছাড়া, বৃহস্পতির কাছে একটি চালকবিহীন মহাকাশযান 'স্পেস টাগ' তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে লেজার অস্ত্র এবং বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের জন্য ৫০০ কিলোওয়াট পারমাণবিক চুল্লি থাকবে। প্রথম মিশন 'জিউস' (Zeus) ২০৩০ সালে উৎক্ষেপণের কথা। ২০২১ সালের মস্কো এয়ার শো-তে প্রদর্শিত মক-আপটি বিশাল মেকানোর মতো দেখাচ্ছিল, তবে প্রযুক্তি কাজ করলে বৃহস্পতিতে চার বছরের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে, যেমন মঙ্গলে দুই বছরের ক্রুড রাউন্ড ট্রিপ।

একটি স্পেস স্টেশন, একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট, একটি স্পেস টাগ—সবই চিত্তাকর্ষক প্রকল্প। এখন প্রয়োজন শুধু যথেষ্ট তহবিল, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি, যাতে এই পরিকল্পনাগুলো কেবল তালিকায় থেকে বাস্তব মহাকাশ অভিযানে পরিণত হয়।

ইউক্রেনে আক্রমণের আগেই রাশিয়ার মহাকাশ কার্যক্রম অর্থনৈতিকভাবে সমস্যায় ছিল। উদাহরণস্বরূপ, তাদের "কসমিক ট্যাক্সি" বা মহাজাগতিক ট্যাক্সি পরিষেবা ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছিল। আইএসএস-এ বিদেশী নভোচারীদের নেওয়ার জন্য যাত্রী প্রতি ৭০ মিলিয়ন ডলার চার্জ করলেও, এটি আর আগের মতো রাজস্ব আনতে পারছিল না। তদুপরি, আমেরিকা রাশিয়ান উৎপাদিত রকেট ইঞ্জিন কেনা বন্ধ করে দিয়েছে এবং মেইড-ইন-ইউএসএ সংস্করণ ব্যবহার করছে।

রাশিয়া তার সামরিক মহাকাশ কর্মসূচির বাজেট প্রকাশ করে না, তবে ওপেন-সোর্স রিপোর্ট অনুযায়ী এটি বছরে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার। রসকসমসের তহবিল প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় হয়নি। তুলনায়, নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের খরচ ১০ বিলিয়ন ডলার, নাসার বার্ষিক বাজেট প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার এবং মার্কিন সামরিক মহাকাশ কার্যক্রমের ব্যয় ২০২৩ সালে ২৬.৩ বিলিয়ন ডলার। চীনের ব্যয় অনেক কম, প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার, তবে তারা তা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

রাশিয়ার মহাকাশ শিল্প পদ্ধতিগত সমস্যায় ভুগছে। দুর্নীতি বিস্তৃত এবং ভোস্তোচনি কসমোড্রোম ছাড়া তারা পুরনো, সীমান্তের বাইরে থাকা অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। দেশীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগও বিনিয়োগ করতে অনিচ্ছুক, কারণ এটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প এবং নিষেধাজ্ঞার চাপের মুখে।

একই সঙ্গে, রাশিয়ার জনসংখ্যার বার্ধক্যজনিত প্রভাবও রয়েছে। অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনীর বড়ো অংশ অবসরের দিকে, ফলে এই দশকে তাদের প্রতিস্থাপন করতে প্রায় ১,০০,০০০ উচ্চ প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিভাবান তরুণ প্রকৌশলী ও

CamScanner

বিজ্ঞানীরা এমন একটি শিল্পে কাজ করতে আগ্রহী নয় যেখানে বেতন অন্যান্য হাই-টেক খাতের তুলনায় কম।

রাশিয়ান অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান নিষেধাজ্ঞার কারণে দুর্বল হচ্ছে এবং উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রসকসমসকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খেতে হবে। রাশিয়া শীর্ষ মহাকাশ শক্তির মর্যাদা ছাড়বে না, তবে সঙ্গেসঙ্গে এটিকে বোঝা যাচ্ছে যে তারা বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক শীর্ষ স্তরের কার্যক্রমের মধ্যে বেছে নেবে—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কম, সামরিক প্রয়োগে মনোযোগ বেশি।

উল্লেখযোগ্য যে, সহযোগিতার প্রয়োজনই রাশিয়ান এবং আমেরিকান মহাকাশ সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল, এমনকি রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র সম্পর্ক তলানিতে চলে গেলেও। দেতঁত বা উত্তেজনা প্রশমনের পথ সহজ নয়, কিন্তু এটি চোখে পড়ার মতো—প্রতি ৯০ মিনিটে সেকেন্ডে ৭.৬ কিলোমিটার গতিতে মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া আইএসএস।

অবশেষে, মহাকাশের ভূগোল পৃথিবীর ভূ-রাজনীতি থেকে মুক্ত নয়। সয়ুজ-অ্যাপোলো ডকিং এবং আইএসএস-এর দেতঁত এখন আমাদের মধ্যবর্তী মহাকাশে হারিয়ে গেছে।

CamScanner

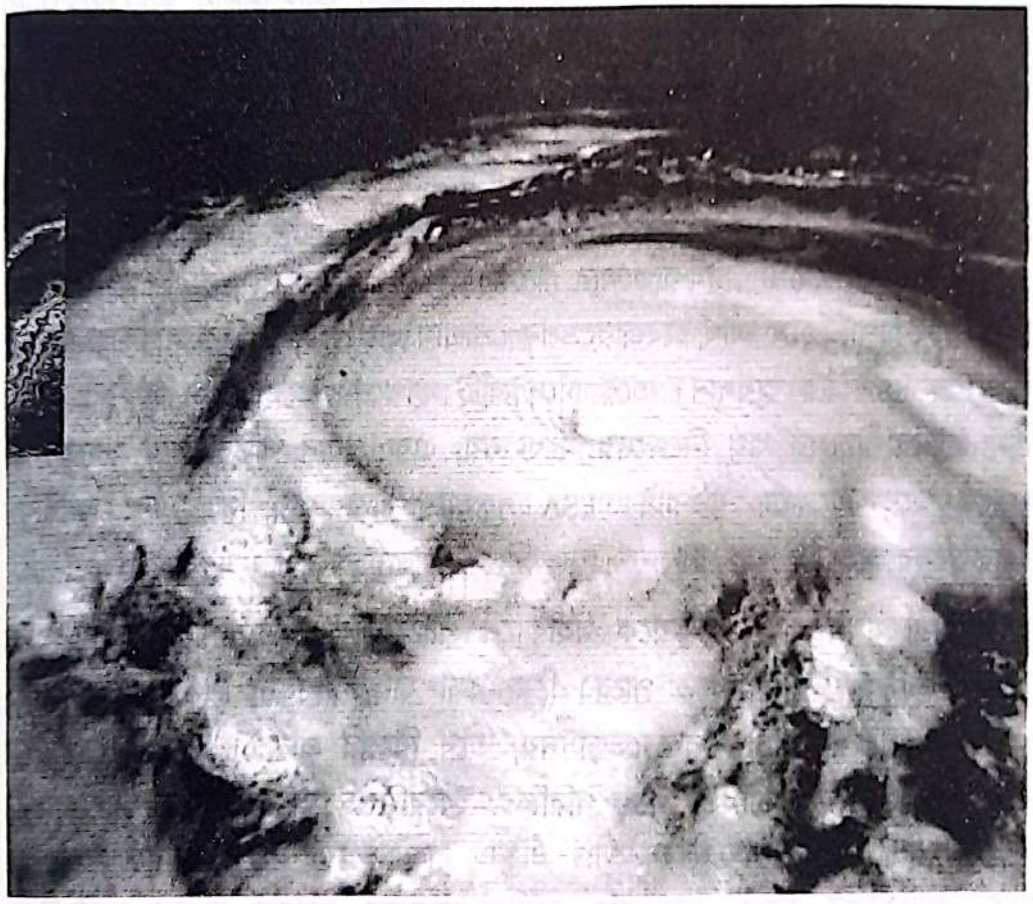
অধ্যায়-৮

অন্যান্য অংশীদার রাষ্ট্র

(FELLOW TRAVELLERS)

"পৃথিবীকে যদি ধরো একটি মহাকাশযান,
তাহলে এতে কোনো যাত্রী নেই—আমরা সবাই ক্রু।'

— মার্শাল ম্যাকলুহান, দার্শনিক



মহাকাশ থেকে নেওয়া চিত্র পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদ ধারণা দেয়, যেমন ১৯৯৪ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে হারিকেন এমিলিয়ার এই ছবি।

চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া মহাকাশ খাতে প্রধান তিনটি শক্তি হলেও, আরও অনেক দেশ তাদের অবস্থান বাড়ানোর চেষ্টা করছে। নতুন প্রযুক্তি অনেক দেশকে, এমনকি উন্নয়নশীল দেশকেও, সহজে মহাকাশে সুযোগ পেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ব্যয় এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর কারণে অধিকাংশ দেশ স্বাধীনভাবে উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম নয়। এটি মহাকাশ ব্লক তৈরির দিকে একটি প্রবণতা নির্দেশ করে।

ইউরোপীয়রা মহাকাশ প্রতিযোগিতায় শুরু থেকেই এগিয়ে আছে। ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি (ESA) ১৯৭৫ সালে দশটি দেশকে নিয়ে গঠিত হয় এবং বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয়েছে একুশে। 'আরও ঘনিষ্ঠ ইউনিয়ন' গঠনের আকাঙ্ক্ষার অংশ হিসেবে এতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) দেশগুলোর প্রভাব বেশি, তবে এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং EU-এর মহাকাশ কর্মসূচির বাইরে পরিচালিত হয়। EU ESA-এর বাজেটের প্রায় ২৫ শতাংশ প্রদান করে, কিন্তু বাকি অংশের বড়ো অংশই পৃথক সদস্য রাষ্ট্রগুলোই বহন করে।

সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের কৃতিত্বের মাধ্যমে বাণিজ্যিক মহাকাশ উদ্যোগে বিশ্ববাজারের প্রায় ২০ শতাংশ দখল করেছে—যেমন স্যাটেলাইট তৈরি ও উৎক্ষেপণ, রোবোটিক আর্ম এবং হ্যাবিটেশন বা বসবাসযোগ্য মডিউল নির্মাণ। এটি এমন একটি অর্জন, যা তুলনামূলকভাবে ESA-এর বাজেট এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেলে ছোটো হলেও তা গুরুত্বপূর্ন।

ESA-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্যালিলিও গ্লোবাল নেভিগেশন সিস্টেম, কোপার্নিকাস আর্থ অবজারভেশন প্রোগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS)-এ ESA-এর অবদান। তবে চাঁদে ঘাঁটি স্থাপনের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের জন্য ইউরোপীয়দের শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, এক প্রধান শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে—এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র। ESA দৃঢ়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এবং আর্টেমিস অ্যাকর্ডসের অংশ।

রাশিয়ানরা যখন প্রথম কুকুরকে মহাকাশে পাঠিয়েছিল, ইউরোপীয়রা তখন প্রথম ভেড়ার ভূমিকা দাবি করতে পারে। ঠিক বলা যায়, 'শন দ্য শিপ' (Shaun the Sheep)। অবশ্য এটি জীবন্ত ভেড়া নয়, তবে বিশ্বের প্রায় ১৮০ দেশে দেখা যায় এবং বিভিন্ন ভাষায় ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দে পরিচিত—ইংরেজিতে 'বা', ফরাসিতে 'বি', জাপানি ভাষায় 'মি'।

শন একটি স্টাফড টয়, যা ২০২২ সালের নভেম্বরে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে আর্টেমিস ১ ফ্লাইটে উৎক্ষেপণ করা হয়। পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে এটি

চাঁদের চারপাশে ৬৪,০০০ কিলোমিটার উড়ে যায়। এটি ওরিয়ন মহাকাশযান এবং নাসার হেভি-লিফট স্পেস লঞ্চ সিস্টেম রকেটের প্রথম সমন্বিত পরীক্ষা ছিল। ESA এই মিশনের জন্য শনকে বেছে নেয়েছিল, যিনি ওরিয়নের লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেছিলেন—যা শক্তি, পানি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং যানটিকে সঠিক পথে রাখে। ESA-এর ডেভিড পারকার মন্তব্য করেছিলেন, 'যদিও এটি একজন মানুষের জন্য ছোটো একটি পদক্ষেপ হতে পারে, তবে এটি ভেড়ার জন্য এক বিশাল লাফ।'

মিশনটি সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় যে, নন-আমেরিকান আর্টেমিস স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে তাদের একজন নভোচারীর আসন নিশ্চিত করার জন্য। তবে যেহেতু ইউরোপীয়রা নন-ইউএস অর্থের বড়ো অংশ দিচ্ছে এবং প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, ESA বিশ্বাস করে তারা 'আমাদের সৌরজগত অন্বেষণ করার জন্য ESA নভোচারীদের জন্য আসন নিশ্চিত করছে'। তবে তারা কোন নভোচারী হবেন তা স্পষ্ট করেনি। চাঁদে প্রথম ইউরোপীয় হওয়া একটি বড়ো ঘটনা হবে; প্যান-ইউরোপীয় সংহতির সীমা রয়েছে এবং প্রতিটি দেশ চাইবে তাদের নভোচারী সেই 'বিশাল লাফ' নিকটবর্তী হোক।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে, ২০২৯ সালে 'কমেট ইন্টারসেপ্টর' নামের একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা রয়েছে। এর মূল কাজ হলো নাম অনুযায়ী—ধূমকেতু আটকানো। পরিকল্পনা অনুযায়ী, যানটিকে পৃথিবী থেকে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে, সূর্য-পৃথিবী ল্যাগ্রঞ্জ পয়েন্ট ২-এ, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের পাশে পার্ক করা হবে। এটি সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, আমাদের সৌরজগতে নতুন ধূমকেতু আসার জন্য অপেক্ষা করবে এবং তারপর তাকে আটকাবে। সূর্যের চারপাশে কক্ষপথ প্রদক্ষিণকারী এই ধূমকেতু বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হবে, কারণ এতে থাকবে সৌরজগতের প্রাথমিক ও অপরিবর্তিত উপাদান। ESA-এর মাইকেল কুপার্স ব্যাখ্যা করেছেন, এটি আমাদের সাহায্য করবে 'কীভাবে সৌরজগৎ গঠিত হয়েছে এবং কিভাবে সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে তা বোঝার ক্ষেত্রে।'

তবে, বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় থাকা এবং সেরা সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও, ইউরোপ মহাকাশ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। EU প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা প্রথমবার ২০২২ সালে বৈঠক করেন; যদি এটি ২০১২-এ হতো, দেরি হতো না, কিন্তু ২০২২ সাল আসাটা একপ্রকার অসতর্কতা। একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে EU অন্যান্য প্রধান অর্থনৈতিক শক্তির মতোই মহাকাশ-ভিত্তিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, তবে সেগুলোকে রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেই। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, 'আমাদের

নিরাপদে কাজ করার ক্ষমতা নিশ্চিত করা জরুরি,' তবে অ্যান্টি-স্যাটেলাইট অস্ত্র, নির্দেশিত-শক্তি বন্দুক বা জ্যামার তৈরিতে অগ্রগতি খুব কম হয়েছে। ইউরোপীয় কমিশন মহাকাশ বর্জ্য ট্র্যাকিং এবং অতিনিরাপদ কোয়ান্টাম-এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে, কিন্তু কিভাবে এগুলো রক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে তা খুব কম বলা হয়েছে।

২০১৭ সালে যখন ফরাসিরা একটি ফ্রাঙ্কো-ইতালিয়ান সামরিক স্যাটেলাইটের কাছাকাছি রাশিয়ান স্যাটেলাইট আবিষ্কার করে, তখন তাদের প্রথম চিন্তা ছিল না, 'ব্রাসেলস এতে কী করবে?' ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লি বলেছিলেন, 'এটি খুব কাছে চলে এসেছিল।' তিনি মস্কোকে ফরাসি ও ইতালিয়ান বাহিনী দ্বারা ব্যবহৃত অত্যন্ত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি-ব্যান্ড যোগাযোগে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করার অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন ফ্রান্স 'উপযুক্ত ব্যবস্থা' নিয়েছে, যদিও বিস্তারিত প্রকাশ করেননি। EU স্পেস ফোর্সের সম্ভাবনা EU আর্মির মতোই জটিল; বরং সম্ভবত পৃথক রাষ্ট্রগুলোই তাদের নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি করবে।

তিনটি ইউরোপীয় দেশ ইতোমধ্যেই তাদের নিজস্ব স্পেস কমান্ড এবং নীতি নিয়ে এগিয়ে গেছে—ইতালি, জার্মানি এবং ফ্রান্স। এই তিনটি দেশই ইউরোপের প্রধান মহাকাশ শক্তি। যদিও তারা EU-এর মহাকাশ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে, তবুও তারা অন্তহীন কমিশন নীতিমালার অপেক্ষায় নেই। উদাহরণস্বরূপ, EU প্রায়শই প্রস্তাব করে যে 'একটি সামিট আয়োজনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ওয়ার্কিং পার্টি গঠন করা হতে পারে, যাতে দেখা যায় কোন সদস্য রাষ্ট্র একটি EU স্পেসপ্লেনকে সমর্থন করবে কি না, যা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে উৎক্ষেপণ করা হবে'। এই ধরনের জটিল প্রক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, তিন দেশই সক্রিয়ভাবে নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে।

ইউরোপীয়রা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন চাইছে—এমন নীতি যা জাতি রাষ্ট্র এবং EU স্তরে কয়েক দশক ধরে রূপ নিচ্ছে। ১৯৬০-এর দশকে মূল ভূখণ্ডের ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলো বা তো আমেরিকার একচেটিয়া আধিপত্যের ওপর নির্ভর করতে পারত, বা তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারত।

ইতালির ক্ষেত্রে এটি প্রথমভাবে দৃশ্যমান হয়। ১৯৬৪ সালে তারা সান মার্কো ১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে, যদিও এটি একটি আমেরিকান রকেট ব্যবহার করে। এর ফলে ইতালি ইউএসএসআর, ইউএসএ, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের পরে কক্ষপথে একটি যন্ত্র পাঠানো পঞ্চম দেশ হয়ে ওঠে। ইতালি পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক মহাকাশ

স্টেশন (ISS)-এর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং সামান্থা ক্রিস্টোফোরেত্তি সহ বেশ কয়েকজন নভোচারী পাঠায়, যিনি কমান্ড করার প্রথম ইউরোপীয় নারী হন।

ইতালির বিশাল প্রতিরক্ষা সংস্থা লিওনার্দো ফরাসি সংস্থা থ্যালেস গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে থ্যালেস আলেনিয়া স্পেস গঠন করেছে, যা মহাদেশীয় ইউরোপের বৃহত্তম স্যাটেলাইট প্রস্তুতকারক। বর্তমানে থ্যালেস স্পেস কার্গো আনলিমিটেডের সঙ্গে কাজ করছে, যা লুক্সেমবার্গ ভিত্তিক এবং প্রথম ভাসমান মহাকাশ কারখানা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই কারখানায় বায়োটেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যালস, কৃষি এবং নতুন উপকরণ সম্পর্কিত পণ্য তৈরি করা হবে। দেশটি তার দক্ষতা বজায় রাখতে সরকারি অর্থায়নও করছে; ২০২১-২০২৭ সময়কালীন বাজেটে ইতালিয় সরকার প্রায় ৫ বিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ করেছে, যার মধ্যে ৯০ মিলিয়ন ইউরো স্টার্ট-আপগুলোর সহায়তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরবর্তী দেশটি ছিল ফ্রান্স, যারা নিজেদের রকেটে স্যাটেলাইট ডিজাইন, তৈরি এবং উৎক্ষেপণ করার ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি প্রেসিডেন্ট চার্লস ডি গল আমেরিকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যাতে ফ্রান্সকে মার্কিন পারমাণবিক ছাতার নিরাপত্তার নিচে রাখা হয়। ফরাসি ভূখণ্ডে আমেরিকান মিসাইল অবস্থানের ধারণাটি ডি গলের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতার কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল।

১৯৬৪ সালে ফ্রান্স নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র কার্যকর করে এবং পরের বছর তাদের প্রথম সামরিক যোগাযোগ স্যাটেলাইট গ্যালিক উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল 'লেজামেরিকাঁ' অর্থাৎ আমেরিকানদের প্রভাব থেকে দূরে থাকার একটি নিদর্শন। এই সময়ে ডি গলের 'ফোর্স ডি ফ্রাপ' বা স্ট্রাইক ফোর্সের হাতে ব্যালিস্টিক মিসাইলও ছিল, যা পারমাণবিক বোমা এবং স্যাটেলাইট উভয়ই বহন করতে সক্ষম। এ-১ (আর্মি-১) স্যাটেলাইটটি দ্রুত অ্যাস্টেরিক্স ১ নামে পরিচিত হয়, যা জনপ্রিয় ফরাসি কমিক স্ট্রিপ চরিত্র, গল বংশীয় অ্যাস্টেরিক্সের নাম অনুসারে রাখা হয়—যিনি সফলভাবে বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিলেন।

ফরাসি ব্যতিক্রমবাদের প্রতিফলন আবার ১৯৮০-এর দশকে দেখা যায়। ১৯৭৮ সালে কর্নেল গাদ্দাফির লিবিয়া উত্তর চাদ আক্রমণ করেছিল। ১৯৮৩ সালে ওয়াশিংটন প্যারিসকে চাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য চাপ দেয় এবং ফরাসি সামরিক বাহিনীকে এমন মানের স্যাটেলাইট ছবি সরবরাহ করে যা ফ্রান্সের নিজের কাছে ছিল না। ফরাসিদের সন্দেহ ছিল যে ছবিগুলোর মধ্যে কিছু পুরনো এবং তাদের স্বার্থে

ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মতপার্থক্য ফরাসি নেতৃত্বকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে তারা আমেরিকান নজরদারির ওপর নির্ভর করতে চায় না।

সেই সময় ফরাসি জেটগুলোকে দশ ঘণ্টার মিশন উড়তে হতো এমন ছবি পেতে, যা আমেরিকানরা কয়েক সেকেন্ডেই তুলতে পারত। ফলস্বরূপ, ১৯৮৬ সালে ফ্রান্স স্পট ১ (SPOT 1) উৎক্ষেপণ করে—একটি বাণিজ্যিক ইমেজিং স্যাটেলাইট যা ২০-মিটার নির্ভুলতার সাথে উচ্চমানের রঙিন ছবি তুলতে সক্ষম। এটি চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার ঠিক সময়ে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, যা ফ্রান্সকে ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের তুলনায় আরও ভালো দৃশ্য এবং situational awareness দেয়।

১৯৯৫ সালে হেলিওস (Hélios) সামরিক স্যাটেলাইট কর্মসূচি শুরু হয়, যা স্পেন এবং ইতালির সহযোগিতায় তৈরি করা হয়। এটি কালো-সাদা ছবির ক্ষেত্রে ১-মিটার রেজোলিউশনে সক্ষম ছিল। ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করে, যা ফ্রান্সকে ইরাকে সরাসরি আক্রমণে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

পরবর্তীতে হেলিওস স্যাটেলাইটটি দ্বৈত-ব্যবহারের প্লেইয়াডেস (Pléiades) সিস্টেম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা এয়ারবাস পরিচালিত। এটি বাণিজ্যিক গ্রাহকদের পাশাপাশি ফরাসি ও ইতালীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে তথ্য প্রদান করে, যেখানে প্রতিদিনের ছবির একটি নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষিত থাকে। এই সিস্টেমটি কাজে এসেছে ২০১৩ সালে, যখন ফ্রান্স মালিতে বিদ্রোহী বাহিনীর অগ্রগতি থামাতে রাজধানী বামাকোর দিকে হস্তক্ষেপ করেছিল।

ফ্রান্স বাণিজ্যিক এবং সামরিক উভয় ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিশ্ব মহাকাশ শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে। ২০১৯ সালে তারা তার সামরিক মহাকাশ কৌশল প্রকাশ করে, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল : 'ফ্রান্স মহাকাশ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে না'। এটি কিছুটা স্ববিরোধী শোনালেও, ন্যানোস্যাটেলাইটের ব্যবহার করে বড়ো স্যাটেলাইট পাহারা দেওয়া, প্রতিপক্ষকে অন্ধ করার জন্য গ্রাউন্ড-ভিত্তিক লেজার সিস্টেম এবং, কিছুটা আশ্চর্যজনকভাবে, স্যাটেলাইটে মেশিনগান বসানোর মত প্রস্তাবনার মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে প্যারিস সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা সরাসরি লো আর্থ অরবিটে অ্যান্টি-স্যাটেলাইট মিসাইল তৈরি করবে না, কারণ এতে মহাকাশ বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন পরিস্থিতি তৈরি হবে।

ফরাসিরা ২০১৯ সালে টুলুজের কাছে তাদের স্পেস কমান্ড স্থাপন করে—যেখানে এয়ারবাস এবং থ্যালেসের মতো বড়ো কোম্পানিগুলোর সদর দপ্তর রয়েছে। এই

CamScanner

কমান্ডের কাজ হলো ফরাসি স্যাটেলাইট পাহারা দেওয়া এবং দেশটির মহাকাশ সক্ষমতার বিরুদ্ধে কোনো আগ্রাসন প্রতিরোধ করা।

তবে একপাক্ষিকতা সীমিত। বিশেষ করে আমরা যখন ধীরে ধীরে একটি দ্বি-মেরু বিশ্বের দিকে এগোচ্ছি—যেখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের আধিপত্য রয়েছে, রাশিয়াকে জুনিয়র পার্টনার হিসেবে ধরা হয়েছে। তাই ফ্রান্সের 'একা চলো' নীতি একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স কম্বাইন্ড স্পেস অপারেশনস উদ্যোগে যোগ দেয়, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং কানাডার ফাইভ আইজ গোয়েন্দা-তথ্য সংগ্রহকারী গ্রুপের অংশ। পাশাপাশি এটি ESA-এর সঙ্গে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়াচ্ছে।

মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে প্রথম দেশ হওয়া সত্ত্বেও (ওয়ার্নহার ভন ব্রাউনের ভি-২), শিল্পে জার্মানির অবদান প্রায় নজরের আড়ালে থাকে। তবু, জার্মানির মহাকাশ খাত ইউরোপে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং এটি ESA-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম অবদানকারী। ESA-এর ইউরোপীয় স্পেস অপারেশনস সেন্টার ডার্মস্টাডে, ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে অবস্থিত, যেখান থেকে চালকবিহীন মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ এবং মহাকাশ বর্জ্য ট্র্যাক করা হয়।

মিউনিখে অবস্থিত কলম্বাস কন্ট্রোল সেন্টার আইএসএস-এর গবেষণা ল্যাবরেটরি কলম্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। কোলোনে রয়েছে ইউরোপীয় অ্যাস্ট্রোনট সেন্টার, যেখানে নভোচারীরা তাদের মিশনের জন্য প্রশিক্ষণ পান। এছাড়াও জার্মান অ্যারোস্পেস সেন্টারের সদর দপ্তরও এখানে, যা ESA-এর মার্স এক্সপ্রেস মিশনের জন্য হাই-রেজোলিউশন স্টেরিও ক্যামেরা তৈরি করেছে, যা লাল গ্রহে পানির চিহ্ন এবং জীবনের সম্ভাব্য উপাদান খুঁজে বের করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

জার্মানি পৃথিবী পর্যবেক্ষণে বিশ্বনেতা এবং দুটি অত্যাধুনিক রাডার স্যাটেলাইট—টেরাসার-এক্স (TerraSAR-X) এবং ট্যানডেম-এক্স (TanDEM-X)—উৎপাদন করেছে। এই স্যাটেলাইটগুলো গ্রহের অত্যন্ত নির্ভুল থ্রিডি ছবি প্রদান করতে সক্ষম।

২০২১ সালে জার্মান সামরিক বাহিনী ঘোষণা করে যে তারা একটি নতুন স্পেস ইউনিট গঠন করছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ওয়েলট্রাউমকমান্দো ডার বুন্দেসওয়ের' (Weltraumkommando der Bundeswehr)। নামটি যতটা আকর্ষণীয়, এর ইংরেজি অনুবাদ ততটাই নিরামিষ—আর্মড ফোর্সেস স্পেস কমান্ড। এই ইউনিটের মূল জোর মহাকাশকে একটি রক্ষণাত্মক ডোমেইন হিসেবে দেখা, যেখানে স্পেস সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস বা মহাকাশ পরিস্থিতিগত সচেতনতা এবং জার্মান সামরিক

ও বেসামরিক স্যাটেলাইটের সুরক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ডাচ সীমান্তের কাছে উয়েডেমে ঘাঁটির উদ্বোধনের সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যানগ্রেট ক্রাম্প-কারেনবাউয়ার উল্লেখ করেন, জার্মানি এই স্যাটেলাইটগুলোর ওপর কতটা নির্ভরশীল—'যেগুলো ছাড়া কার্যত কিছুই কাজ করে না'।

যুক্তরাজ্য, ইউরোপের আরেকটি প্রধান মহাকাশ শক্তি, ব্রেক্সিটের পরেও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির সদস্য হিসেবে রয়ে গেছে, যদিও এখন তারা 'থার্ড কান্ট্রি' বা তৃতীয় দেশের মর্যাদায়। এর ফলে যুক্তরাজ্যের গ্যালিলিও এবং এনগোস (ENGOS) স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ শেষ হয়ে যায় এবং প্রতিরক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামোর জন্য ব্যবহৃত গ্যালিলিওর এনক্রিপ্টেড পরিষেবাগুলো থেকেও তারা বাদ পড়ে। ২০২২ সালে, যখন ব্রিটিশ কোম্পানি ইনমারস্যাট একটি সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে শুরু করে, তখন পরিষেবাগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ এড়াতে ইএসএ এবং ইইউ এজেন্সি ফর দ্য স্পেস প্রোগ্রাম উভয়ই সহযোগিতা করে। ইইউ ও যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ রাজনৈতিকভাবে তিক্ত হলেও, মহাকাশ খাতে জড়িত অনেকেই এই বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং একটি নতুন সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার আগ্রহ এখনো রয়ে গেছে।

যুক্তরাজ্যের মহাকাশ ইতিহাস ফ্রান্সের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। শীতল যুদ্ধের শুরুর দিকে তাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট ও রকেট তৈরির সক্ষমতা ছিল না এবং আজও সামরিক স্যাটেলাইট চিত্রের জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। এর বিনিময়ে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (NSA)-কে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। তবুও, ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরে যুক্তরাজ্যই ছিল তৃতীয় দেশ, যাদের একটি নিরাপদ সামরিক যোগাযোগ স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর যুক্তরাজ্য এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, যেখানে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা তাদের সামরিক ঘাঁটি ও গোয়েন্দা কেন্দ্রগুলো একে অপরের সঙ্গে নির্ভরযোগ্যভাবে যোগাযোগ করতে পারছিল না। এই সমস্যার সমাধান আসে স্কাইনেট ১এ (Skynet 1A) স্যাটেলাইটের মাধ্যমে, যা ১৯৬৯ সালে কেপ কেনেডি থেকে একটি আমেরিকান রকেটে উৎক্ষেপণ করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে আরও স্যাটেলাইট যোগ হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো নিরাপদ সামরিক যোগাযোগের আওতায় আসে। যুক্তরাজ্য সাম্রাজ্য থেকে সরে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু বিশ্বব্যাপী সামরিক উপস্থিতির জন্য একটি শক্ত যোগাযোগ কাঠামো ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

CamScanner

স্যাটেলাইটগুলো জিওস্টেশনারি কক্ষপথে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যাতে বিদেশে যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ সামরিক ও গোয়েন্দা সম্পদ এর আওতায় থাকে। কিছু ফাঁক অবশ্য ছিল, তবে এমন কোনো অঞ্চলে নয় যেখানে ব্রিটিশরা যুদ্ধ করার সম্ভাবনা দেখেছিল। সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন শত্রু সেই 'ভুল' জায়গায় উপস্থিত হয়—দক্ষিণ আটলান্টিকে। ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করলে দেখা যায়, অঞ্চলটি স্কাইনেটের কভারেজের বাইরে। ফলে রয়্যাল নেভির টাস্ক ফোর্স সেখানে পৌঁছানোর পর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে নিরাপদ যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে মিত্র থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসএএস দলগুলো বহনযোগ্য নিরাপদ আমেরিকান ডেল্টা ফোর্স টার্মিনাল ব্যবহার করে এবং আমেরিকান ডিফেন্স স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে বার্তা লন্ডনে পাঠানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এই সহায়তা ছাড়া ফকল্যান্ড যুদ্ধের ফল ভিন্ন হতে পারত। এই অভিজ্ঞতাই যুক্তরাজ্যকে স্কাইনেট ব্যবস্থার পরবর্তী প্রজন্মে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করে। পরবর্তী সময়ে বলকান, ইরাক ও আফগানিস্তানে পরিচালিত অভিযানে স্কাইনেট ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে স্বাধীনভাবে যোগাযোগের সক্ষমতা দেয়। বর্তমানে স্কাইনেট ৬এ এয়ারবাস দ্বারা নির্মাণাধীন, যার উৎক্ষেপণ ২০২৫ সালে নির্ধারিত এবং যা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন লেজার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নকশা করা হয়েছে।

স্কাইনেট ৬এ যুক্তরাজ্যের স্পেস কমান্ডের অধীনে থাকবে। এই কমান্ডটি ২০২১ সালে গঠিত হয় এবং দক্ষিণ ইংল্যান্ডের আরএএফ হাই উইকোম্বে অবস্থিত। ইউকে আর্মড ফোর্সেসের এই নতুন শাখাটি গড়ে ওঠে প্রায় নীরবেই, জনসাধারণের খুব একটা নজরে না পড়ে। তবুও এটি স্পষ্ট করে যে, কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও যুদ্ধের মহাকাশগত দিক উপেক্ষা করার পর, ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা অভিজাতরা এখন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে শুরু করেছে। সরকার প্রকাশ্যে জানিয়েছে, তারা এই ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যকে একটি 'অর্থপূর্ণ অভিনেতা' হিসেবে দেখতে চায়।

স্পেস কমান্ডের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের দায়িত্ব হলো 'মহাকাশে যুক্তরাজ্য ও তার মিত্রদের স্বার্থ রক্ষা ও সুরক্ষা করা এবং যুক্তরাজ্যের সব প্রতিরক্ষা মহাকাশ সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা'। তারা আক্রমণাত্মক ভূমিকা বা অ্যান্টি-স্যাটেলাইট সক্ষমতা নিয়ে কিছুই স্পষ্ট করে বলেনি। কমান্ডের প্রধান এয়ার ভাইস-মার্শাল পল গডফ্রে বলেন, 'শেষ পর্যন্ত আমরা মহাকাশে কাজ করছি প্রতিরক্ষার জন্য। আমাদের লক্ষ্যগুলোর একটি হলো মহাকাশে এবং মহাকাশের মাধ্যমে আমাদের সম্পদগুলোকে রক্ষা করা... আপনি

যেমন পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো বোঝাপড়া ছাড়া একটি বিমানবাহী রণতরী সমুদ্রে ভাসিয়ে রাখবেন না।'

এ কারণে তারা সামরিক অভিযানের জন্য স্যাটেলাইট যোগাযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে—বিশেষ করে এসএএস এবং এসবিএস-এর মতো যুক্তরাজ্যের বিশেষ বাহিনীর ক্ষেত্রে। এসব বাহিনী উপকৃত হতে পারে এটি জেনে যে কখন প্রতিপক্ষ তাদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে এবং কখন ইউকে স্পেস কমান্ড তাদের দেখতে ও সহায়তা দিতে সক্ষম।

কিছু আধুনিক স্যাটেলাইট এত উন্নত যে তারা মেঘের আড়াল এবং রাতের অন্ধকারেও দেখতে সক্ষম, যা আগে কৌশলগত আড়াল প্রদান করত। ইউকে স্পেস কমান্ডের প্রধান এয়ার ভাইস-মার্শাল পল গডফ্রে ব্যাখ্যা করেন, "আমরা তাদের সক্ষমতা বাড়াতে পারি যদি আমাদের অন্যান্য পরিষেবার সহকর্মীরা জানেন কখন তারা আপোষহীন অবস্থায় পড়তে পারে। আজকাল স্যাটেলাইটগুলো এত উন্নত যে রাত বা খারাপ আবহাওয়া তাদের কার্যক্ষমতাকে বাধা দিতে পারে না, তাই তাদের ব্যবহার হয় ভিন্নভাবে।"

যুক্তরাজ্য ইউরোপের মাত্র দুটি গুরুতর সামরিক শক্তির মধ্যে একটি (ফ্রান্সের পাশাপাশি) হলেও, মহাকাশের ক্ষেত্রে এটি চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে আছে। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে এবং একবিংশ শতাব্দীর ক্ষমতা, রাজনীতি ও যুদ্ধের সঙ্গে মহাকাশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হয়নি। একজন ইউকে গোয়েন্দা সূত্র মন্তব্য করেছেন, "প্রযুক্তির দিক থেকে আমরা অত্যাধুনিক এবং লো আর্থ অরবিটে মনোনিবেশ করছি, সেখানেই বিনিয়োগ হচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা বড়ো দেশগুলোর সঙ্গে নেই।"

ব্যবধান কমাতে, বিএই সিস্টেমস (BAE Systems) কক্ষপথে একগুচ্ছ স্যাটেলাইট তৈরি ও উৎক্ষেপণ করছে। এই স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের উচ্চ-নির্ভুল ভিজ্যুয়াল ছবি, রাডার এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম, এমনকি রাত ও খারাপ আবহাওয়াতেও। স্যাটেলাইটগুলো 'আজালিয়া' (Azalea) নামে পরিচিত। তাদের সেন্সর মহাকাশে পুনঃকনফিগার করা যায় এবং স্যাটেলাইটের মেশিন লার্নিং সরঞ্জাম ডেটা বিশ্লেষণ করে আগ্রহের কার্যক্রম চিহ্নিত করে, তারপর নিরাপদ চ্যানেলের মাধ্যমে মূলত সামরিক গ্রাহকদের কাছে পাঠানো হয়।

কর্নওয়ালে নতুন একটি স্পেসপোর্টও নির্মিত হয়েছে, যা যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় দীর্ঘতম রানওয়ের সুবিধা গ্রহণ করে ইউরোপীয় মাটিতে প্রথম বিমান-চালিত রকেট উৎক্ষেপণের অনুমতি দেবে। এটি যুক্তরাজ্যের মহাকাশ সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ইএসএ-র ভেতরে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানির উপস্থিতি মহাকাশের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সত্তা তৈরি করেছে। এটি ছিল প্রথম বড়ো আন্তর্জাতিক মহাকাশ জোট বা 'স্পেস ব্লক'। দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক জোট হলো এশিয়া-প্যাসিফিক স্পেস কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (APSCO), যা ২০০৮ সালে চীন, বাংলাদেশ, ইরান, মঙ্গোলিয়া, পাকিস্তান, পেরু, থাইল্যান্ড এবং তুরস্ক দ্বারা গঠিত হয়। APSCO-এর সদর দপ্তর বেইজিংয়ে এবং এটি ইএসএ-র আদলে একটি স্থায়ী কাউন্সিল ও সচিবালয় নিয়ে পরিচালিত হয়।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা এই অঞ্চলে, স্যাটেলাইট নির্মাণ এবং তথ্য ভাগ করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তবে মূল সিদ্ধান্ত নেয় চীন। APSCO-এর প্রধান লক্ষ্য মনে হচ্ছে, এটি আমেরিকার জিপিএসকে প্রধান পজিশনিং টুল হিসেবে ছাড়িয়ে চীনের বেইদু নেভিগেশন সিস্টেমের ব্যবহার বিস্তৃত করার একটি পদক্ষেপ।

চীনের বিপুল শক্তি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বহু মহাকাশ উন্নয়ন ও সহযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এই অঞ্চলের বিভাজনগুলো আরও স্পষ্ট হয় আরেকটি জোটের অস্তিত্বের মাধ্যমে—এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল স্পেস এজেন্সি ফোরাম। এটি চীনা নেতৃত্বাধীন এশিয়া-প্যাসিফিক স্পেস কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (APSCO)-এর আগেই, জাপানের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল, তবে এটি তুলনামূলকভাবে অনেক কম আনুষ্ঠানিক। নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি একটি 'ফোরাম', কোনো পূর্ণাঙ্গ 'সংগঠন' নয়—মূলত আলোচনা ও মতবিনিময়ের একটি মঞ্চ। এই আলোচনাগুলো সাধারণত এমন দেশগুলোর মধ্যে হয় যারা চীনের প্রতি কম বন্ধুভাবাপন্ন, যেমন জাপান ও ভিয়েতনাম।

ইইউ-এর মতোই, জাপান নিজেকে একটি 'বেসামরিক মহাকাশ শক্তি' হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে পূর্ব এশিয়ায় উত্তেজনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক মহাকাশ সক্ষমতায় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। তবুও এই ক্ষেত্রে জাপানের পদক্ষেপগুলো সতর্ক এবং কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, যা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তার নির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত—বিশেষ করে সামরিক-মানের স্যাটেলাইট গোয়েন্দা তথ্যের ক্ষেত্রে।

সালের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো দলই প্রস্তুত হতে পারেনি এবং পুরস্কারটি শেষ পর্যন্ত কেউ দাবি করতে পারেনি।

দশকের পর দশক প্রায় শান্তিবাদী অবস্থানে থাকার পর জাপান ধীরে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পুনরায় অস্ত্রসজ্জার পথে এগোচ্ছে। এর প্রচলিত সামরিক বাহিনী এখন আক্রমণাত্মক সক্ষমতায় সজ্জিত হলেও, মহাকাশের ক্ষেত্রে টোকিও এখনো মূলত রক্ষণাত্মক অবস্থান বজায় রেখেছে। প্রযুক্তিতে বিশ্বনেতা এবং শক্তিশালী শিল্পভিত্তি থাকার কারণে মহাকাশ-নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর জাপানের নির্ভরতা খুবই বেশি। ফলে স্যাটেলাইট অচল হয়ে পড়লে দেশটির অর্থনীতি গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এ কারণেই জাপান মহাকাশ বর্জ্য শনাক্ত ও অপসারণ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে। এই ট্র্যাকিংয়ের কিছু দায়িত্ব পড়ে স্পেস অপারেশনস স্কোয়াড্রন (SOS)-এর ওপর, যা এয়ার সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সের অধীনে কাজ করে। ইউনিটটি সম্ভাব্য শত্রু বিদেশি স্যাটেলাইটও নজরদারি করে, তবে টোকিও চীন, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যদের মতো আক্রমণাত্মক মহাকাশ অস্ত্র তৈরির পথে হাঁটবে—এমন সম্ভাবনা কম।

একই কথা অনেকটা প্রযোজ্য জাপানের দক্ষিণ কোরীয় প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও, যদিও দেশটির প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা তাকে ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ শক্তিতে পরিণত করতে পারে। সিউল ২০২২ সালের শেষের দিকে চাঁদের চারপাশে একটি লুনার অরবিটার পাঠিয়ে তার আগমন ঘোষণা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ। তবে যানটি কেপ ক্যানাভেরাল থেকে একটি স্পেসএক্স রকেটে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল—যা এখনো দক্ষিণ কোরিয়ার সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্ট করে।

উত্তর কোরিয়ার অবশ্য নিজস্ব উৎক্ষেপণ সক্ষমতা রয়েছে, সাধারণত ইয়েলো সি বা পীত সাগরের উপকূলে অবস্থিত সোহে স্যাটেলাইট লঞ্চিং স্টেশন থেকে। তবে এর সাফল্য সীমিত। ২০১২ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তারা পাঁচবার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের চেষ্টা করে, যার মধ্যে মাত্র দুবার সফল হয়েছিল এবং সেই স্যাটেলাইটগুলো কার্যকরভাবে কাজ করেছে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে পিয়ংইয়ং দাবি করে যে তারা সফলভাবে একটি স্যাটেলাইট কক্ষপথে স্থাপন করেছে এবং প্রমাণ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের ছবি প্রকাশ করে।

এই সক্ষমতা উত্তর কোরিয়াকে নজরদারি গোয়েন্দা তথ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে চীনের ওপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে কিছুটা মুক্তি দিতে পারে। তবে দাবি সত্য হলেও, দেশটির স্যাটেলাইট কভারেজ খুবই সীমিত। পিয়ংইয়ংয়ের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো এবং

যুক্তরাষ্ট্র সন্দেহ করে যে উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কর্মসূচি আসলে পারমাণবিক বা পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনে সক্ষম আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষার সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত। উত্তর কোরিয়া সত্যিই এমন সক্ষমতা অর্জন করেছে কি না তা স্পষ্ট নয়, তবে তারা এখন পর্যন্ত যা উৎক্ষেপণ করেছে, তা বিবেচনায় নিলে ধারণা করা যায়—সরাসরি আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে অন্য দেশের স্যাটেলাইট ধ্বংস করার ক্ষমতা তাদের থাকতে পারে।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের আরেকটি প্রধান খেলোয়াড়, ভারত, বেসামরিক প্রকল্পে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে, কিন্তু তার মহাকাশ কর্মসূচি মূলত তার মহান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের চেয়ে সামরিকভাবে পিছিয়ে না পড়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত। ভারতের প্রধান নিরাপত্তা উদ্বেগগুলো ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে, যেখানে চীন এখন স্থায়ীভাবে যুদ্ধজাহাজ রাখে এবং হিমালয়ে চীনের সাথে যৌথ সীমান্ত, যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সশস্ত্র সংঘর্ষ দেখা গেছে।

ভারতীয় মহাকাশ শক্তির গতিবেগ আছে কিন্তু এটি ২০৪০ সালের আগে একটি প্রধান সামরিক খেলোয়াড় হওয়ার জন্য খুব ধীরে বাড়ছে। ২০১৯ সালে নয়া দিল্লি ডিফেন্স স্পেস এজেন্সি স্থাপন করে কিন্তু চিফস অফ স্টাফ যা চেয়েছিলেন—একটি পূর্ণাঙ্গ স্পেস কমান্ড—তা প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত থাকে। ভারতের একটি সামরিক স্যাটেলাইট সিস্টেম এবং একটি আঞ্চলিক বেসামরিক স্যাটেলাইট ফুটপ্রিন্ট বা পদচিহ্ন রয়েছে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌম গ্লোবাল নেভিগেশন সিস্টেম তৈরির জন্য বেইজিংয়ের ব্যয় ক্ষমতার সাথে পাল্লা দিতে পারে না।

এছাড়াও ২০১৯ সালে, ভারত সফলভাবে একটি অ্যান্টি-স্যাটেলাইট অস্ত্র পরীক্ষা করে। চীনের ২০০৭ সালের পরীক্ষা নয়া দিল্লিকে ভবিষ্যতের মহাকাশ প্রতিরক্ষার দিক এবং তারা কতটা পিছিয়ে ছিল তা দেখিয়েছিল। ধারাবাহিক সরকারগুলো বাইরের মহাকাশের বৈশ্বিক শাসন শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছিল যাতে এর সামরিকায়ন রোধ করা যায়, কিন্তু ২০১৯ সালের মধ্যে ভারত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে চীন এবং অন্যান্য শক্তি এগিয়ে যাওয়ার সময় তারা পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এটি একটি বড়ো সিদ্ধান্ত ছিল। নয়া দিল্লি দীর্ঘদিন ধরে মহাকাশ সামরিকায়নের জন্য অন্যদের সমালোচনা করেছে। পরীক্ষাটি এটিকে মহাকাশ সামরিক মানচিত্রে স্থান দিয়েছে। এটি 'কোয়াড' সিকিউরিটি ডায়ালগ (জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র)-এ তার অংশীদারদের সাথে মহাকাশ নীতিতে সহযোগিতার জলও পরীক্ষা করছে—বিশ্বের জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের একসময়ের এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত নেতার জন্য

CamScanner

এটি বেশ বড়ো একটি পদক্ষেপ। প্রায়শই যেমন হয়, আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি চালক। নয়া দিল্লি জানে যে মহাকাশ সামরিক কার্যকলাপে চীনের দক্ষতা চীনের মিত্র—এবং ভারতের চিরশত্রু—পাকিস্তানের জন্য অনুকূল প্রভাব ফেলবে।

ভারত মহাকাশের বেসামরিক দিক নিয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ২০০৮ সালে এর চন্দ্রযান-১ লুনার অরবিটার চাঁদে পানির সম্ভাবনা আবিষ্কার করে, যার মধ্যে চাঁদের মেরুতে বড়ো জলীয় বরফের আমানত অন্তর্ভুক্ত। এটি বর্তমান বৈশ্বিক আগ্রহে মুনবেস তৈরির কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারত নিজস্ব মুনবেস বা স্পেস স্টেশন তৈরি করতে পারে না, তবে এটি এখনো আর্টেমিস কর্মসূচিতে স্বাক্ষর করেনি। তবে, এর বাণিজ্যিক মহাকাশ শিল্প বাড়ছে এবং ডিফেন্স স্পেস এজেন্সি ইতোমধ্যেই চেন্নাইয়ের কাছে পূর্ব উপকূলে তার প্রধান উৎক্ষেপণ সাইট থেকে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, সুইজারল্যান্ড, লাটভিয়া এবং মেক্সিকো সহ ডজনখানেক দেশের জন্য স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ক্ষমতা প্রদান করেছে।

অস্ট্রেলিয়া ভারতের একটি কোয়াড অংশীদার এবং এর সামরিক চিন্তাভাবনার অনেকাংশ চীনকে নিয়ে। তবে, ভারতের মতো নয়, এর কাছে থাকা কয়েকটি স্যাটেলাইটের যেকোনোটির ওপর সম্ভাব্য চীনা কাইনেটিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার কিছুই নেই। এটি একটি বিশাল দেশ হতে পারে, কিন্তু মহাকাশ সক্ষমতার দিক থেকে এটি বর্তমানে ছোটো। এটি এখন পরিবর্তন হতে যাচ্ছে—অস্ট্রেলিয়া ২০৩০ সালের মধ্যে একটি মধ্যম-সারির মহাকাশ শক্তি হওয়ার ইচ্ছা রাখে, যা বর্তমান মধ্যম-সারির স্থল ও নৌ শক্তি হিসেবে তার মর্যাদার সাথে মানানসই।

দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান এমন এক বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যারা গোয়েন্দা-তথ্য সংগ্রহ এবং মহাকাশ-ট্র্যাকিং স্টেশনগুলোর জন্য নিরাপদ জায়গা খুঁজছিল : যুক্তরাষ্ট্র। অস্ট্রেলিয়ার ঘাঁটিগুলো প্রত্যন্ত স্থানে অবস্থিত হতে পারে, যা তাদের নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে এবং এর মানে প্রায় কোনো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি হস্তক্ষেপ নেই। তারা মহাকাশের এমন অংশ দেখতে পারে যা উত্তর গোলার্ধ থেকে দেখা যায় না এবং চীনের মহাকাশ-উৎক্ষেপণ গতিপথ এবং জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথ পর্যবেক্ষণের জন্য ভালো অবস্থানে রয়েছে। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যা সারা দেশে এমন বেশ কয়েকটি ঘাঁটি স্থাপন করে। কিছু আমেরিকান মহাকাশ মিশনের রকেট ট্র্যাক করতে ব্যবহার করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১৯৬৯ সালের চাঁদে অবতরণ অন্তর্ভুক্ত। সবচেয়ে পরিচিত হলো পাইন গ্যাপ (Pine Gap) সুবিধা, যা যদি নর্দার্ন টেরিটরির অ্যালিস স্প্রিংসের তুলনামূলক কাছে না হতো তবে এটিকে জনমানবহীন স্থানের মাঝখানে বলে বর্ণনা করা হতো।

তর্কের খাতিরে বলা যায়, পাইন গ্যাপ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমেরিকান গোয়েন্দা-তথ্য সংগ্রহকারী সুবিধা এবং দুই দেশকে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্কে আবদ্ধ করার অন্যতম শক্তিশালী বন্ধন। অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বর্ধিত পারমাণবিক ছাতার নিচে রয়েছে এবং এর কার্যকারিতায় অবদান রাখা প্রয়োজন। ঘাঁটিটি ১৯৭০ সালে খোলা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৮ সালে জয়েন্ট ডিফেন্স ফেসিলিটি পাইন গ্যাপ নামকরণ করা হয়। 'জয়েন্ট' শব্দটি এটি কীভাবে পরিচালিত হয় তার পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পদ দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ডেপুটি চিফ অফ ফেসিলিটি অন্তর্ভুক্ত এবং এটি একটি মন্ত্র হয়ে ওঠে যে পাইন গ্যাপের সমস্ত কার্যকলাপ 'অস্ট্রেলিয়ান সরকারের সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সম্মতিতে ঘটে'।

২০১৩ সালে তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্টিফেন স্মিথ, পার্লামেন্টে এক ভাষণে এটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, সাথে এটাও বলেছিলেন যে জোটটি এখন 'সাইবার, স্যাটেলাইট যোগাযোগ এবং মহাকাশের আধুনিক ক্ষেত্রগুলোতে সহযোগিতা' প্রসারিত করছে। পাইন গ্যাপের সুবিধাগুলোর মধ্যে একটি রিলে আমেরিকার স্পেস-বেসড ইনফ্রারেড সিস্টেম (SBIS)-এর গ্রাউন্ড স্টেশন, যা ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণের আগাম সতর্কতা দেয়। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে বেশি পারমাণবিক-সশস্ত্র দেশ রয়েছে—চীন, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র—এবং তাই এসবিআইএস-এ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাক্সেস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সম্পদ।

২০২২ সালে ক্যানবেরা রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ার ফোর্সের মধ্যে তার ডিফেন্স স্পেস কমান্ড স্থাপন করে। এটি একটি চিহ্ন ছিল যে সরকার ভূ-রাজনীতির এই নতুন ডোমেইনকে স্বীকৃতি দেয় এবং এখানে একটি স্তরের সার্বভৌম স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন। এটি একই বছর প্রকাশিত একটি নথিতে প্রতিফলিত হয়েছিল, যেখানে 'আপোষহীন হলে পুনর্গঠন করা যেতে পারে এবং আক্রমণের শিকার হলে রক্ষা করা যেতে পারে' এমন সক্ষমতা তৈরির কথা বলা হয়েছিল। এটি ছিল বিপুল সংখ্যক ছোটো স্যাটেলাইট তৈরির রেফারেন্স যা কক্ষপথে ধ্বংস হলে দ্রুত প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। কতগুলো সামরিক স্যাটেলাইট হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি, তবে সম্ভবত কিছু অন্তত 'দ্বৈত ব্যবহারের' হবে। স্পেস কমান্ডের প্রধান, এয়ার ভাইস-মার্শাল ক্যাথরিন রবার্টস, স্বীকার করেন যে অস্ট্রেলিয়া 'অনেক পিছিয়ে' এবং 'হুমকিগুলো মোকাবিলার জন্য সক্ষমতা ত্বরান্বিত করা' প্রয়োজন।

CamScanner

স্পেস কমান্ড তৈরির প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় যখন অস্ট্রেলিয়া ২০২১ সালে অকুস (AUKUS - Aus/UK/US) প্রতিরক্ষা জোটে স্বাক্ষর করে। অকুস অস্ট্রেলিয়ার জন্য পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন সরবরাহের চুক্তির ওপর কেন্দ্র করে, কিন্তু এর মধ্যে এই বোঝাপড়া রয়েছে যে তিনজনকে মহাকাশে সহযোগিতা করতে হবে। আমেরিকানদের স্পেস ফোর্স ছিল, ব্রিটিশদের স্পেস কমান্ড ছিল এবং তাই চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক মাসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্স স্পেস কমান্ড স্থাপন করা হয়েছিল।

বাণিজ্যিকভাবে, অস্ট্রেলিয়া খেলায় দেরিতে এসেছে—এর বেসামরিক স্পেস এজেন্সি মাত্র ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছোটো কিন্তু ফোকাসড এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দেশীয় বাণিজ্যিক শিল্পকে ১০,০০০ চাকরি এবং ৩.৯ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্য থেকে ৩০,০০০ চাকরি এবং ১২ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্যে উন্নীত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এটি একটি সাহসী লক্ষ্য, কিন্তু অন্তত তারা শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব উল্লেখযোগ্য স্যাটেলাইট সিস্টেমের অভাব মানে এটি বর্তমানে আবহাওয়া পূর্বাভাসের জন্য এবং আগ্নেয়গিরি থেকে দাবানল পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় পর্যবেক্ষণের জন্য অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল। এটি জাপান, চীন, ইএসএ এবং যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। এটি সংশোধনের একটি দশ বছরের পরিকল্পনায় দেখা উচিত একটি অস্ট্রেলিয়ান আবহাওয়া, যোগাযোগ এবং সেনাবাহিনীর জন্য নিবেদিত স্যাটেলাইটের কনস্টেলেশন।

মহাকাশের ক্ষেত্রে, ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক অঞ্চলের রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে প্রতিফলিত করে। চীন আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এবং জাপানি প্রভাব ক্ষুণ্ন করতে এশিয়া-প্যাসিফিক স্পেস কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন গঠন করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেনে এনে এবং জড়িত থাকার খরচের কিছু অংশ বহন করে তারা এই নীতিতে কিছু সাফল্য পেয়েছে। জাপান এবং ভারত মহাকাশে তাদের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং একে অপরের ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে সহযোগিতা বাড়িয়ে এর জবাব দিয়েছে। চীন সবচেয়ে বড়ো খেলোয়াড় কিন্তু বন্ধু কম, এমনকি অ্যাপসকো সদস্যদের মধ্যেও, যেখানে এলাকার প্রায় অন্য সব দেশের একটি বিষয়ে মিল রয়েছে—চীনের ওজনে পিষ্ট হওয়ার উদ্বেগ।

এই বিভাজনের অর্থ হলো পুরো অঞ্চলের একক সংগঠনে একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সুখের বিষয়, এটি এখনো বৈজ্ঞানিক এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলোতে প্রচুর সহযোগিতার সুযোগ রেখে দেয়, কিন্তু সামরিকভাবে ভবিষ্যৎ ব্লক-ভিত্তিক মনে হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে বেশ কয়েকটি উদীয়মান মহাকাশ শক্তি রয়েছে এবং ভবিষ্যতের জোটগুলো এখনো ঠিক করা বাকি।

ইসরায়েল, পৃথিবীর অন্যতম ছোটো দেশ, ১৯৮৩ সালের আগেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি স্পেস এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ছয় বছরের মধ্যে তার প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল। আগের দশকে, দেশটি স্তম্ভিত হয়েছিল যখন তার সামরিক সতর্কতা ব্যবস্থা ইয়োম কিপুর যুদ্ধে মিশরীয় এবং সিরিয়ান বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে তাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট নজরদারি ক্ষমতা প্রয়োজন।

এটি স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে শূন্য থেকে শুরু করেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সহযোগিতায় ১৯৬০-এর দশকে ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরি করে রকেট্রি সম্পর্কে তার জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়েছিল। ১৯৮০-এর দশকে তার জেরিকো-২ রকেটগুলো, যা পারমাণবিক অস্ত্র বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, শ্যাভিট (Shavit) স্পেস-লঞ্চ ভেহিকল হওয়ার জন্য অভিযোজিত করা হয়েছিল। ইসরায়েলের এখন নজরদারি এবং যোগাযোগ স্যাটেলাইটের একটি কনস্টেলেশন রয়েছে।

বেশিরভাগ দেশই পূর্বমুখীভাবে মহাকাশ রকেট উৎক্ষেপণ করে। এর কারণ হলো, পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণনের ফলে রকেট স্বাভাবিকভাবেই একটি অতিরিক্ত গতি বা ধাক্কা পায়, যা উৎক্ষেপণকে আরও কার্যকর করে তোলে। কিন্তু ইসরায়েলের শ্যাভিট রকেট ঠিক তার বিপরীত পথে—অর্থাৎ পশ্চিমমুখীভাবে—উৎক্ষেপণ করা হয়, যা পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকের বিরুদ্ধে যায়। এ ধরনের উৎক্ষেপণকে বলা হয় 'রেট্রোগ্রেড' বা পশ্চাৎমুখী উৎক্ষেপণ।

এই বিশেষ কৌশলটি নেওয়া হয় মূলত নিরাপত্তার কারণে। রেট্রোগ্রেড উৎক্ষেপণের ফলে রকেটটি ইসরায়েল ও তার প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর ওপর দিয়ে না গিয়ে সরাসরি ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। যেহেতু এই প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি ইসরায়েলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, তাই জনবসতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কোনো ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইসরায়েল চায় না যে তার কোনো আরব প্রতিবেশী মহাকাশ উৎক্ষেপণকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হিসেবে ভুল ব্যাখ্যা করুক।

শ্যাভিট রকেটের গতিপথ শুরু থেকেই ভূমধ্যসাগরের দিকে সোজা ওপরে উঠে যায়। এরপর এটি জিব্রাল্টার প্রণালীর সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে আরও উচ্চতায় পৌঁছে যায়। তবে

পশ্চিমমুখী উৎক্ষেপণের একটি বড়ো অসুবিধা হলো—এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সহায়তা না পাওয়ায় বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে অতিরিক্ত জ্বালানি লাগে। এর ফলে রকেট যে পরিমাণ ওজন বহন করতে পারে, তা প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়।

যদিও এটি একটি স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা, ইসরায়েল এই অসুবিধাকে আংশিকভাবে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। যেমনভাবে দেশটির নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জগুলো তার মহাকাশ সক্ষমতার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি রেট্রোগ্রেড উৎক্ষেপণের বাধ্যবাধকতাই প্রযুক্তির ক্ষুদ্রায়ন এবং হালকা স্যাটেলাইট তৈরিতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এসব ছোটো ও হালকা স্যাটেলাইট এখনো উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি সরবরাহ করতে পারে এবং নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। তাছাড়া স্যাটেলাইট যত ছোটো হয়, একটি রকেটে তত বেশি সংখ্যক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়, ফলে পুরো উদ্যোগটি আরও সাশ্রয়ী ও কার্যকর হয়ে ওঠে।

ইসরায়েল ইতোমধ্যেই ফরমেশন-ফ্লাইং ন্যানোস্যাটেলাইট তৈরি করেছে এবং বর্তমানে আল্ট্রাস্যাট (ULTRASAT) নামে একটি ইসরায়েলি মহাকাশ টেলিস্কোপ প্রকল্পে কাজ করছে, যা ২০২৬ সালে কক্ষপথে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে। দেশটির ন্যাশনাল নলেজ সেন্টার অন নিয়ার আর্থ অবজেক্টস-এর লক্ষ্য হলো পৃথিবীর জন্য সম্ভাব্য হুমকিস্বরূপ মহাজাগতিক বস্তুগুলোর মানচিত্র তৈরি করা এবং সেগুলোর মোকাবিলার উপায় উদ্ভাবন করা। একই সঙ্গে, মাউন্ট হারমন এলাকায় অবস্থিত ইসরায়েল কসমিক রে সেন্টার সৌর ঝড়সহ অন্যান্য বিপজ্জনক মহাকাশীয় ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

ইসরায়েলের চাঁদে ফেরার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও রয়েছে—হ্যাঁ, ফেরা। কারণ ব্যক্তিমালিকানাধীন ও ব্যক্তিগত অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান স্পেসআইএল (SpaceIL) ২০১৯ সালে বেরেশিট (Beresheet) মহাকাশযানটি চাঁদের উদ্দেশে পাঠিয়েছিল। তবে সি অব সেরেনিটি বা প্রশান্তির সাগরের ওপর ধীরগতিতে নামার সময় একটি হার্ডওয়্যার ত্রুটির কারণে যানটি ক্র্যাশ-ল্যান্ড করে এবং শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়। মহাকাশযানটি এখনো সেখানেই রয়ে গেছে এবং এর ভেতরে সংরক্ষিত আছে হিব্রু বাইবেলের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, যার প্রথম শব্দ ছিল "বেরেশিট"—অর্থাৎ 'শুরুতে' বা 'জেনেসিস'।

কিন্তু সেটিই ছিল কেবল শুরু। ওই দুর্ঘটনার এক বছরের মধ্যেই, ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) আব্রাহাম অ্যাকর্ডস স্বাক্ষরের মাধ্যমে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলে। যেহেতু উভয় দেশই মহাকাশ প্রযুক্তিতে বিশ্বনেতৃস্থানীয়, তাই ২০২২ সালে ঘোষণা দেওয়া হয় যে বেরেশিট ২ মিশনটি হবে একটি যৌথ প্রকল্প, যেখানে নেতৃত্ব দেবে স্পেসআইএল।

২০২৫ সালে উৎক্ষেপণের লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনাটি ছিল বেশ উচ্চাভিলাষী। একটি মাদারশিপ প্রথমে চাঁদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করবে, এরপর দুটি আলাদা মুনার ল্যান্ডার ছেড়ে দেবে—একটি চাঁদের পৃথিবীমুখী পৃষ্ঠে এবং অন্যটি উলটো পিঠে, এমন এক অঞ্চলে যেখানে এখন পর্যন্ত কেবল চীনই পৌঁছাতে পেরেছে। এই মিশন সফল হলে এটি হবে ইতিহাসের প্রথম দ্বৈত চন্দ্র অবতরণ এবং দুটি ল্যান্ডারই হবে চাঁদে অবতরণ করা সবচেয়ে ছোটো যান, প্রতিটির ওজন জ্বালানিসহ মাত্র ১২০ কিলোগ্রাম। এরপর মাদারশিপটি আরও পাঁচ বছর ধরে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরে বিভিন্ন তথ্য পৃথিবীতে পাঠাবে—যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, মরুকরণ এবং পানিসম্পদ সম্পর্কিত ডেটা থাকবে, যা ইসরায়েল ও ইউএই—উভয় দেশের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৯ সালে বেরেশিট ১-এর গায়ে লাগানো একটি ফলকে লেখা ছিল, "ছোটো জাতি, বড়ো স্বপ্ন।" এই উক্তিটি ইউএই-এর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য, কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহাকাশ কর্মসূচি এখন তাদেরই।

আকারে ছোটো হলেও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এই আরব রাষ্ট্রটি ২০০৯ সালে কাজাখস্তান থেকে তার প্রথম পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। তবে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তাদের নিজস্ব কোনো স্পেস এজেন্সি ছিল না। এরপর দ্রুত অগ্রগতির ধারাবাহিকতায়, ২০২১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ইউএই-এর হোপ (Hope) মহাকাশযান মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে তার বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণা শুরু করে। এর মাধ্যমে ইউএই যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ESA) এবং ভারতের পর ইতিহাসের পঞ্চম সত্তা হিসেবে লাল গ্রহে পৌঁছায়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পরে চীন ষষ্ঠ দেশ হিসেবে তার তিয়ানওয়েন-১ মহাকাশযান পাঠাতে সক্ষম হয়।

তবে ইউএই স্পেস এজেন্সির চেয়ারপারসন সারাহ আল আমিরি এই সাফল্যে থেমে থাকতে চান না। তার নেতৃত্বাধীন দল এখন এমন একটি মিশনের ওপর কাজ করছে, যেখানে একটি মহাকাশযান প্রায় ৩.৬ বিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে প্রথমে শুক্র গ্রহের পাশ দিয়ে যাবে এবং পরে একটি গ্রহাণুতে অবতরণ করবে। এই মিশনের উৎক্ষেপণ লক্ষ্য ধরা হয়েছে ২০২৮ সাল এবং গ্রহাণুতে অবতরণ করার কথা রয়েছে ২০৩৩ সালে।

ইউএই-এর স্পেস এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত দেশটির অর্থনীতিকে তেল ও গ্যাস আয়ের ওপর নির্ভরতা থেকে সরিয়ে বহুমুখীকরণের বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। এটি আমিরাতকে উন্নত প্রযুক্তির একটি বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্তমানে দেশটি নিজস্ব স্যাটেলাইট তৈরি করতে

CamScanner

সক্ষম এবং 'সিরব' (Sirb) নামে একটি ক্ষুদ্র স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন গড়ে তুলছে—আরবি ভাষায় যার অর্থ 'পাখির ঝাঁক'।

ইসরায়েলের মতো ইউএই-ও আর্টেমিস অ্যাকর্ডসের স্বাক্ষরকারী দেশ। যদিও এই চুক্তি অন্য পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা নিষিদ্ধ করে না, তবু ইউএই তাদের মহাকাশ শিল্পে চীনের উপস্থিতি নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে কিছুটা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়েই দেশের ভেতরে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে এবং হুউএই-এর ৫জি নেটওয়ার্ক নির্মাণ করেছে। যদিও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে এই ব্যবস্থায় কোনো 'ব্যাকডোর' নেই, যার মাধ্যমে সংবেদনশীল নিরাপত্তা তথ্য চুরি করা সম্ভব, তবুও এতে দেশটির পশ্চিমা মিত্রদের উদ্বেগ পুরোপুরি দূর হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটেই ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ দেখিয়ে ইউএই-এর কাছে পঞ্চাশটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির চুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করে। যদিও এসব ফাইটার জেটে সরাসরি হুয়াওয়েই প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা ছিল না, তবু সংশ্লিষ্ট গ্রাউন্ড স্টেশন ও যোগাযোগ টাওয়ারগুলো মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা দিতে পারত। ২০২৩ সালের শুরুর দিকেও এই ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছিল।

ইউএই ২০২৬ সালে চীনের একটি চন্দ্র অভিযানে তাদের রশিদ ২ রোভার পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল, যা সম্ভবত আর্টেমিস ৩-এর মানববাহী মিশনের প্রস্তাবিত অবতরণস্থলের কাছাকাছি কাজ করত। তবে ২০২৩ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি রপ্তানি বিধিনিষেধের কারণে এই পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে যায়, কারণ রশিদ ২-এ ব্যবহৃত কিছু উপাদান আমেরিকায় তৈরি।

মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর অঞ্চলে নিজস্ব উৎক্ষেপণ সক্ষমতা থাকা আরেকটি দেশ হলো ইরান। ১৯৯৯ সালে তেহরান স্যাটেলাইট তৈরি এবং সেগুলোকে কক্ষপথে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় রকেট উন্নয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবে এই রকেট কর্মসূচির একটি বড়ো অংশই দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির আড়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইরানের স্পেস এজেন্সি যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও, যেসব প্রতিষ্ঠান মহাকাশ রকেট তৈরি করে, সেগুলো একই সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্রও উৎপাদন করে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। দেশটির সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC), আবার সম্পূর্ণ আলাদা একটি মহাকাশ কর্মসূচি পরিচালনা করে, যা সরাসরি সর্বোচ্চ নেতার

কাছে জবাবদিহি করে—প্রেসিডেন্টের কাছে নয়। ২০২০ সালে তারা একটি স্পষ্টভাবে সামরিক উদ্দেশ্যের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে, যা ইরানের হাতে থাকা স্বল্পসংখ্যক দেশীয় স্যাটেলাইটের তালিকায় যুক্ত হয়। ২০২২ সালে এর পরেই আরেকটি নজরদারি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়।

সব মিলিয়ে ইরান স্যাটেলাইট তৈরি করতে পারে, উৎক্ষেপণ করতে পারে এবং পরিচালনাও করতে পারে—কিন্তু এখনো এসব কাজে তারা খুব দক্ষ নয়। তাদের রকেট উৎক্ষেপণ প্রায়ই ব্যর্থ হয়, আর স্যাটেলাইটগুলো সাধারণত নিম্নমানের, স্বল্পস্থায়ী এবং লো আর্থ অরবিটেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবুও ইরানি বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে শিখছেন এবং অগ্রগতি অর্জন করছেন। যদিও ২০২৫ সালের মধ্যে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবতার তুলনায় কিছুটা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ইরান ২০১৮ সালকে লক্ষ্য তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছিল। সে সময়ের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ নাটকীয় ভঙ্গিতে নিজেকে প্রথম ইরানি নভোচারী হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন এবং বলেছিলেন, দেশের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। তার জন্য সৌভাগ্যজনকভাবেই সেই প্রকল্প কখনো বাস্তবে উড়তে পারেনি। এখন, ২০২৫ সালের সময়সীমা ঘনিয়ে আসায়, ২০৩২ সালকে অনেকেই তুলনামূলকভাবে বেশি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য হিসেবে দেখছেন।

২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ক্ষমতায় আসার পর তার প্রশাসন ইরানের মহাকাশ কর্মসূচির তৎকালীন অবস্থাকে 'দুঃখজনক' বলে আখ্যা দেয় এবং এটিকে পুনরুজ্জীবিত করার অঙ্গীকার করে। এর অংশ হিসেবে স্পেস এজেন্সির প্রধানকে বরখাস্ত করা হয় এবং ঘোষণা দেওয়া হয় যে পাঁচ বছরের মধ্যে জিওস্টেশনারি কক্ষপথে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট পাঠানো হবে। একই সঙ্গে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান মহাকাশ শক্তিতে পরিণত করাই সরকারের লক্ষ্য। এই উদ্যোগের আওতায় লো আর্থ অরবিটে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং চাবাহার বন্দরনগরীতে একটি নতুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় চাবাহার বিষুবরেখার তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি, ফলে সেখান থেকে উৎক্ষেপিত রকেটগুলো পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে সহজেই অগ্রসর হতে পারে।

একই সঙ্গে ইরান ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো সম্ভাব্য প্রতিপক্ষদের মহাকাশ সক্ষমতা সীমিত করার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে তারা তাদের কোনো মধ্যম-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে স্যাটেলাইট-বিধ্বংসী অস্ত্রে রূপান্তর করার চেষ্টা

যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার ওপরে এবং সেকেন্ডে ৭.৮ কিলোমিটার গতিতে চলমান কোনো বস্তুকে আঘাত করার জন্য যে মাত্রার নির্ভুলতা দরকার, তা বর্তমানে ইরানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অনেক বাইরে।

এর তুলনায় স্যাটেলাইট জ্যামিং ও স্পুফিং অনেক সস্তা এবং তুলনামূলকভাবে সহজ পদ্ধতি, আর এ ক্ষেত্রে তেহরানের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে সারা ইরানে সম্প্রচারিত ডজনখানেক ফার্সি-ভাষার টেলিভিশন ও রেডিও সম্প্রচার জ্যাম করে আসছে। দেশের ভেতরে তারযুক্ত ইন্টারনেট পরিষেবাগুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ফলে তথ্য পাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ সাধারণ ইরানি স্যাটেলাইট-ভিত্তিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। এর অর্থ হলো, দেশের বাইরে থেকে আসা এসব সিগন্যাল শনাক্ত ও ব্লক করার জন্য সরকারকে সার্বক্ষণিক লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

অন্যান্য অনেক দেশের মতোই ইরান মহাকাশকে বেসামরিক ও সামরিক—উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে এবং অধিকাংশ দেশের মতোই সামরিক দিকগুলোকে প্রকাশ্যে না এনে আড়ালে রাখে। পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগের কারণে (যা ইরান অস্বীকার করে), অনেক উন্নত দেশ তার মহাকাশ কর্মসূচি সম্পর্কে সন্দিহান এবং তা ব্যাহত করার চেষ্টা করে থাকে। তবে প্রযুক্তিগতভাবে তুলনামূলকভাবে কম সক্ষম বহু দেশ তেহরানের এই যুক্তির সঙ্গে একমত যে মহাকাশ কেবল প্রথমে সেখানে পৌঁছানো কয়েকটি শক্তিধর দেশের একচেটিয়া ক্লাব হতে পারে না। বরং বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক এবং—হ্যাঁ—এমনকি সামরিক অগ্রগতির জন্যও মহাকাশ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আফ্রিকান দেশগুলোর অনেকেই একমত। মহাদেশটির বেশ কয়েকটি দেশের নিজস্ব জাতীয় মহাকাশ সংস্থা রয়েছে—এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, বতসোয়ানা এবং রুয়ান্ডা উল্লেখযোগ্য। যদিও খুব কম আফ্রিকান দেশেরই নিকট ভবিষ্যতে গভীর মহাকাশ অন্বেষণে অংশ নেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, তবুও তারা মনে করে মহাকাশ কার্যক্রমকে ঘিরে যেকোনো আইনি কাঠামো অবশ্যই বৈশ্বিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে। বেশিরভাগ আফ্রিকান দেশই চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার মহাকাশ প্রতিযোগিতায় স্পষ্ট কোনো পক্ষ নেয়নি; বরং যে দেশ একজোট তাদের নিজস্ব মহাকাশ শিল্প বিকাশে সবচেয়ে অনুকূল শর্ত দেবে, তার সঙ্গেই তারা কাজ করতে আগ্রহী।

উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়ার প্রথম দুটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল চীন। আবার ২০২২ সালে নাইজেরিয়া রুয়ান্ডার সঙ্গে মিলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন

আর্টেমিস অ্যাকর্ডসে স্বাক্ষর করে। সামগ্রিকভাবে আফ্রিকান দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে রাশিয়া; এরপরের অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও জাপান।

আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU) মহাদেশজুড়ে একটি সমন্বিত মহাকাশ কৌশল গড়ে তোলাকে তার এজেন্ডা ২০৬৩-এর অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই এজেন্ডার লক্ষ্য হলো ১.২ বিলিয়ন—এবং দ্রুত বাড়তে থাকা—আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করার একটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো তৈরি করা। AU স্বীকার করে যে আফ্রিকা চিরকাল মহাকাশ প্রযুক্তির নিট আমদানিকারক হয়ে থাকতে পারে না এবং তাই মহাকাশভিত্তিক স্টার্টআপ কোম্পানিগুলোর দ্রুত বিকাশমান শিল্পকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। তবে ২০১৭ সালে একটি আফ্রিকান স্পেস এজেন্সি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়া এবং এর সদর দপ্তর হিসেবে মিশরকে বেছে নেওয়া সত্ত্বেও, বাস্তবে এ বিষয়ে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। এর পরিবর্তে, পৃথক দেশগুলো নিজ নিজ উদ্যোগে এগিয়ে যাচ্ছে।

যদিও আফ্রিকার বহু দেশের নিজস্ব জাতীয় মহাকাশ সংস্থা রয়েছে, পুরো মহাদেশে বর্তমানে একটিও সক্রিয় উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নেই। বর্ণবাদী শাসনামলের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা একটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র ছিল এবং কেপ টাউনের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ডেনেল ওভারবার্গ টেস্ট রেঞ্জ থেকে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের সক্ষমতা অর্জন করেছিল। এখান থেকেই ইসরায়েলের জেরিকো-২ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন পরিচালিত হয়েছিল, পাশাপাশি ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে তিনটি দক্ষিণ আফ্রিকান রকেট সাব-অরবিটাল পথে উৎক্ষেপণ করা হয়।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ১৯৮৯ সালে, যখন এফ. ডব্লিউ. ডি ক্লার্ক বর্ণবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ক্ষমতায় আসেন এবং দেশের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা পারমাণবিক অস্ত্র অপ্রসারণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং এর অংশ হিসেবে ওভারবার্গে অবস্থিত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ প্যাডটি ভেঙে ফেলা হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোনো আফ্রিকান দেশের নিজস্ব উৎক্ষেপণ সক্ষমতা আর নেই।

তা অবশ্য পরিবর্তিত হতে পারে। ২০২৩ সালের শুরুর দিকে জিবুতি চীনের হংকং অ্যারোস্পেস টেকনোলজি গ্রুপ (HKATG)-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশটিতে একটি স্পেসপোর্ট নির্মাণ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, হর্ন অব আফ্রিকার এই ছোটো দেশটি ন্যূনতম ১০ বর্গকিলোমিটার জমি এবং ৩৫ বছরের

জন্য লিজ প্রদান করবে; লিজের মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ অবকাঠামো জিবুতি সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পে বন্দর সুবিধা ও সড়ক নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে চীনের মহাকাশ সরঞ্জাম সহজে সাইটে পরিবহণ করা যায়। প্রস্তাবিত নকশায় সাতটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্যাড এবং তিনটি রকেট পরীক্ষার প্যাড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যদি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়, তবে চীন আফ্রিকায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানে স্পেসপোর্ট পাবে। জিবুতি বিষুবরেখার কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় সেখান থেকে উৎক্ষেপণ তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়সাপেক্ষ। একই সঙ্গে এটি একটি চীনা নৌঘাঁটিরও আবাসস্থল, যা চীনকে লোহিত সাগরে প্রবেশাধিকার দেয়—ঠিক সেই গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ পথের কাছে, যেখানে সাগরটি এডেন উপসাগরে প্রবেশের আগে সরু হয়ে যায়। কৌশলগতভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একটি মহাকাশ সুবিধা যুক্ত হওয়া বেইজিংকে এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ও লিভারেজ প্রদান করবে। অন্যদিকে জিবুতি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে, একটি উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পাবে এবং কয়েক দশক পরে একটি পূর্ণাঙ্গ স্পেসপোর্টের মালিক হবে।

নিকট ভবিষ্যতে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বহু আফ্রিকান দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ আফ্রিকান অর্থনীতি কৃষিনির্ভর, ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি এগুলো বিশেষভাবে সংবেদনশীল। ১৯৯৮ সালে মহাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট কক্ষপথে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত চল্লিশটিরও বেশি আফ্রিকান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং এই হার ক্রমেই বাড়ছে। প্রথম স্যাটেলাইটটি ছিল মিশরের নীলস্যাট-১০১, যার লক্ষ্য ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ ঘরে মাল্টিমিডিয়া পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে অবশ্য অধিকাংশ স্যাটেলাইটই পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য নকশা করা হয়।

এই স্যাটেলাইটগুলোর ডেটা বনভূমি ও হ্রদের আকারে পরিবর্তন শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত সংকটের আগাম সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে। একই সঙ্গে এগুলো খাদ্য উৎপাদন বাড়াতেও সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, ঘানা বিশ্ববিদ্যালয় রেইনফরেস্ট অ্যালায়েন্সসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে SAT4Farming প্রকল্পে অংশ নিয়েছে। এই প্রকল্প হাজার হাজার দেশের হাজার হাজার কোকো চাষিকে তাদের ব্যক্তিগত জমির প্লট-সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে, যাতে তারা ফলন ও আয় উভয়ই বাড়াতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকা নিজস্বভাবে স্যাটেলাইট তৈরি করে এবং ২০২২ সালে কেপ টাউনে নকশা ও নির্মিত তিনটি ন্যানোস্যাটেলাইট কক্ষপথে পাঠাতে স্পেসএক্সের সহায়তা

নিয়েছিল। প্রতিটি স্যাটেলাইটের আকার ছিল মাত্র ২০ সেন্টিমিটার × ১০ সেন্টিমিটার × ১০ সেন্টিমিটার। এগুলো দক্ষিণ আফ্রিকার মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারনেস স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনের অংশ, যার কাজ হলো দেশের উপকূলবর্তী জলসীমায় চলাচলকারী জাহাজ শনাক্ত ও চিহ্নিত করা। দক্ষিণ আফ্রিকার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ) উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দীর্ঘ উপকূলরেখার কারণে এই অঞ্চলটির আয়তন দেশের স্থলভাগের চেয়েও বড়ো। ন্যানোস্যাটেলাইটগুলোর কারণে দেশটি এখন আগের দশকের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভুলভাবে এই বিশাল জলসীমা নজরদারি করতে পারছে।

নাইজেরিয়ারও নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে, যা দেশটির উত্তরাঞ্চলে বোকো হারাম বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে সরকারকে সহায়তা করেছে। তবে কভারেজের সীমাবদ্ধতা ২০২১ সালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আবারও একদল স্কুলছাত্রী গণহারে অপহৃত হয়। সে সময় ন্যাশনাল স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির প্রধান স্বীকার করেন যে সংস্থাটি অপহরণকারীদের গতিবিধি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তাদের উচ্চ-রেজোলিউশন ইমেজিং স্যাটেলাইটটি "যেখানে বিদ্রোহ হচ্ছিল, সেখানে স্থিরভাবে অবস্থান করছিল না।" আরও বেশি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা গেলে কভারেজ বাড়বে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর ক্ষেত্রে নাইজেরিয়ার দীর্ঘ ঐতিহ্যকে আরও কার্যকরভাবে সমর্থন করা সম্ভব হবে।

আফ্রিকায় মহাকাশ কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো জ্যোতির্বিদ্যা। তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার রাতের আকাশ বিদেশি কোম্পানিগুলোর বড়ো বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদদের আগ্রহ আকর্ষণ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, মিশর, নাইজেরিয়া, নামিবিয়া, মরিশাস ও ঘানা—সবকটি দেশেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির রয়েছে। পাশাপাশি উৎসাহী অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য অ্যাস্ট্রো-ট্যুরিজমও একটি দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পে পরিণত হয়েছে।

বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা ভিজ্যুয়াল এবং রেডিও—উভয় ধরনের জ্যোতির্বিদ্যার জন্যই অত্যন্ত অনুকূল অবস্থানে রয়েছে। এখানে রয়েছে বিস্তীর্ণ জনবসতিহীন এলাকা, 'শান্ত' রেডিও জোন, পরিষ্কার আকাশ এবং মিল্কি ওয়ে সরাসরি দেখার সুযোগ। এই অনন্য পরিবেশের কারণেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রেডিও টেলিস্কোপ দক্ষিণ আফ্রিকার নর্দার্ন কেপ প্রদেশে স্থাপন করা হয়েছে। মিরক্যাট (MeerKAT) টেলিস্কোপটি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অর্থায়ন করেছে এবং প্রায় দশ বছরে ৩৩০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এটি ৬৪টি ডিশ নিয়ে গঠিত, প্রতিটি প্রায় ২০ মিটার উঁচু।

CamScanner

২০১৮ সালে চালু হওয়ার পর থেকেই মিরক্যাট একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এমন একটি বিশাল গ্যালাক্সির আবিষ্কার, যা মিল্কি ওয়ের চেয়ে প্রায় বাইশ গুণ বড়ো হলেও এতদিন ধূলিকণার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মিরক্যাটকে স্কয়ার কিলোমিটার অ্যারে (SKA) প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই প্রকল্পটি দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াজুড়ে বিস্তৃত প্রায় ২০০টি সংযুক্ত ডিশ এবং ১,৩১,০০০ অ্যান্টেনার একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, যা ভারত, চীন, ইতালি ও পর্তুগালসহ ডজনখানেক দেশের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০৩০ সালের দিকে সম্পূর্ণ হলে এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক কাঠামো। যদিও ডিশ ও অ্যান্টেনাগুলো ১৫০ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকবে, তবুও সবগুলো একত্র করলে এগুলো প্রায় ১ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকবে—এ কারণেই এর নাম।

এসকেএ (SKA) এমন মহাজাগতিক ধূলিমেঘের মধ্য দিয়েও দেখতে সক্ষম হবে, যা সাধারণ অপটিক্যাল স্পেস টেলিস্কোপের দৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করে। বিজ্ঞানীদের আশা, এটি আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিদ্যমান জ্ঞানকে আমূল বদলে দেবে। এমনকি দাবি করা হয়, এটি এতটাই সংবেদনশীল যে ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরের কোনো গ্রহে যদি একটি বিমানবন্দর থেকে রাডার সিগন্যাল পাঠানো হয়, সেটিও শনাক্ত করতে পারবে—অবশ্যই যদি এমন কিছু বাস্তবে থাকে। এই প্রকল্পটি দেখায়, কীভাবে দেশ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা সবার জন্যই উপকারী হতে পারে। স্পেস এজের শুরু থেকে আমরা এমন সহযোগিতার বহু উদাহরণ দেখেছি এবং আজকের বিভক্ত বিশ্বেও বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে এমন প্রচেষ্টা চলমান। তবে কঠোর ভূরাজনীতির ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আমাদের আবারও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়।

ওপরে উল্লেখিত কোনো দেশই—এমনকি ব্রাজিল, তুরস্ক বা ইন্দোনেশিয়ার মতো অন্যান্য সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়রাও—এই মুহূর্তে তিনটি প্রধান মহাকাশ শক্তির মর্যাদাকে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ জানানোর অবস্থানে নেই। অন্যদিকে, আঞ্চলিক সহযোগিতার কিছু কাঠামো গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে সাত সদস্যবিশিষ্ট ল্যাটিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্পেস এজেন্সি, যা ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আফ্রিকান স্পেস এজেন্সির মতোই উন্নয়নমূলক লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে। এছাড়া রয়েছে আরব স্পেস কোঅপারেশন গ্রুপ, যা ২০১৯ সালে গঠিত হলেও এখন পর্যন্ত খুব সীমিত কার্যক্রমই পরিচালনা করেছে। এর এগারোটি সদস্য দেশ প্রতিবছর বৈঠকে মিলিত হয়, কিন্তু বাস্তবে মহাকাশসংক্রান্ত অধিকাংশ উদ্যোগ এখনো জাতীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ।

এই ধরনের আঞ্চলিক স্পেস ব্লকগুলোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একই সঙ্গে নিজস্ব, সার্বভৌম স্যাটেলাইট সক্ষমতা গড়ে তোলা অধিকাংশ দেশের জন্যই যুক্তিসংগত একটি পথ। তবে আফ্রিকান ইউনিয়ন স্পেস এজেন্সির অগ্রগতির ধীরগতি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়—যদি কোনো ব্লক জড়তা বা অকার্যকারিতায় ভুগতে শুরু করে, তবে তার পরিণতি কতটা হতাশাজনক হতে পারে।

ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি (ESA) ছাড়া, ভূ-রাজনীতি ও মহাকাশ রাজনীতির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে দুটি জোট বা ব্লক সত্যিকারের গুরুত্ব বহন করে, সেগুলো হলো মার্কিন নেতৃত্বাধীন আর্টেমিস অ্যাকর্ডস এবং চীন-রাশিয়া যৌথভাবে প্রস্তাবিত লুনার এগ্রিমেন্ট। এই তিনটি কাঠামোই মহাকাশে আচরণের নিয়মকানুন ও আন্তর্জাতিক আইনের নতুন মানদণ্ড বা নর্মস গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির অবস্থান চীন-রাশিয়ার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি।

এই প্রেক্ষাপটে অন্য দেশগুলোর জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। তাদের শুধু এটিই ভাবতে হচ্ছে না যে তারা কোনো নির্দিষ্ট মহাকাশ ইস্যুতে কী অবস্থান নেবে, বরং একটি নির্দিষ্ট ব্লকের পক্ষে দাঁড়ালে বা অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হলে সেটি তাদের সামগ্রিক কূটনৈতিক সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করবে, তাও বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। যেহেতু মহাকাশ খাতের অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে, তাই কোনো না কোনো অবস্থান নেওয়ার চাপও তীব্রতর হচ্ছে। যেমন পৃথিবীতে রাজনীতি এড়ানো কঠিন, তেমনি মহাকাশেও তা আর সম্ভব নয়।

পর্ব ৩ : ভবিষ্যৎ ও ইতিহাসের সংযোগ

- মহাকাশ যুদ্ধ
- আগামী দিনের পৃথিবী

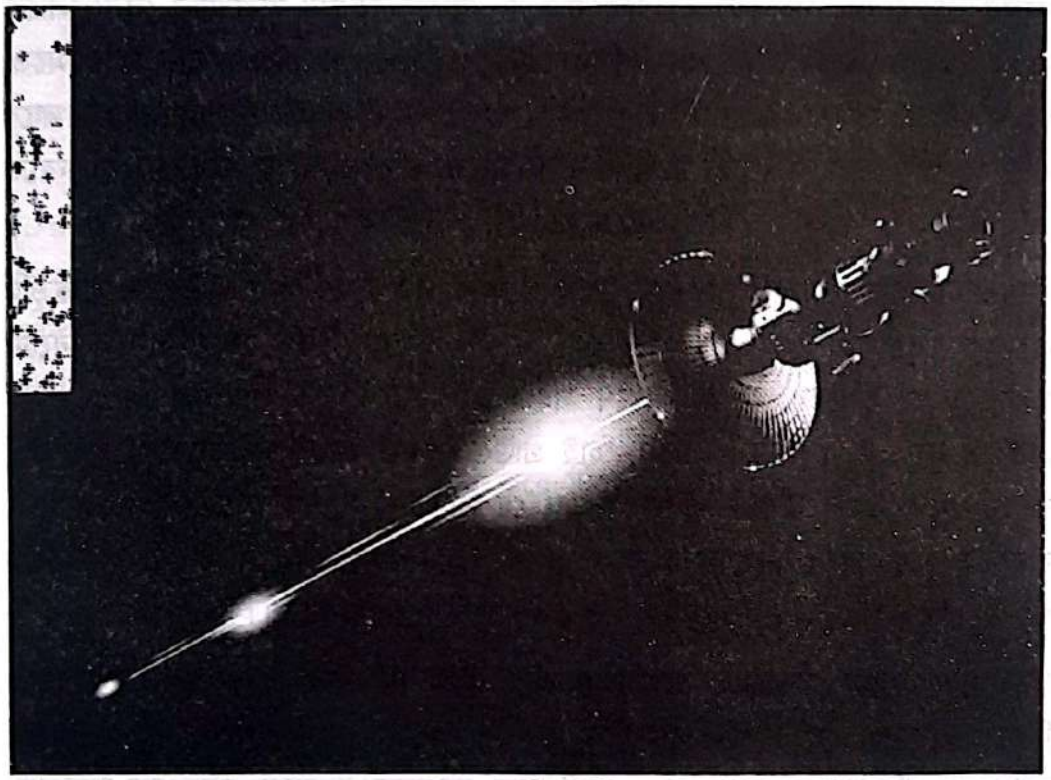
CamScanner

অধ্যায়-৯

মহাকাশ যুদ্ধ (SPACE WARS)

"দুটি জিনিসের কোনো সীমা নেই : এক হলো মহাবিশ্ব, আরেকটা মানুষের নির্বুদ্ধিতা—যদিও মহাবিশ্বের অসীমতা নিয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে।"

— আলবার্ট আইনস্টাইন



মহাকাশে লেজার ফায়ার করা একটি সামরিক স্যাটেলাইটের দৃশ্য।

মানবজাতি যতবারই কোনো অজানা পরিসরে প্রবেশ করেছে, ততবারই সেখানে যুদ্ধকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। জাহাজ নির্মাণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধজাহাজ। উড়োজাহাজের আবিষ্কার এনেছে যুদ্ধবিমান ও বোমারু বিমান। মহাকাশও এর ব্যতিক্রম নয় এবং সম্ভাব্য এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র এখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে।

আমরা জানি যে মহাকাশে শান্তিপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এখনো কোনো কার্যকর ও সর্বজনগ্রাহ্য কাঠামো গড়ে ওঠেনি। একই সঙ্গে, ক্রমেই আরও বেশি দেশ মহাকাশ কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে। ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট থেকে শুরু করে চাঁদে ঘাঁটি স্থাপন পর্যন্ত বিভিন্ন সম্ভাব্য "হটস্পট" বা উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই টানাপোড়েন দেখা দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, যদি ভবিষ্যতে আমরা মহাকাশ-ভিত্তিক সংঘাতের দিকে অগ্রসর হই, তাহলে সেই সংঘাতের রূপ কী হতে পারে—এ প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসে।

ধারণাগতভাবে, কিছু অ্যাস্ট্রোপলিটিক্স বিশ্লেষক মনে করেন যে মহাকাশ যুদ্ধকে মূলত মহাকাশের যোগাযোগের পথ বা লাইন অব কমিউনিকেশন দখলের লড়াই হিসেবে দেখা উচিত। তাদের যুক্তি হলো, ইতিহাসে যেমন দেশগুলো পৃথিবীর সমুদ্রপথ এবং তার সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছে, তেমনি ভবিষ্যতে তারা মহাকাশের কক্ষপথের পথ বা অরবিটাল লেন নিয়েও লড়াই করবে। অন্যদিকে, মহাকাশ যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ড. ব্লেডিন বোয়েন অরবিটাল লেনগুলোকে 'কসমিক কোস্টলাইন' বা মহাজাগতিক তটরেখা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, যেমন স্থলভিত্তিক শক্তিগুলো তাদের উপকূলসংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শক্তি প্রদর্শন করতে পারে, তেমনি তারা মহাকাশ থেকেও শক্তি প্রক্ষেপণ করতে এবং নিচের ভূখণ্ডকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার্থে মহাকাশকে অনেক সময় 'হাই গ্রাউন্ড' বা উচ্চভূমি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়—অর্থাৎ এমন একটি অবস্থান, যেটি দখলে থাকলে নিচের যুদ্ধক্ষেত্র বা ভূখণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। তবে এই পরিভাষা নিয়ে সবাই একমত নন। ড. বোয়েনের মতে, 'হাই গ্রাউন্ড' শব্দটি প্রায়ই ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এতে এমন একটি ধারণা জন্মায় যে মহাকাশ সম্পদ যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতেই হবে। তিনি বরং মহাকাশকে 'এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যেতে পারে'—এইভাবে দেখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

তবে মহাকাশকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, অধিকাংশ বিশ্লেষক এ বিষয়ে একমত যে নিকট ভবিষ্যতে কোনো একক শক্তির পক্ষে মহাকাশে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে, আপাতত সবচেয়ে শক্তিশালী মহাকাশ-ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ হওয়াও পৃথিবীর ওপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা দেয় না। কিন্তু তারা এটাও স্বীকার করেন যে, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাকাশের গুরুত্ব যত বাড়বে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাত্রাও তত তীব্র হবে। যেহেতু তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যতে কোনো একটি শক্তি শেষ পর্যন্ত প্রভাবশালী অবস্থান অর্জন করতে পারে, তাই প্রধান রাষ্ট্রগুলো এই খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে, যাতে প্রতিযোগিতায় তারা

CamScanner

পিছিয়ে না পড়ে। একই সময়ে, দ্বিতীয় সারির শক্তিগুলো তথাকথিত 'বিগ থ্রি'—তিনটি প্রধান শক্তির ওপর তাদের নির্ভরতা কমানো বা তাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করছে।

বাস্তবে, আমাদের প্রথম তথাকথিত 'মহাকাশ যুদ্ধ'-এর জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান ইতোমধ্যেই বিদ্যমান।

অন্তত চলতি দশকজুড়ে, মহাকাশে যুদ্ধের অর্থ মূলত পৃথিবীর ওপর সংঘটিত যুদ্ধকেই প্রভাবিত করা। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সামরিক শক্তিগুলো মহাকাশের ওপর এতটাই নির্ভরশীল যে এটি আজকের সামরিক চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। স্যাটেলাইট ছাড়া সেনা কমান্ডাররা জানতেই পারেন না কোথায় তাদের বিমানবাহী রণতরী, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বা স্থলবাহিনী মোতায়েন করা উচিত। একইভাবে, শত্রুপক্ষ কোথায় অবস্থান করছে—সেই তথ্যও তারা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেন না।

প্রফেসর এভারেট ডলম্যানের মতে, নিকট ভবিষ্যতে যেকোনো মহাকাশ-সংঘাতের সূত্রপাত হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের উত্তেজনা থেকে, যেখানে চীন, তাইওয়ান, ভারত, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র জড়িত। তাঁর ভাষায়, আজ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মহাকাশ-ভিত্তিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে রয়েছে নির্ভুল অস্ত্র নির্দেশনা, গোয়েন্দা তথ্য ও নজরদারি ব্যবস্থা এবং শত্রুর মোতায়েন ও অভিপ্রায় সম্পর্কে প্রায় নিখুঁত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা। এই কারণে, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা কোনো স্থলভিত্তিক সামরিক পদক্ষেপ বাধাগ্রস্ত করার আগে যদি চীন মার্কিন মহাকাশ সহায়তাকে অকার্যকর করে দিতে পারে, তাহলে সেটি তাদের জন্য এক বিশাল কৌশলগত সুবিধা হয়ে উঠবে।

এটি অনিবার্য নয় এবং মহাকাশ-সংঘাত এড়ানোর জন্য অনেক প্রভাবশালী উপাদান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস দেখিয়েছে, ভুল গণনা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে দেশগুলো অতীতেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি, কিছু ক্ষেত্রে দেশগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই যুদ্ধের পথে নামেছে। নিচের দৃশ্যপটটি একটি ইচ্ছাকৃত সংঘাতের প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়েছে, যা দেখায় যে মহাকাশ আমাদের পৃথিবীর সংঘাতে কীভাবে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে।

২ মে ২০৩০, ০৩:০৯ — শাইয়েন মাউন্টেন এয়ার ফোর্স স্টেশন, কলোরাডো

রাতের শিফটে একজন স্পেশালিস্ট ফোর (Spc4/E-4), স্পেস সিস্টেম অপারেটর, লক্ষ্য করেন যে দুটি চীনা স্যাটেলাইট একটি আমেরিকান স্যাটেলাইটের খুব কাছাকাছি

চলে এসেছে, যা তাইওয়ান প্রণালীর ওপর নজর রাখে। তিনি একজন তুলনামূলক জুনিয়র 'গার্ডিয়ান'—স্পেস ফোর্সের সদস্যদের দেওয়া বিশেষ নাম—কিন্তু উপকূলে চীনা সামরিক বাহিনী জড়ো হওয়ার পরিস্থিতি বুঝে, তিনি জানেন যে বিষয়টি দ্রুত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জানানো প্রয়োজন।

পিএলএ গত তিন মাস ধরে উপকূলে জাহাজ, সৈন্য এবং ল্যান্ডিং ক্রাফট জড়ো করেছে, যা তাইওয়ানে সম্ভাব্য আক্রমণের ইঙ্গিত বহন করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বিভ্রান্ত : সৈন্য ও যন্ত্রপাতি প্রণালীর ওপারে আক্রমণের ইঙ্গিত দিচ্ছে, কিন্তু আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যান্ডিং ক্রাফটের সংখ্যা যথেষ্ট নয়।

২ মে, ০৭:২৪

চীনা স্যাটেলাইটগুলো আরও কাছাকাছি চলে আসে এবং স্পেশালিস্ট ফোরের প্রাথমিক রিপোর্ট হোয়াইট হাউসে পৌঁছায়। বেইজিংয়ে কড়া কূটনৈতিক বার্তা পাঠানো হয় : *"আপনারা খুব কাছ থেকে অনুসরণ করছেন। পিছিয়ে যান।"* একই দিনে চীনের প্রতিক্রিয়া আসে। তারা জোর দিয়ে জানায় যে তাদের স্যাটেলাইটের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই এবং ২০০২ সালের আউটার স্পেস বিষয়ক জাতিসংঘ চুক্তি অনুযায়ী মহাজাগতিক বস্তুর সব এলাকায় অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে। বেইজিং বিশেষভাবে ২০২৮ সালের সংকটের কথা উল্লেখ করে, যখন যুক্তরাষ্ট্র খুব কাছ থেকে একটি চীনা স্যাটেলাইট 'পরিদর্শন' করেছিল।

মে মাস জুড়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র দুটি ছোটো 'বডিগার্ড' স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে, যা চীনা ও আমেরিকান স্যাটেলাইটের মাঝখানে অবস্থান নেয়। এক সপ্তাহ পরে, যুক্তরাজ্যও একই পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সংহতি প্রদর্শনের জন্য।

১ জুন

গল্পটি শিরোনাম থেকে হারিয়ে যায়—কারণ কিছুই ঘটেনি। এছাড়া প্রণালীতে বর্ষাকাল চলছে, যা আক্রমণের জন্য খুব উপযুক্ত নয়।

৪ সেপ্টেম্বর

জলরাশি শান্ত। কিন্তু কূটনৈতিক উত্তেজনা সমুদ্রের মতো উত্তাল।

১২ সেপ্টেম্বর, ০৯:২০

ফাইভ আইজ গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত একটি অস্ট্রেলিয়ান স্যাটেলাইট রহস্যজনকভাবে কক্ষপথ থেকে পড়ে যায় এবং বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় পুড়ে যায়। একই সময়ে, আরেকটি চীনা স্যাটেলাইট ধীরে ধীরে একটি মার্কিন স্যাটেলাইটের

CamScanner

কাছাকাছি চলে আসে, যা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার কমান্ড ও কন্ট্রোল সিস্টেমের অংশ। ওয়াশিংটন সতর্কতার মাত্রা বৃদ্ধি করে।

প্রণালীতে নজরদারি করা এক বিষয়; পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা ব্যাহত হওয়া আরেকটি বিষয়। যদি আর্লি-ওয়ার্নিং বা আগাম সতর্কবার্তার অংশ 'অন্ধকার' হয়ে যায়, তবে যুক্তরাষ্ট্র আকস্মিক পারমাণবিক আক্রমণের শিকার হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের দাবি করে এবং স্যাটেলাইটের জন্য 'ক্লিয়ারেন্স জোন' বা মুক্ত অঞ্চল প্রস্তাব করে, যেখানে অন্য দেশগুলো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু বৈঠক বা দাবির কোনো ফল হয় না। বেইজিং পুনরায় আইনের শাসন মেনে চলার কথা উল্লেখ করে, এবার আউটার স্পেস ট্রিটির দিকে ইঙ্গিত করে, যা বলে যে মহাকাশে জাতীয় দখলের অধিকার নেই।

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯:৪১

চীনা জাহাজগুলো সৈন্য লোড এবং আনলোড করার মহড়া শুরু করে। ওয়াশিংটন ওকিনাওয়ার কাছে বিমানবাহী রণতরী বহরকে জাপানি ক্যারিয়ারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেয়, যা তাইওয়ান থেকে মাত্র এক ঘণ্টার উড়াল দূরত্বে। ব্রিটিশরা পোর্টসমাউথ থেকে কুইন এলিজাবেথ ক্যারিয়ার বহর পাঠায় এবং অস্ট্রেলিয়ার নতুন পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনগুলো ফিলিপাইন সাগরের দিকে রওনা হয়। ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া শান্ত থাকার আহ্বান জানায়।

৩ অক্টোবর, ০৪:০০ (প্যাসিফিক টাইম)

ঘটনা ঘটে। কিন্তু যা আমেরিকানরা ভয় করেছিল, ঠিক তা নয়। চীনা বহর উপকূলের বন্দরগুলো থেকে যাত্রা শুরু করে, তাদের ওপর দিয়ে সার্বক্ষণিক বিমান সুরক্ষা বজায় রাখা হয়। বিশ মিনিটের মধ্যেই প্রণালীর দায়িত্বে থাকা একটি আমেরিকান স্যাটেলাইটকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ করা দুটি চীনা স্যাটেলাইট হঠাৎ করে তাদের ক্যামেরায় তীব্র আলো নিক্ষেপ করে—ড্যাজলিংয়ের মাধ্যমে স্যাটেলাইটটিকে কার্যত 'অন্ধ' করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে, পুরো অঞ্চলজুড়ে থাকা আমেরিকান, জাপানি ও অস্ট্রেলিয়ান স্যাটেলাইটগুলোকে জ্যাম করা হয় অথবা চীনের পাঠানো বিভ্রান্তিকর সংকেত দিয়ে 'স্পুফ' করা হয়, ফলে তারা ভুল তথ্য দিতে শুরু করে।

এই ঘটনাগুলো ঘটার ঠিক মুহূর্তেই তথাকথিত 'আক্রমণকারী বহর' আবার বন্দরের দিকে ফিরে যেতে থাকে। কিন্তু তাদের আকাশ প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত চীনা যুদ্ধবিমানগুলো উপকূল বরাবর সোজা উড়ে তাইওয়ান-নিয়ন্ত্রিত কিনমেন দ্বীপপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়—যা চীনা মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) ১৯৪৯ সালে এই দ্বীপগুলো থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল এবং ১৯৫৮ সালেও পুনর্দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতি প্রায় নিষ্পত্তির দিকে চলে যায়। তাইওয়ান ২০০০ সালে যেখানে কিনমেনে প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য মোতায়েন রেখেছিল, সেখানে ২০২০-এর দশকে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩,০০০ জনে। দ্বীপটির প্রতিরক্ষা অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল উচিও (Wuchiu) দ্বীপে স্থাপিত মনুষ্যবিহীন, স্বয়ংক্রিয় স্বল্প-পাল্লার অস্ত্র ব্যবস্থার সর্বশেষ সংস্করণের ওপর, যা ২০২২ সালে তৃতীয়বারের মতো আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রথম মোতায়েন করা হয়।

কিন্তু হাইনান দ্বীপের মুমিয়ান এলাকার কাছে অবস্থানরত চীনা ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার অপারেটররা সেই সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। স্বল্প দূরত্ব দ্রুতগামী ছোটো নৌকায় পাড়ি দিয়ে যখন চীনা স্পেশাল ফোর্সের ছোটো দলগুলো তীরে উঠে আসে, তখন অধিকাংশ অস্ত্রই নীরব থাকে। যেগুলো এখনো কাজ করছিল, সেগুলোর অনেকগুলোই ভুল দিকে তাক করা ছিল। তবে আসল সমস্যা স্পেশাল ফোর্সেস নয়।

তাইওয়ানিজ বিমান বাহিনী তখন মূল দ্বীপ থেকে প্রায় ১৮৭ কিলোমিটার দূরে টহল দিচ্ছিল এবং প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। এই সুযোগে, চীনা বিমান বাহিনীর পূর্ণ আকাশ প্রতিরক্ষার ছায়ায় প্রায় ২০,০০০ প্যারাট্রুপার কিনমেন দ্বীপে অবতরণ করে। জরাজীর্ণ গ্যারিসনের প্রতিরক্ষার প্রায় ৩০ শতাংশই আক্রমণের প্রথম ঢেউয়েই ধ্বংস হয়ে যায়। এটি ছিল একটি নিখুঁত 'ফেইট অ্যাকমপ্লি'—একটি সম্পন্ন ঘটনা। সকাল ০৯:৫০-এ আত্মসমর্পণ করা হয় এবং দ্বীপটির প্রায় ১,৬০,০০০ বাসিন্দা এখন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

তাইওয়ান পালটা আক্রমণে যুক্ত হওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানায়। ওয়াশিংটন সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং তাইওয়ানও জানে যে একা তাদের পক্ষে এমন অভিযান চালানো সম্ভব নয়। তবুও, আমেরিকানরা বুঝতে পারে যে কোনো না কোনোভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতেই হবে।

৪ অক্টোবর, ১০:১০ (প্যাসিফিক টাইম)

একদিন সময় লাগে, কিন্তু ছোটো বুস্টার রকেটযুক্ত দুটি 'বডিগার্ড' স্যাটেলাইট চীনা স্যাটেলাইটগুলোর ওপরে অবস্থান নেয়। রোবোটিক বাহু ব্যবহার করে তারা সেগুলোকে ধীরে ধীরে নিচের দিকে ঠেলে দেয়, যতক্ষণ না সেগুলো বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। চীনা পক্ষ তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু এরপর যা ঘটে, তা আরও বেশি বিপজ্জনক।

১২:৫৫ (প্যাসিফিক টাইম)

যুক্তরাষ্ট্র তাদের পারমাণবিক কমান্ড ও কন্ট্রোল ব্যবস্থার সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা একটি চীনা স্যাটেলাইটকে লক্ষ্য করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন লেজার বিম নিক্ষেপ করে, যা সেটিকে কয়েক হাজার টুকরোয় ভেঙে দেয়। এই হামলায় ব্যবহৃত হয় এক্স-৪০এ (X-40A) চালকবিহীন স্পেসপ্লেন—পুনর্ব্যবহারযোগ্য এক্স-৩৭বি-র একটি উন্নত সংস্করণ, যার লেজার সক্ষমতা ২০২০-এর দশকের শুরুতে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে উন্নয়ন করা হয়েছিল।

আক্রমণটি এমন একটি কোণ থেকে পরিচালিত হয়, যাতে প্রায় ৪,০০০ ধ্বংসাবশেষের বেশিরভাগই বাইরে দিকে গভীর মহাকাশে ছিটকে যায়। তবে শত শত ছোটো টুকরো কক্ষপথে থেকেই যায়, যা চীনসহ বিভিন্ন দেশের নভোচারী ও স্যাটেলাইটের জন্য ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়। অপমানের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে, আরেকটি মার্কিন স্যাটেলাইট একই সময়ে নৌ যোগাযোগে ব্যবহৃত একটি চীনা স্যাটেলাইটকে অনুসরণ করছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেটি ওই স্যাটেলাইটের কাছে পৌঁছে তার অ্যান্টেনা ধরে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেয়—মহাকাশে সংঘটিত এক ধরনের 'ছোটোখাটো দুর্ঘটনা', এক কথায় একটি মহাজাগতিক ফেন্ডার বেন্ডার।

বেইজিং পালটা প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে রূপ নেয় না। ধীরে ধীরে সংকটের তীব্রতা কমে আসে, তবে এর প্রভাব ও রেশ বহু বছর ধরে থেকে যায়। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং যুক্তরাজ্য তাইপেইয়ের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ওই চুক্তিতে বলা হয়, 'মূল ভূখণ্ড থেকে আক্রমণ' হলে তারা তাইপেইকে সহায়তা করবে। তবে কিনমেন এবং মূল ভূখণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত অন্যান্য দ্বীপগুলোর সুরক্ষার কোনো নিশ্চয়তা এতে দেওয়া হয়নি। একইভাবে অনুপস্থিত থাকে মহাকাশ পরিস্থিতিগত সচেতনতা বা স্পেস সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস সংক্রান্ত একটি চুক্তি, যার ডাকনাম জিওওএমও (GOOMO)—'গেট আউট অফ মাই অরবিট' বা 'আমার কক্ষপথ থেকে সরে যাও'। অথচ এটিই হতো মহাকাশে প্রথম স্বীকৃত সামরিক পদক্ষেপের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমঝোতা।

এবার আবার পৃথিবীতে ফিরে আসা যাক। যেকোনো ভবিষ্যৎ দৃশ্যপটই মূলত তাত্ত্বিক, আর উপরে বর্ণিত চিত্রটিও নিখুঁত নাও হতে পারে। তবে এতে যে প্রযুক্তিগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগই ইতোমধ্যেই বাস্তবে বিদ্যমান। স্পেস ফোর্সে এখন স্পেস সিস্টেম অপারেটর রয়েছে; ফ্রান্স এমন 'বডিগার্ড স্যাটেলাইট' তৈরি করেছে, যা 'সক্রিয় প্রতিরক্ষা'র উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করতে সক্ষম; ড্যাজলিং ও স্পুফিং

প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই সহজলভ্য; উচিও স্বয়ংক্রিয় আর্টিলারি ব্যবস্থা তাইওয়ানে মোতায়েন করা হয়েছে; আর রয়েছে এক্স-৩৭ নামের একটি স্পেসপ্লেন।

যদিও বর্তমানে মহাকাশকে পৃথিবীতে যুদ্ধ পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তবু অদূর ভবিষ্যতে সরাসরি মহাকাশে যুদ্ধ হবে অত্যন্ত ধীরগতির। স্যাটেলাইটগুলো এখন একে অপরকে আক্রমণ করতে সক্ষম হলেও, যেকোনো মহাকাশযানকে কৌশলগতভাবে নড়াচড়া করাতে বা অবস্থান বদলাতে হলে তাড়াহুড়ো নয়, বরং ধৈর্যশীল, সুচিন্তিত ও অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। অপারেটরদের বিভিন্ন কক্ষপথের ছেদবিন্দু গণনা করতে হয়, যাতে একটি যন্ত্রকে এমন জায়গায় নেওয়া যায়, যেখানে সেটি অন্যটিকে ধরতে, ধাক্কা দিতে বা এমনকি গুলি করতেও পারে। ফলে একটি স্যাটেলাইটের কক্ষপথ পরিবর্তন করতে প্রচুর সময় ও প্রচেষ্টা লাগে।

আর যদিও এসব বস্তু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চলাচল করে—বুলেটের চেয়েও দ্রুত—মহাকাশ নিজেই অত্যন্ত বিশাল। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক লো আর্থ অরবিট, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার ওপরে শুরু হয় এবং জিওস্টেশনারি অরবিট, যা প্রায় ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার ওপরে অবস্থিত। এই দুই কক্ষপথের মধ্যবর্তী এলাকার আয়তন পৃথিবীর মোট আয়তনের তুলনায় প্রায় ১৯০ গুণ বড়ো। এত বিশাল একটি পরিসর নিয়ন্ত্রণ বা আচ্ছাদন করা যে কতটা কঠিন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

যদি আজকের দিনে কেউ মহাকাশে একটি স্যাটেলাইট আরেকটিকে তাড়া করছে—এমন একটি রিয়েল-টাইম যুদ্ধের সিনেমা বানাতে চায়, তবে দর্শকের জন্য আপনার কাজ থেকে অন্তত এক দিনের ছুটি নেওয়া লাগবে, সঙ্গে প্রচুর পপকর্ন। আর অবশ্যই কফি। ভালো খবর হলো, টয়লেটে যাওয়ার বিরতিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন মিস হওয়ার আশঙ্কা প্রায় নেই।

এই ধীরগতির গতিবিধির যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। একদিকে, এটি সম্ভাব্য প্রতিপক্ষদের একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং ঘনীভূত হতে থাকা সংকট সামাল দেওয়ার জন্য সময় দেয়। অন্যদিকে, এটি আগাম বা প্রি-এম্পটিভ আক্রমণের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। যদি কোনো রাষ্ট্র লক্ষ্য করে যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী একের পর এক স্যাটেলাইটকে এমন অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে, যা ক্রমেই অসহনীয় রকমের হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠছে, তবে তারা যাকে কখনো কখনো 'কিল চেইন' বলা হয়—অর্থাৎ পৃথিবীতে অবস্থিত সেই অবকাঠামো, যা শত্রুপক্ষের স্যাটেলাইটগুলোকে সমর্থন ও নিয়ন্ত্রণ করে—সেটিতে আঘাত হানতে প্রলুব্ধ হতে পারে। এই আক্রমণ সাইবার যুদ্ধের মাধ্যমেও চালানো সম্ভব।

এমনকি যদি এই পদক্ষেপ কূটনৈতিকভাবে সামলানো হয়—যেমন, এটিকে হুমকিস্বরূপ আচরণের একটি 'সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়া' হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং আশ্বাস দেওয়া হয় যে আর কোনো আক্রমণ করা হবে না—তবুও পরিস্থিতি খুব সহজেই প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপে গড়াতে পারে। যে দেশটি প্রথম 'আঘাত' সহ্য করেছে, তারা পালটা জবাবে অন্য পক্ষের একটি স্যাটেলাইটের দিকে ডাইরেক্ট-অ্যাসেন্ট অ্যান্টি-স্যাটেলাইট অস্ত্র (ASAT) নিক্ষেপ করতে পারে এবং তারাও একইভাবে সমানুপাতিকতার যুক্তি দেখাতে পারে। এই পর্যায়ে পৌঁছালে পরিস্থিতি যেকোনো দিকে মোড় নিতে পারে—কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া থেকে শুরু করে সরাসরি পারমাণবিক যুদ্ধ পর্যন্ত।

ASAT অস্ত্র সব ধরনের স্যাটেলাইটের জন্যই একটি স্থায়ী হুমকি। তবে সবচেয়ে বড়ো উদ্বেগের বিষয় হলো পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলোর আর্লি-ওয়ার্নিং বা আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্যাটেলাইটগুলোর নিরাপত্তা। এর মধ্যে কিছু স্যাটেলাইট পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়ে সতর্ক সংকেত দেয়, আবার কিছু—যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডভান্সড এক্সট্রিমলি হাই ফ্রিকোয়েন্সি (AEHF) নেটওয়ার্কের স্যাটেলাইটগুলো—পারমাণবিক হামলার পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি স্যাটেলাইটের দাম এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, আকারে প্রায় একটি ছোটো বাড়ির সমান এবং এগুলোর কোনোটি হুমকির মুখে পড়লেই মালিক রাষ্ট্রগুলো ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

ভবিষ্যতের স্যাটেলাইট ব্যবস্থা আরও বেশি পরিশীলিত এবং একই সঙ্গে আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে তার নেক্সট-জেনারেশন ওভারহেড পারসিস্টেন্ট ইনফ্রারেড ওয়ার্নিং সিস্টেম তৈরি করছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে কার্যক্রমে আসার কথা এবং যার পেছনে ব্যয় হবে বহু বিলিয়ন ডলার।

এই স্যাটেলাইটগুলোও আকারে প্রায় বাড়ির সমান হবে, ফলে এগুলো অত্যন্ত লোভনীয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। একই সঙ্গে এগুলো আবারও স্পষ্ট করে তোলে, কেন আন্তর্জাতিক চুক্তি জরুরি—বিশেষ করে আমাদের ওপরের যুদ্ধের দৃশ্যপটে বর্ণিত স্পেস সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস বা মহাকাশ পরিস্থিতিগত সচেতনতা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর কারণে।

এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের অভাব থাকলে, প্রতিযোগিতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনাও অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি পায়। হয়তো আমরা এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছাইনি, কিন্তু নিচের কাল্পনিক দৃশ্যপটটি কল্পনার চেয়ে খুব বেশি দূরের ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে।

৪ এপ্রিল ২০৩৮, ভোর ০৫:১০ (মুন টাইম বা চাঁদের সময়)। আর্টেমিস ইন্টিগ্রেটেড মুন স্ট্রাকচার (AIMS)।

জাপানি লুনার ওয়াচ শিফট আগের দিন থেকেই একটি রাশিয়ান মহাকাশযান পর্যবেক্ষণ করছিল, যেটি মস্কোর উত্তরে অবস্থিত গ্লেসেটস্ক কসমোড্রোম থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে যানটি বহুজাতিক এইমস (AIMS) ঘাঁটি থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাশিয়ান মুন স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। তবে গত এক ঘণ্টায় নাইট শিফটের অপারেটররা লক্ষ্য করেন, এর গতিপথ বদলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, এটি ওই দুটি ঘাঁটির মাঝামাঝি কোনো স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারপর হঠাৎ করেই এটি আবার দিক পরিবর্তন করে।

অপারেটররা দ্রুত কয়েকটি হিসাব কষে অ্যালার্ম বোতাম চাপেন।

আর্টেমিস অ্যাকর্ডসের স্পষ্ট লঙ্ঘন করে রাশিয়ান ল্যান্ডিং ক্রাফটটি সোজা চাঁদের দক্ষিণ মেরুর 'পিকস অফ ইটারনাল লাইট' বা অনন্ত আলোর চূড়া অঞ্চলের দিকে—সেখানে অবস্থিত ব্রিটিশ ঘাঁটির লক্ষ্যেই—অগ্রসর হতে থাকে। যদিও রাশিয়া আর্টেমিস অ্যাকর্ডসের স্বাক্ষরকারী নয় এবং মস্কো দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছে যে তারা এর কোনো অনুচ্ছেদের দ্বারা বাধ্য নয়, বিশেষ করে স্বঘোষিত 'সেফটি জোন'-এর ক্ষেত্রে, যেমনটি ব্রিটিশরা শ্যাকলটন ক্রেটারের আশপাশে ঘোষণা করেছে। ওই ক্রেটারটি চন্দ্রপৃষ্ঠের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, কারণ এর ভেতরে চিরস্থায়ী ছায়ায় বিপুল পরিমাণ পানি ও মিথেন জমা রয়েছে, যেখানে বিপরীতে চূড়াগুলো সারাক্ষণ আলো পায়।

ঘাঁটিতে থাকা চারটি আর্টেমিস দেশ—যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের—সবার কাছেই অ্যালার্ম বেজে ওঠে, তবে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব পড়ে ব্রিটিশদের ওপর। একটি রোবোটিক রোভার ল্যান্ডিং ট্র্যাক বন্ধ করার জন্য এগিয়ে নেওয়া হয় এবং স্টেশনের এয়ারলকগুলো দ্বিগুণ নিরাপত্তায় সিল করা হয়। ভোর ০৫:৫৫-এ রাশিয়ান যানটি রোভার এড়াতে এবং তুলনামূলক সমতল ভূমির সুবিধা নিতে ল্যান্ডিং ট্র্যাকের ডান দিক দিয়ে গ্লাইড করতে শুরু করে।

ভোর ০৬:০৯-এ বিপর্যয় ঘটে। একটি ছোটো, মসৃণ পাথর যানটির নিচের অংশে আঘাত হানে, যার ফলে একটি ডানা কাত হয়ে গিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে ধাক্কা খায়। সেই আঘাতের শক্তিতে যানটির দেহ ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যায় এবং সামান্য বাঁ দিকে সরে মাত্র ৫০ মিটার এগিয়ে গিয়ে রোভারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুই টুকরো হয়ে যায়।

ব্রিটিশ মেডিকেল ক্রু সামনের অংশে পৌঁছে ছয়জন রুশ কসমোনটের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পেছনের অংশে উদ্ধারকারী দল দুটি যন্ত্র খুঁজে পায়—একটি সাধারণ রোবোটিক

নির্মাণযন্ত্র এবং অন্যটি ড্রিলিং বা খননক্ষমতাসম্পন্ন একটি রোভার। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মস্কো 'ফ্যাক্টস অন দ্য সারফেস' বা পৃষ্ঠে বাস্তবতা তৈরি করতে চেয়েছিল এবং তথাকথিত 'সেফটি জোন'-এর বিরোধিতায় নিজেদের অবস্থান জোরালো করতে চেয়েছিল—যে শব্দটিকে রাশিয়া চন্দ্রের তথাকথিত 'স্ফিয়ারস অফ ইনফ্লুয়েন্স' বা প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠার একটি অস্পষ্ট অজুহাত বলে মনে করে।

৬ এপ্রিল, রাত ২০:৩৬। জরুরি জাতিসংঘ মহাকাশ পরিষদ (UN Space Council)।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা প্রাণহানির মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তাদের 'আন্তরিক সমবেদনা' প্রকাশ করে, তবে একই সঙ্গে জানায় যে রাশিয়া 'সেফটি জোন' উপেক্ষা করায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে—এটি দুর্ভাগ্যজনক। রাশিয়ান প্রতিনিধিরা পালটা অভিযোগ তোলে যে যুক্তরাজ্য ল্যান্ডিং সাইট ইচ্ছাকৃতভাবে অবরোধ করেছিল এবং সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ১৯৭৯ সালের মুন ট্রিটি চাঁদ ও এর সম্পদকে 'মানবজাতির সাধারণ ঐতিহ্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। আমেরিকানরা পালটা যুক্তি দেয় যে ওই চুক্তিটি কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়নি। চীনারা নীরব থাকে। সংকট কি এখানেই শেষ?

১৩ এপ্রিল, ভোর ০৫:১২ (মুন টাইম)। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

এবার রাশিয়া আগেভাগেই ঘোষণা দেয় যে তারা অবতরণ করতে যাচ্ছে। মস্কো আমেরিকান নর্থ লিংক কোম্পানিকে জানায় যে তারা চাঁদের উত্তর মেরুতে অবস্থিত তাদের বোর (Bore) ঘাঁটিতে নামতে চায় এবং সেখানে বিরল মৃত্তিকা উপাদানের খনন শুরু করবে। নর্থ লিংক জবাবে জানায়, এটি তাদের বাণিজ্যিক অধিকার লঙ্ঘন করে—বিশেষ করে যখন তারা ঠিক কোন এলাকায় এই সম্পদ রয়েছে, তা প্রমাণ করতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

ওয়াশিংটন মস্কোকে সতর্ক করে দিয়ে জানায়, আমেরিকান নাগরিকদের সুরক্ষার দায়িত্ব শুধু পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা মহাকাশেও প্রযোজ্য। একই সঙ্গে স্পেস ফোর্সকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়।

রাশিয়ান যানটি অবতরণ শুরু করলে ল্যান্ডিং ট্র্যাকটি তিনটি রোভার দিয়ে অবরুদ্ধ করা হয় এবং রাশিয়ান যোগাযোগ ফ্রিকোয়েন্সিতে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক সতর্কবার্তা সম্প্রচার করা হতে থাকে। অবতরণের আর এক মিনিট বাকি থাকতে, ট্র্যাকের সামনে, বাম এবং ডান দিক থেকে ফরওয়ার্ড অপারেটিং বেস (FOB)-এ অবস্থানরত আমেরিকানরা তিন দিক থেকে আসা যানটিকে ড্যাজল বা অন্ধ করে দেওয়ার জন্য লেজার ব্যবহার শুরু করে। ধারণা ছিল, এতে রাশিয়ান যানটি অবতরণ বাতিল করে উপরে উঠে যাবে।

কিন্তু এরপর যা ঘটে, তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাশিয়ান যানটি হঠাৎ করে সামনের এফওবি লক্ষ্য করে একটি ডাইরেক্টেড-এনার্জি বিম নিক্ষেপ করে। আঘাত এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ড্যাজল লেজার চালানো যন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের শ্র্যাপনেল এফওবি-র পাশে প্রায় দশ সেন্টিমিটার চওড়া একটি গর্ত তৈরি করে এবং দুজন লেজার অপারেটরের একজনের প্রেসারাইজড স্যুটে সূক্ষ্ম ফাটল সৃষ্টি করে। মরিয়া উদ্ধার অভিযান চালানো হলেও চিকিৎসকেরা তার কাছে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।

রাশিয়ান যানটি শেষ পর্যন্ত সত্যিই ওপরে উঠে যায় এবং ফিরে গিয়ে রাশিয়ান স্পেস স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু তখন আর জরুরি জাতিসংঘ বৈঠক ডাকা বা ক্ষোভ প্রকাশের বিবৃতি দেওয়ার মতো সময় নেই—আমেরিকানরা সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ নিতে শুরু করে।

তারা একটি ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করে উত্তর ককেশাসে অবস্থিত রাশিয়ার জেলেনচুকস্কায়া ঘাঁটির একটি ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল সেন্সরে আঘাত হানে। একই সঙ্গে গ্রাউন্ড-বেসড ডাইরেক্ট-অ্যাসেন্ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে লো আর্থ অরবিটে থাকা তিনটি রাশিয়ান গুপ্তচর স্যাটেলাইট ধ্বংস করা হয়। পাশাপাশি একটি সাইবার হামলার মাধ্যমে চারটি বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট অচল করে দেওয়া হয়, যার ফলে রাশিয়ার মোবাইল ফোন ব্যবস্থার বড়ো একটি অংশ এবং মস্কো স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী আঠারো ঘণ্টায় রাশিয়ান অর্থনীতির ক্ষতির পরিমাণ রক্ষণশীল হিসাবেও প্রায় ৭৬০ মিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করা হয়।

এই আক্রমণগুলো ছিল পরিকল্পিত ও পরিমিত। লক্ষ্যবস্তুগুলোর কোনোটিই সরাসরি রাশিয়ার পারমাণবিক আর্লি-ওয়ার্নিং সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত ছিল না এবং জেলেনচুকস্কায়া ঘাঁটিতে চালানো হামলায় থার্ড আর্মির স্পেস সার্ভেইলেন্স ডিভিশনের মাত্র তিনজন সেনা নিহত হয়। এরপর রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষকদের হতবাক করে দেয়। স্পষ্টতই তারা বার্তাটি বুঝেছিল—ওয়াশিংটন এমন এক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, যাকে তারা নিজেরাও 'সমানুপাতিক' বলেই মনে করেছিল। এই অবস্থায় মস্কো চাইলে এখানেই থেমে কূটনৈতিক চ্যানেলগুলোকে পরিস্থিতি সামলাতে দিতে পারত, কিংবা একই মাত্রার পালটা জবাব দিতে পারত, যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখত।

কিন্তু তার বদলে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই রাশিয়া ওয়াশিংটনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আমেরিকান স্যাটেলাইটগুলোর পেছনে ছয়টি 'কিলার স্যাটেলাইট' মোতায়েন করে এবং সেগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করে। স্পেস ফোর্স ডাইরেক্ট-অ্যাসেন্ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ছয়টি রাশিয়ান যান ধ্বংস

করার আগেই এর মধ্যে চারটিতে আঘাত লাগে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আর্লি-ওয়ার্নিং সিস্টেমের একটি অংশ অন্ধকার হয়ে যায় এবং ওয়াশিংটন সতর্কতা স্তর বাড়িয়ে ডেফকন-২ (DEFCON 2) ঘোষণা করে—যা কথিত আছে ১৯৬২ সালের কিউবান মিসাইল সংকটের পর এই প্রথম। এর পরপরই মস্কোও 'হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ কমব্যাট রেডিনেস' বা সর্বোচ্চ মাত্রার যুদ্ধ প্রস্তুতি ঘোষণা করে, যা কার্যত পারমাণবিক পদক্ষেপের ঠিক আগের ধাপ।

আমেরিকানরা দ্রুত তাদের সামরিক স্পেস স্টেশনের পাশে মজুত রাখা জরুরি রিজার্ভ ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত স্যাটেলাইটগুলোর বিকল্প মোতায়েন করে। এর ফলে উভয় পক্ষই আবার একে অপরকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল—কে কীভাবে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার প্রস্তুত করছে, সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ সরাচ্ছে। গোটা বিশ্ব তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। ঠিক এই সময়েই, যখন হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিন উভয়ই প্রথম আঘাত বা 'ফাস্ট স্ট্রাইক' নিয়ে জরুরি বৈঠকে ব্যস্ত, তখন বেইজিং থেকে ফোন আসে।

এভাবেই ২০৩৮ সালে পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো যায়। চীন একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে এবং তথাকথিত 'বিগ থ্রি'—তিনটি প্রধান শক্তি—কয়েকটি 'কনফিডেন্স-বিল্ডিং মেজারস' বা বিশ্বাস-গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণে সম্মত হয়। এর মধ্যে একটি চুক্তি ছিল, চাঁদে মোতায়েন করা সব মাইনিং লেজার কেবল নিচের দিকেই তাক করা যাবে। অন্তত চন্দ্রপৃষ্ঠে উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়।

সবাই তখন বুঝে যায় যে মিউচুয়াল অ্যাসিওরড ডেস্ট্রাকশন (MAD) বা পারস্পরিক নিশ্চিত ধ্বংস নীতিটি এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ভাঙনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৬২ সালের কিউবান মিসাইল সংকটের মতোই, এই ঘটনাও বিশ্বনেতাদের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং শেষ মুহূর্তে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। তবে তৃতীয়বার—তারা হয়তো এতটা সৌভাগ্যবান নাও হতে পারে।

এই পুরো দৃশ্যপটের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো, কোনো পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের আর্লি-ওয়ার্নিং সিস্টেম হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমন পরিস্থিতিতে, যদি কোনো দেশ বুঝতে না পারে কেন একটি সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ তাকে অন্ধ করে দিয়েছে, তবে আগাম বা প্রি-এম্পটিভ হামলার আশঙ্কা মুহূর্তের মধ্যেই বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। আরও বেশ কয়েকটি বিপদ রয়েছে, যেগুলো এখনই স্পষ্ট ও বাস্তব, অথবা অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি কোনো অ্যান্টি-স্যাটেলাইট (ASAT) অস্ত্র বিনিময় ঘটে, তাহলে তা সহজেই তাদের মিত্র

দেশগুলোকেও সংঘাতে জড়িয়ে ফেলতে পারে—অথবা আরও ভয়াবহভাবে, দুটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রই পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে।

আরেকটি আশঙ্কা হলো, কোনো দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র গোপনে একটি 'কিলার স্যাটেলাইট' বহর তৈরি করতে পারে, তা হঠাৎ উৎক্ষেপণ করে কোনো একক দেশকে, কিংবা কার্যত পুরো বিশ্বকেই, জিম্মি করে ফেলতে পারে।

এছাড়াও কল্পনা করা যায় এমন একটি পরিস্থিতি, যেখানে কোনো দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র মহাকাশ অন্বেষণ ও তার সুফল ভাগাভাগি করার আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে নিজেকে বাদ পড়া মনে করে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিশোধ হিসেবে তারা লো আর্থ অরবিটে একাধিক বিশাল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যার ফলে অধিকাংশ স্যাটেলাইট ঝলসে যাবে এবং গোটা বিশ্ব এক গভীর বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত হবে।

শুনতে কি সায়েন্স ফিকশনের মতো লাগছে? ১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্র 'স্টারফিশ প্রাইম' (Starfish Prime) নামের একটি সামরিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। এর অংশ হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর, প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায়, তারা একটি থার্মোনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড বিস্ফোরণ ঘটায়—শুধু কী ঘটে তা দেখার জন্য। বিস্ফোরকটির শক্তি ছিল হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সৃষ্ট ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস হাওয়াইয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, আর হাওয়াই থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত রাতের আকাশ রঙিন আলোয় ভরে ওঠে—এক ধরনের মানবসৃষ্ট অরোরা।

এই বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর চারপাশে একটি কৃত্রিম বিকিরণ বলয় তৈরি হয়, যা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে প্রায় এক দশক সময় নিয়েছিল। অন্তত সাতটি স্যাটেলাইট এতে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়, যার মধ্যে টেলস্টার যোগাযোগ স্যাটেলাইটও ছিল। তখন আমেরিকানদের প্রতিক্রিয়া ছিল সংক্ষিপ্ত—'ওপস'। অথবা, যেমন একজন বিজ্ঞানী পরে আরও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'আমাদের চরম বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে আমরা দেখলাম যে স্টারফিশ ভ্যান অ্যালেন বেল্টে ইলেকট্রনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে... এই ফলাফল আমাদের সব পূর্বাভাসকে অস্বীকার করেছে।'

সোভিয়েত ইউনিয়নও একসময় পৃথিবীর কাছাকাছি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোকে ভালো ধারণা বলে মনে করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, এসব পরীক্ষার ফলাফলই শেষ পর্যন্ত এ ধরনের পরীক্ষার ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পথ তৈরি করে। দুর্ভাগ্যজনক দিক হলো, এই পরীক্ষাগুলো স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে যদি কোনো দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র লো আর্থ অরবিটে আরও শক্তিশালী পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়, তবে সেই কক্ষপথ বছরের পর বছর স্যাটেলাইট ব্যবহারের জন্য কার্যত অযোগ্য হয়ে যেতে

পারে। বিস্ফোরণের সময় সেখানে থাকা যেকোনো যন্ত্র মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যাবে, আর পরবর্তী বিকিরণ পরিবেশে পাঠানো যেকোনো প্রতিস্থাপন স্যাটেলাইটও ঝলসে দেবে।

ভবিষ্যতের মহাকাশযুদ্ধের ক্ষেত্রে এগুলোর সবকটিই বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায়—এগুলো এড়াতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী করা যেতে পারে?

অ্যাস্ট্রোপলিটিক্স নিয়ে চিন্তাভাবনা করা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যারা তথাকথিত 'বাজপাখি' বা হক—অর্থাৎ যুদ্ধকৌশলে আগ্রাসী—তারা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই মনে করেন যে যেহেতু মহাকাশ ইতোমধ্যেই সামরিকায়নের পথে এগোচ্ছে, তাই সামনে এগোনোর একমাত্র পথ হলো প্রথমেই উত্তেজনা বাড়ানো এবং এমন এক স্তরে পৌঁছানো, যা প্রতিযোগীরা সহজে মেলাতে পারবে না। এটি মূলত একটি ডিটারেন্স বা প্রতিরোধমূলক কৌশল।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পুরোনো বাস্তবতা হলো—যার হাতে অস্ত্র নেই, তার সঙ্গে কেউ অস্ত্র সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করে না। 'থমাস থিওরেম' ১৯২০-এর দশকে উইলিয়াম থমাস ও ডরোথি থমাস প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু এটি যেন মানব ইতিহাসের প্রায় সব সময়েই প্রযোজ্য থেকেছে : "মানুষ যদি কোনো পরিস্থিতিকে বাস্তব বলে সংজ্ঞায়িত করে, তবে তার পরিণতিও বাস্তব হয়ে ওঠে।" রাষ্ট্রগুলো সম্ভাব্য হুমকিকে খুব সহজেই বাস্তব হুমকি হিসেবে ধরে নেয়। সে কারণে, এমন কোনো মহাকাশশক্তির ওপর ভরসা করা—যে সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সামরিক মহাকাশ অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দেবে না—বাস্তবসম্মত বা বুদ্ধিমানের কাজ বলে খুব কমই বিবেচিত হয়।

সামরিক কমান্ডাররা তাদের রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে নির্দেশ পান এমন সক্ষমতা গড়ে তোলার, যা জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে স্পেস ফোর্সের ২০২০ সালের প্ল্যানিং গাইডেন্স ডকুমেন্টের একটি অংশ দেখা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে, "স্পেস ফোর্সকে সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করা হয়েছে এমন বাহিনী হিসেবে, যারা মহাকাশে আমেরিকার কর্মের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম; যৌথ বাহিনীর প্রাণঘাতী ক্ষমতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে... এবং স্পেসপাওয়ার ডিটারেন্সকে সমর্থন করে, এমন সক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে যা শত্রুকে মূল্য দিতে বাধ্য করে এবং প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়।" কথাটি তাদের স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে—আর এই 'বলে দেওয়া' নিজেই কৌশলের একটি অংশ।

এখানেই একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা রয়েছে—একদিকে নিজের সক্ষমতা গোপন রাখা, আর অন্যদিকে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া যে আপনি কতটা শক্তিশালী, যাতে তারা নিবৃত্ত হয়। আপনি যদি সবকিছু গোপন রাখেন, তবে অন্য পক্ষ মনে করতে পারে যে

আক্রমণের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব। ১৯৮০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে অস্ত্র হ্রাস চুক্তিগুলো হয়েছিল, সেগুলোর ভিত্তি ছিল পারস্পরিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা—"বিশ্বাস করো, কিন্তু যাচাই করো", যেমনটি রোনাল্ড রিগ্যান বলেছিলেন। কথাটি তিনি রুশ প্রবাদ 'দোভারিয়াই, নো প্রোভারিয়াই' থেকে ধার করেছিলেন।

আজকের দিনে আমেরিকান সামরিক মহাকাশ কৌশলবিদরা বিতর্ক করছেন—বেইজিং ও মস্কোর সামনে স্যাটেলাইট ধ্বংস করার সক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত কি না, যাতে আকস্মিক আক্রমণ থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যায়। যারা এর পক্ষে, তারা বলেন—অদৃশ্য অস্ত্র দিয়ে কাউকে ভয় দেখানো যায় না। যারা বিপক্ষে, তারা আশঙ্কা করেন—এতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরও ত্বরান্বিত হবে। এই বিতর্ক যুদ্ধের মতোই পুরোনো। ইউএস এয়ার ফোর্সে একে বলা হয় 'গ্রিন ডোর' খোলা—কথিত আছে, এক সময় একটি এয়ার ফোর্স ঘাঁটিতে সবচেয়ে গোপন প্রকল্পগুলোর নথি একটি সবুজ দরজার পেছনে রাখা থাকত।

এখন পর্যন্ত ডিটারেন্স আমাদের 'বড়ো লাল বোতাম' চাপা থেকে বিরত রেখেছে, কারণ মিউচুয়াল অ্যাসিওরড ডেস্ট্রাকশন বা MAD নীতির অধীনে প্রতিটি পক্ষ জানে—পারমাণবিক আঘাত মানেই নিশ্চিত পালটা আঘাত, আর শেষ পর্যন্ত সবারই ধ্বংস। ডলম্যান যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, MAD-এর তিনটি উপাদান রয়েছে : মিউচুয়াল—সবাই জড়িত; অ্যাসিওরড—কোনো সন্দেহ নেই; এবং ডেস্ট্রাকশন—সম্পূর্ণ ধ্বংস। যদি এই হুমকি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে ডিটারেন্স ব্যর্থ হয়।

কিন্তু MAD আমাদের আরও প্রচলিত বা সীমিত যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারে না। মহাকাশেও একই বাস্তবতা প্রযোজ্য। এখনো কেউ 'বড়ো অস্ত্র' ব্যবহার করছে না ঠিকই, কিন্তু এমন অনেক বিকল্প রয়েছে যা মহাকাশে আমাদের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস না করেও সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়—যেমন জ্যামিং, স্পুফিং, স্যাটেলাইট দখল বা হ্যাক করা, যেগুলোতে উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষও তৈরি হয় না। ফলে MAD ডিটারেন্স কাউকে এসব প্রযুক্তি উন্নয়ন বা নিম্নমাত্রার সংঘাতে জড়ানো থেকে আটকায় না—যেগুলো খুব সহজেই বড়ো সংঘাতে রূপ নিতে পারে।

এর বিকল্প পথ হলো একটি ক্রমবর্ধমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা। এটিকে ঠেকাতে হলে প্রয়োজন হবে ধারাবাহিক ও বিস্তৃত অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ চুক্তি।

অসংখ্য হুমকির মধ্যে সবচেয়ে বড়োটি সম্ভবত চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার প্রতিযোগিতা—যাকে ভূরাজনীতিতে 'থুসিডাইডিস ট্র্যাপ' বলা হয়। হার্ভার্ডের অধ্যাপক গ্রাহাম অ্যালিসন তার 'ডেস্টিন্ড ফর ওয়ার' বইয়ে এই ধারণাটি জনপ্রিয় করেন। তিনি থুসিডাইডিসের *হিস্ট্রি অফ দ্য পেলোপনেশিয়ান ওয়ার* থেকে উদ্ধৃতি দেন : "এথেন্সের

উত্থান এবং এতে স্পার্টার যে ভয় জন্মেছিল, সেটিই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।" এথেন্সের জায়গায় চীন আর স্পার্টার জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র বসালেই ছবিটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

অ্যালিসন ইতিহাসে এমন ১৬টি উদাহরণ চিহ্নিত করেছেন, যেখানে একটি উদীয়মান শক্তি বিদ্যমান শক্তিকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। এর মধ্যে ১২টিতেই ফলাফল ছিল যুদ্ধ। যে চারটিতে যুদ্ধ এড়ানো গেছে, সেখানে প্রয়োজন হয়েছিল ব্যতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক কৌশলের—যেমন ১৪৯৪ সালের টর্ডেসিলাস চুক্তি, যেখানে পোপের মধ্যস্থতায় স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ এড়ানো হয়েছিল, অথবা সাম্প্রতিক কালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক, যা পারমাণবিক যুদ্ধের বদলে শীতল যুদ্ধে রূপ নিয়েছিল। সব ক্ষেত্রেই আপোষ ছিল—প্রায়ই অগোছালো ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসহ—কিন্তু মূল কথা হলো, সর্বাত্মক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। এই উদাহরণগুলো স্পেস এজের পরাশক্তিগুলোকেও একই পথে হাঁটতে সাহায্য করতে পারে।

আজ 'বিগ থ্রি'-র—যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার—আপোষে পৌঁছানো জরুরি।

কিন্তু এর বিরুদ্ধে অনেক শক্তিশালী বাধা রয়েছে। চীন ও রাশিয়া মনে করে, মহাকাশে আমেরিকার অগ্রগতি আসলে পৃথিবীতে মার্কিন আধিপত্য টিকিয়ে রাখারই একটি উপায়—কিছু ক্ষেত্রে তারা হয়তো ভুলও নয়। আবার যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা, অন্য দুই দেশের প্রযুক্তিগত সাফল্য সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে ব্যবহৃত হবে, যা শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকেই হুমকির মুখে ফেলবে—এ ক্ষেত্রেও তাদের উদ্বেগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

হুমকি আর পালটা হুমকির ক্ষেত্রে সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন। উদাহরণ হিসেবে রাশিয়া ও চীনের নতুন প্রজন্মের হাইপারসনিক গ্লাইড মিসাইলের কথা ধরা যায়। প্রচলিত আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতো এগুলো নির্দিষ্ট গতিপথে চলে না; বরং ওপরের বায়ুমণ্ডলে ম্যাক ৫-এরও বেশি গতিতে—প্রায় সেকেন্ডে ১.৭ কিলোমিটার—চলতে চলতে দিক ও উচ্চতা বদলাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না, বিশেষ করে যখন কোনো নির্দিষ্ট গতিপথই জানা থাকে না। আর যদি এই ওয়ারহেডে পারমাণবিক অস্ত্র থাকে, তবে একে পারমাণবিক হামলা বলে ধরে নেওয়ার প্রলোভন অনেক বেড়ে যায়—ফলে আঘাত পাওয়ার আগেই পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া দেখানোর ঝুঁকিও বাড়ে।

এই কারণেই যুক্তরাষ্ট্র হাইপারসনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি স্তরিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। পরিকল্পনা হলো—মহাকাশে থাকা সেন্সর দিয়ে এসব মিসাইল শনাক্ত ও

ট্র্যাক করা, একই সঙ্গে সমুদ্র, স্থল ও মহাকাশ থেকে আক্রমণকারীর স্যাটেলাইটে থাকা গাইডেন্স সিস্টেম লক্ষ্যবস্তু করা। আরও নিচে, এমন স্যাটেলাইটের ধারণাও রয়েছে, যেগুলো নিচের দিকে তাক করে মিসাইল ভূপাতিত করতে পারবে।

এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক স্বার্থের সুরক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইতিহাস জুড়েই দেখা গেছে—পতাকা বাণিজ্যের অনুসরণ করে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ২০২২ সালে চীন ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জের চুক্তি, যেখানে বলা হয়েছে দ্বীপগুলোতে চীনা স্বার্থ বিপন্ন হলে চীনা বাহিনী হস্তক্ষেপ করতে পারবে। মহাকাশেও রাষ্ট্রগুলো তাদের বাণিজ্যিক উদ্যোগ রক্ষায় একই মনোভাব গ্রহণ করবে—পতাকা বাণিজ্যের পেছনেই যাবে।

তাহলে সমাধান কী? অধ্যাপক ডলম্যান একটি ভিন্ন পথের কথা বলেন—মিউচুয়াল অ্যাসিওরড রিলায়েন্স বা পারস্পরিক নিশ্চিত নির্ভরতার কৌশল। তার যুক্তি হলো, মহাকাশ স্বভাবতই বৈশ্বিক; এটি কার্যত মহাবিশ্বের একটি যৌথ ক্ষেত্র। তাই মহাকাশ থেকে অর্জিত লাভ বা ক্ষতি শেষ পর্যন্ত সব রাষ্ট্রের মধ্যেই ভাগ হবে—সমানভাবে না হলেও। মহাকাশে প্রবেশাধিকার হারানোর ভয়ের দিকে তাকিয়ে না থেকে, বরং সব রাষ্ট্রকে মহাকাশ ব্যবহারের সুফলের অংশীদার করা উচিত, যাতে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে।

আমাদের অনেকেই হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত। আসল সমস্যা হলো—সেখানে পৌঁছানো। অস্ত্র পরীক্ষা, কিলার স্যাটেলাইট, সম্ভাব্য সামরিক স্পেস স্টেশন ও ঘাঁটির এই পর্যায় অতিক্রম করে কীভাবে সেই ভবিষ্যতে যাওয়া যায়।

বিশ শতকের ফরাসি দার্শনিক রেমন্ড অ্যারন হয়তো চার দশকেরও বেশি আগে মারা গেছেন, আমাদের আধুনিক প্রযুক্তিগত বিস্ময়গুলোর অনেক আগেই। তবুও তিনি মানুষের এক প্রাচীন সমস্যাকে চিহ্নিত করেছিলেন : "মানুষের হৃদয়ে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে বিপ্লব ছাড়া—কোন অলৌকিক উপায়ে আন্তঃগ্রহীয় মহাকাশকে সামরিক ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব?"

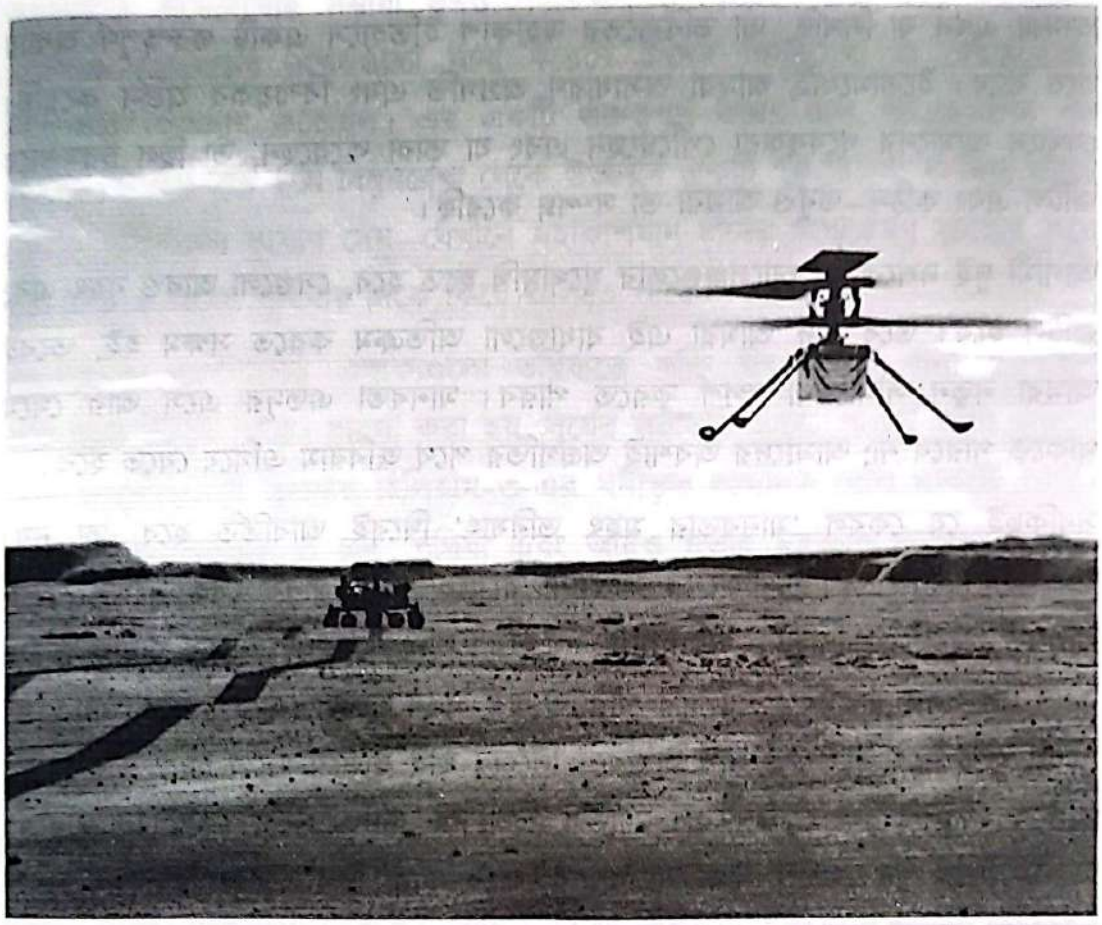
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

অধ্যায়-১০

আগামী দিনের পৃথিবী (TOMORROW'S WORLD)

"আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছিলাম, যতদূর মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়;
দেখেছিলাম পৃথিবীর এক স্বপ্নময় ছবি, আর তার সব আশ্চর্য সম্ভাবনা।"

— আলফ্রেড, লর্ড টেনিসন, ১৮৪২



১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করা পারসিভিয়ারেন্স রোভার ও মার্স হেলিকপ্টার ইনজেনুইটির একটি চিত্র। ইনজেনুইটি ইতিহাস সৃষ্টি করে লাল গ্রহের আকাশে প্রথমবারের মতো নিয়ন্ত্রিত ও শক্তিচালিত উড্ডয়ন সফলভাবে সম্পন্ন করে।

যা আগে ছিল দূরবর্তী, আজ তা নিকটে; যা আগে ধীরে ধীরে ঘটত, আজ তা ঝড়ের মতো দ্রুত ঘটে যায়; যা অসম্ভব মনে হতো, আজ তা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকাশ ও ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের চিন্তা সীমিত হওয়া উচিত নয়—শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার কারণে। এখানে দুটি বিশ্বাসের তুলনা করা যায়।

প্রথমটি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি : "আমি সর্বদা অনুভব করেছি যে আমার নিয়তি হলো এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করা যা মানুষকে উড়তে দেবে।"

আর আরেকটি হল কানাডিয়ান-আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী সাইমন নিউকম্বের কথা, যিনি ১৯০২ সালে বলেছিলেন : 'বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্র দ্বারা উড্ডয়ন অবাস্তব, এমনকি পুরোপুরি অসম্ভবও হতে পারে। পরের বছর অরভিল রাইট কিটি হক (Kitty Hawk) থেকে উড্ডয়ন করেন এবং দা ভিঞ্চি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করেছিলেন তার দিকে উড়ে যান।

আমরা এখন যা লিখছি, তা ভবিষ্যতের মহাকাশ ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে যাবে। ইতোমধ্যেই আমরা অসাধারণ অগ্রগতি এবং বিস্ময়কর অর্জন করেছি। যেখানে আমাদের গবেষকরা পৌঁছেছেন এবং যা তারা করেছেন, তা ছিল চরমভাবে জটিল এবং কঠিন—তবুও আমরা তা সম্পন্ন করেছি।

আগামী দুই দশকে যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হবে, সেগুলো আরও বৃহৎ এবং জটিল হবে। তবে যদি আমরা এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে সক্ষম হই, তবেই আমরা নতুন সীমারেখা স্পর্শ করতে পারব। মানবতা এতদূর এসে আর থেমে থাকতে পারবে না; আমাদের অবশ্যই অগ্রগতির পথে অবিরাম এগিয়ে যেতে হবে।

সবকিছুই যে কেবল 'মানবতার মহৎ ভবিষ্যৎ' ঘিরেই আবর্তিত হবে, তা নয়। মহাকাশে বিপুল অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, আর মানুষ সেই সুযোগ কাজে লাগাতে আগ্রহী। বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও কম নয়। যদি সাধারণ মানুষের জন্য মহাকাশ ভ্রমণ একসময় স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়, তবে স্পেস হোটেল গড়ে ওঠাও খুব দূরের কথা হবে না। লো আর্থ অরবিটে নিজের ছাই ছড়িয়ে দিতে চান? তার জন্যও থাকবে 'গ্যালাকটিক ফিউনারেল সার্ভিস'। আবার যদি কোনো কোম্পানি মানুষের বিরক্তি নিয়ে খুব একটা মাথা না ঘামায়, তবে তারা দিগন্তজোড়া বিজ্ঞাপন বসিয়ে আমাদের রাতের আকাশকেও নষ্ট করে দিতে পারে।

আর যদি এসব আপনার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু না হয়, তবে নতুন প্রযুক্তিগুলো হয়তো আরও অর্থবহ বলে মনে হবে। উদাহরণ হিসেবে টেকশট (Techshot)-এর

CamScanner

বায়োফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটির কথা বলা যায়, যেটি লো আর্থ অরবিটে মানব অঙ্গ প্রিন্ট করার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার আশা করা হচ্ছে। এতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত সমস্যাগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে—কারণ সেই মাধ্যাকর্ষণ কোষ ও টিস্যুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

এই ভবিষ্যতের পথে প্রথম বড়ো পদক্ষেপটি নেওয়া হবে, যখন আমরা আবার চাঁদে ফিরে যাব। সেখানে পৌঁছানোর পর যে তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হবে, তার অনেকগুলিই পৃথিবীতে মানবসভ্যতা দীর্ঘদিন ধরে মোকাবিলা করে আসছে—খাদ্য, পানি এবং আশ্রয়। তবে চাঁদে এগুলোর সঙ্গে আরও দুটি গুরুতর বিষয় যুক্ত হবে : শ্বাস নেওয়ার উপযোগী বাতাস তৈরি করা এবং সেই প্রক্রিয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎস খুঁজে বের করা—আর তা করতে হবে পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৮৫,০০০ কিলোমিটার দূরে।

অগ্রগামীরা ইতোমধ্যেই সম্ভাব্য ভূখণ্ড পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছেন। প্রাথমিক অ্যাপোলো মিশনগুলো নানা কারণে চাঁদের বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবতরণ করেছিল। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, উৎক্ষেপণের পর কোনো সিস্টেম ব্যর্থ হলে বিষুবরেখা থেকে উড্ডয়ন একটি 'ফ্রি-রিটার্ন' বা বিনা খরচে ফেরার গতিপথের সুযোগ দেয়—যেখানে মহাকাশযান চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে ঘুরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে পারে।

বিষুবরেখার আশপাশের এলাকাগুলো ভবিষ্যতে শক্তি উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। ধারণা করা হয়, সূর্যের সরাসরি আলো পাওয়া এসব অঞ্চলে মেরু এলাকাগুলোর তুলনায় হিলিয়াম-৩-এর ঘনীভূত আমানত বেশি থাকতে পারে। আর যেহেতু হিলিয়াম-৩ চাঁদ, পৃথিবী এবং আরও গভীর মহাকাশ অন্বেষণের জন্য এক সম্ভাবনাময় শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে (অধ্যায় ৩ দেখুন), তাই এই অঞ্চলগুলোর গুরুত্ব ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

তবে, ২০৩০ এবং ২০৪০-এর দশকে চাঁদের বিষুবরেখা সম্ভবত মূল কর্মক্ষেত্র হবে না। যখন আমরা বসবাসের জন্য জায়গা খুঁজছি—তখন মনে রাখতে হবে পুরনো রিয়েল এস্টেটের নীতি : *লোকেশন, লোকেশন, লোকেশন*। রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা একটি ঘরের 'চমৎকার প্রাকৃতিক আলো' নিয়ে প্রশংসা করতে পারে, এমনকি তা একটি ঘন কয়লার গুদাম হলেও। ঠিক তেমনি, তারা আপনাকে চাঁদের বিষুবরেখার কাছের একটি সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইতে পারে, কারণ সেখানে দুই সপ্তাহ ধরে

সত্যিই ধ্রুবক প্রাকৃতিক আলো থাকবে। কিন্তু পরবর্তী দুই সপ্তাহ হবে ধ্রুবক প্রাকৃতিক রাত।

এর কারণ চাঁদের ঘূর্ণন। চাঁদ প্রায় এক পৃথিবী মাসে একবার নিজেকে ঘুরে ফেলে, তাই একটি চন্দ্র দিন বা রাত প্রায় ১৪ পৃথিবী দিনের সমান সময় ধরে চলে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আপনি যদি বিষুবরেখার পড বা কুঠুরি থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তবে সূর্য পুরো আকাশে সরে যেতে, অদৃশ্য হতে এবং আবার তার মূল অবস্থানে ফিরে আসতে প্রায় ২৯.৫ দিন সময় নেবে। এর অর্থ, চাঁদে দুই সপ্তাহ ধ্রুবক আলো, তারপর দুই সপ্তাহ ধ্রুবক অন্ধকার। ফলস্বরূপ, আপনার ব্যাটারি রিচার্জের জন্য চাঁদে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা অপরিহার্য।

এছাড়া, বিষুবরেখার তাপমাত্রা চরম। চন্দ্র দিনের সময়ে এটি প্রায় ১২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হয়ে যায় এবং চন্দ্র রাতে প্রায় -১৭৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। বৈজ্ঞানিকভাবে বললে, এটি 'স্কর্চিং হট' থেকে 'ফ্রিজিং' পর্যায়ে চলে যায়। এখানে একটি মজার ইংরেজি বাগধারা আছে, যা চাঁদের ইতিহাসে কাজে লাগতে পারে। রাজকীয় নৌবাহিনীর কামানের গোলাগুলো পিতলের ট্রেতে পিরামিড আকারে সাজানো থাকত এবং মাঙ্কি নামে পরিচিত ছিল। চরম ঠান্ডায়, পিতল সংকুচিত হয়ে পিরামিড ধসে পড়ত—যদিও এটি পুরোপুরি সত্য নয়। মূল ধারণা হলো তাপমাত্রার ওঠানামা ধাতু প্রসারিত বা সংকুচিত করে, যা মহাকাশযান, অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং বসবাসের জিনিসপত্রের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

এটি প্রধান কারণ যে চাঁদে প্রথম মানুষ এবং রোবট সবসময় চন্দ্র ভোরে অবতরণ করেছিল—চন্দ্র দিনের শুরুতে, যখন তাপমাত্রার চরম ওঠানামা সীমিত থাকে। সরঞ্জামগুলো চরম তাপমাত্রা সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা যায়, কিন্তু বিশাল ওঠানামার সঙ্গে সামঞ্জস্য করার জন্য নয়।

বিষুবরেখার এই অসুবিধার কারণে, পরবর্তী চাঁদযানগুলো চন্দ্র মেরুগুলোতে অবতরণ করার সম্ভাবনা বেশি। মেরুগুলো স্থায়ী বসতির জন্য উপযুক্ত—এগুলো তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা হলেও তাপমাত্রার ওঠানামা অনেক কম এবং কিছু জায়গায় আধা-স্থায়ীভাবে সূর্যের আলো থাকে, যা বসতি ও শক্তি উৎপাদনের জন্য সুবিধাজনক।

যেমনটি আমরা দেখেছি, বিজ্ঞানীরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুর 'সাউথ পোল–আইটকেন' অববাহিকায় সম্ভাব্য বসতি স্থাপনের জায়গা খুঁজছেন। এই অঞ্চলে সূর্য খুব কমই দিগন্তের ওপরে ওঠে, ফলে সূর্যালোক গর্তগুলোর গভীর অংশে পৌঁছাতে পারে না। এর ফলে এসব গর্তের বেশিরভাগই কোটি কোটি বছর ধরে ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই স্থায়ী ছায়াযুক্ত এলাকাগুলোতে বরফ জমে থাকতে পারে, যা থেকে অক্সিজেন, পানি ও হাইড্রোজেন উৎপাদন সম্ভব—আর এগুলোই হবে ভবিষ্যৎ চন্দ্রঘাঁটির জন্য প্রয়োজনীয় রকেট জ্বালানি ও জীবনধারণের মূল উপাদান।

নাসার বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ মেরুর প্রায় ৬ ডিগ্রি অক্ষাংশের ভেতরে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনাময় অঞ্চল শনাক্ত করেছেন, যেগুলোকে তারা প্রথম মানবঘাঁটি স্থাপনের জন্য উপযোগী বলে মনে করছেন। প্রতিটি অঞ্চল প্রায় ১৫ বাই ১৫ কিলোমিটার আয়তনের এবং সেখানে একাধিক সম্ভাব্য অবতরণস্থল রয়েছে। যদিও সূর্য আকাশে খুব নিচু অবস্থানে থাকে, তবুও এটি প্রথম বসতি স্থাপনকারীদের জন্য সোলার প্যানেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে, যা তাদের নতুন যাত্রা শুরু করতে সহায়তা করবে।

যেহেতু যেকোনো বসবাসযোগ্য স্থানের জন্য শ্বাসযোগ্য অক্সিজেন অত্যন্ত জরুরি, তাই সৌভাগ্যক্রমে চাঁদে এর একটি সম্ভাব্য উৎসও রয়েছে—চাঁদের ওপরের মাটি, যাকে রেগোলিথ (regolith) বলা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে চাঁদের ওপর অবিরাম উল্কাপাতের ফলে এর পৃষ্ঠের গঠন বদলে গেছে। কয়েকশো পাউন্ড ওজনের শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়েও এই বিশাল সব আঘাতের চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যায়। চাঁদের পৃষ্ঠজুড়ে রয়েছে অসংখ্য বড়ো বড়ো গর্ত। তবে চোখে দেখা যায় না এমন লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের আঘাত ওপরের মাটিকে বালির মতো গুঁড়ো করে দিয়েছে—যদিও এই কণাগুলো পৃথিবীর বালির তুলনায় অনেক বেশি ধারালো ও ঘষামাজা প্রকৃতির। রেগোলিথ চাঁদের পুরো পৃষ্ঠ জুড়ে বিস্তৃত থাকায়, এটি সংগ্রহ করতে চাঁদের দূরতম প্রান্তে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

রেগোলিথকে একটি পাত্রে রেখে অত্যন্ত উচ্চ তাপে সেঁকলে (bake), তার সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করলে—আর প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করলে—জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। এই জলীয় বাষ্পকে পরে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে আলাদা করা যায়। এরপর... শ্বাস নেওয়া সম্ভব।

আর শ্বাস ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ—কারণ নভোচারীদের নিঃশ্বাস থেকেও অক্সিজেন পুনরুদ্ধার করা যায়। এমনকি তাদের ঘাম ও প্রস্রাব থেকেও অক্সিজেন ও পানি পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব, যা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস)-এর জন্য ইতোমধ্যেই উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে। নভোচারী ডগলাস এইচ. হুইলক নিউইয়র্ক টাইমসকে যেমন রসিকতার সুরে বলেছিলেন, "আইএসএস-এ গতকালের কফিই হলো আগামীকালের কফি।"

সুতরাং আলো, পানি, অক্সিজেন ও শক্তি—এই মৌলিক উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এখন আর সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর ওপর নির্ভরশীল নই। এবার যেটির প্রয়োজন, তা হলো নিরাপদ আশ্রয়। প্রাথমিকভাবে এই আশ্রয়গুলো সম্ভবত পৃথিবী থেকে আনা ফ্ল্যাটপ্যাক বা ফোলানো কাঠামো দিয়ে তৈরি হবে। চাঁদের ওপর আছড়ে পড়া বিপুল মাত্রার বিকিরণ থেকে বাসিন্দাদের সুরক্ষা দিতে এসব কাঠামোর ওপর রেগোলিথের স্তর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

চীনের একটি চন্দ্র মিশনে জার্মানিতে নির্মিত একটি পরীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায় যে, বায়ুমণ্ডল না থাকায় চাঁদের পৃষ্ঠে বিকিরণের মাত্রা পৃথিবীর পৃষ্ঠের তুলনায় প্রায় ২০০ গুণ বেশি। সৌভাগ্যবশত, রেগোলিথ সৌর বিকিরণ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর এবং এর তাপ পরিবাহিতা কম। এর অর্থ হলো, চন্দ্রঘাঁটির দেয়াল ও ছাদের ওপর এক ধরনের 'নুড়ি-আস্তরণ' (pebble-dash) হিসেবে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যা ভেতরের পরিবেশকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখবে।

একবার প্রাথমিক ঘাঁটি কার্যকর হয়ে উঠলে, তখন আশ্রয়ের অন্যান্য বিকল্পও বিবেচনায় আনা যাবে—যার মধ্যে রয়েছে তথাকথিত 'বেসমেন্ট ফ্ল্যাট'। চাঁদে বর্তমানে প্রায় ২০০টির মতো গর্ত বা পিট চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো থেকে গুহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই গুহাগুলোর অনেকগুলোর ভেতরে তাপমাত্রা প্রায় স্থায়ীভাবে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে—যাকে বিজ্ঞানীরা রসিকতার ছলে 'সোয়েটার ওয়েদার', অর্থাৎ সোয়েটার পরার উপযোগী আবহাওয়া বলে থাকেন। ধারণা করা হয়, গুহার মুখে ঝুলে থাকা পাথরের স্তর দিনের বেলায় অতিরিক্ত তাপ ঢুকতে বাধা দেয় এবং রাতে ভেতরের তাপ বের হয়ে যেতে দেয় না।

জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উপসংহার টানা হয়েছে যে, "চন্দ্র গুহাগুলো চাঁদের দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধান ও বসবাসের জন্য একটি নাতিশীতোষ্ণ, স্থিতিশীল এবং নিরাপদ তাপীয় পরিবেশ প্রদান করবে।" চাঁদের কিছু লাভা টিউব পৃথিবীতে পাওয়া টিউবগুলোর মতোই—যেখানে একসময় প্রবাহিত লাভা ঠান্ডা হয়ে দীর্ঘ, ফাঁপা সুড়ঙ্গ রেখে গেছে, আর সেখান থেকেই অনেক গুহার উৎপত্তি হয়েছে। নাসা ও ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ)-এর নভোচারীরা ইতোমধ্যেই মাটির নিচে অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

এই প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দলগুলোকে স্পেনের ল্যানজারোট দ্বীপের লাভা টিউবগুলোতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তারা ভূখণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, সুড়ঙ্গের ভেতর চন্দ্র রোভার চালানোর অনুশীলন করছে এবং চলাচলের উপযোগিতা যাচাই

CamScanner

করতে পরিবেশের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করছে। এতে এক ধরনের পরিহাস রয়েছে—মানবসভ্যতা গুহা ছেড়ে বাইরে এসে ঘরবাড়ি নির্মাণ শুরু করার এত দীর্ঘ সময় পরে, আবার গুহায় ফিরে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির আশ্রয় নিচ্ছে।

যখন পানি, অক্সিজেন ও শক্তির নির্ভরযোগ্য উৎস স্থাপন করা হবে এবং বাসস্থান ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য গ্রিনহাউসগুলো গড়ে উঠবে, তখন অল্প সময়ের মধ্যেই মনোযোগ সরে যাবে চাঁদের বিপুল মজুত বিরল মৃত্তিকা উপাদান (rare earth elements) আহরণের দিকে।

এসবই মূলত আগামী দশ বছরের একটি সামগ্রিক টেমপ্লেট বা রূপরেখার অংশ। আর্মস্ট্রংয়ের সেই ঐতিহাসিক 'বিশাল লাফ' বা *জায়ান্ট লিপ*-এর পর এখন আমরা এগোচ্ছি ধারাবাহিক 'বেবি মুনস্টেপ'-এর মাধ্যমে—চাঁদে ছোটো ছোটো, কিন্তু ধারাবাহিক পদক্ষেপে। এই পথ আমাদের এমন এক ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে, যেখানে মানুষ শুধু পৃথিবীর বাসিন্দা নয়, বরং অন্য গ্রহেরও নাগরিক হবে। সে পথ অবশ্যই দীর্ঘ ও কঠিন। সেখানে পৌঁছাতে আমাদের অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে—বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের বিকিরণ ও কম মাধ্যাকর্ষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার মতো জটিল বিষয়গুলো। তবু যাত্রা শুরু হয়ে গেছে।

এবার দৃষ্টি মঙ্গলের দিকে। চাঁদ থেকে উৎক্ষেপণ করলে পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যকার বিপুল দূরত্ব খুব একটা কমে না, তবে আগেই আলোচনা করা হয়েছে—এতে প্রয়োজনীয় জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায়। মঙ্গলে চাঁদের মতো প্রায় সব সমস্যাই রয়েছে, তার সঙ্গে আরও বহু জটিলতা যুক্ত হয়েছে, আর দূরত্বও গড়ে প্রায় ৬০০ গুণ বেশি। তাই মঙ্গলে মানুষ পাঠানো নিঃসন্দেহে আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ।

এই যাত্রার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণই সবকিছু। পৃথিবী ও মঙ্গল যখন একে অপরের সবচেয়ে কাছাকাছি আসে, তখন যাত্রা শুরু করাই সবচেয়ে কার্যকর। দুটি গ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কারণে এমন সুযোগ আসে প্রতি ২৬ মাসে একবার। আপনি যদি সেই আদর্শ যাত্রা ধরতে চাইতেন, তবে জেনে রাখা ভালো—গত ৬০ হাজার বছরের মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানটি ছিল ২০০৩ সালে, যা ইতোমধ্যেই পেরিয়ে গেছে। ২২৮৭ সালের আগে তারা আর এতটা কাছাকাছি আসবে না।

ধরা যাক, আপনার কাছে এমন একটি যান আছে যা মহাকাশে ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে—তাহলে মঙ্গলে পৌঁছাতে লাগবে প্রায় ২৫৬ বছর,

CamScanner

আর পথে অসংখ্যবার 'আর কত দূর?' প্রশ্ন শুনতে হবে। আবার যদি আলোর গতিতে চলতে পারে এমন কোনো যান থাকত, তবে কয়েক মিনিটেই কাজ সারা যেত। বাস্তবে অবশ্য তা সম্ভব নয়। পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপিত আধুনিক স্পেস প্রোবগুলো সাধারণত ১২৮ থেকে ৩৩৩ দিনের মধ্যে মঙ্গলে পৌঁছায়। অর্থাৎ মানুষকে প্রায় নয় মাস একটি চাপযুক্ত ধাতব পাত্রের ভেতর আবদ্ধ অবস্থায় কাটানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর যদি ফিরে আসার পরিকল্পনাও থাকে, তবে সময়সীমা আরও দীর্ঘ হবে। কারণ মঙ্গলে পৌঁছানোর পর কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে—যতক্ষণ না পৃথিবী ফেরার যাত্রার জন্য সঠিক অবস্থানে আসে। আপনি যদি সে সময় উড্ডয়ন না করে সূর্যের চারপাশে আপনার কক্ষপথ ধরে এগিয়ে যান, তবে যখন আবার পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরবেন, তখন পৃথিবী সেখানে নাও থাকতে পারে। যা নিঃসন্দেহে সমস্যাজনক।

২০২২ সালে ইলন মাস্ক মঙ্গলে প্রথম মানুষের অবতরণের লক্ষ্য তারিখ ২০২৯ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেন। এটি সেই বছরগুলোর একটি, যখন পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যকার দূরত্ব কমে প্রায় ৯৭ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটারে দাঁড়ায়। গড় দূরত্ব যেখানে প্রায় ২২৫ মিলিয়ন কিলোমিটার, সেখানে এটি তুলনামূলকভাবে অনেক ছোটো পথ। আপনি যদি ভবিষ্যতে টিকিট কাটার কথা ভাবেন, তবে আপনার ডায়েরি ও বাড়ি বিক্রির পরিকল্পনায় এই তারিখগুলো কাজে লাগতে পারে : মে ২০৩১, জুন ২০৩৩, সেপ্টেম্বর ২০৩৫, নভেম্বর ২০৩৭ এবং জানুয়ারি ২০৪০। আর যদি আপনি মঙ্গলে যাত্রাকারী দশ লক্ষতম মানুষ হতে চান, তবে আগস্ট ২০৫০ লক্ষ্য রাখতে পারেন। সে বছর মাস্ক তার ঊনআশীতম জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন—সম্ভবত মঙ্গলে। অথবা সম্ভবত নয়।

মঙ্গল মানুষের কাছে এক ধরনের 'মহা-আকাঙ্ক্ষা'। যখনই কেউ মনুষ্যবাহী অবতরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করে, বাস্তবতার খাতিরে তার সঙ্গে অন্তত পাঁচ বছর যোগ করে নেওয়াই ভালো। ইন্টারনেট ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের অসংখ্য নিবন্ধে ভরে আছে, যেখানে বলা হয়েছিল মানুষ ২০২০-এর দশকেই মঙ্গলের পৃষ্ঠে পৌঁছে যাবে। ডাচ কোম্পানি মার্স ওয়ান ২০২৩ সালে মানুষ নামানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার তুলেছিল, কিন্তু ২০১৯ সালেই প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া হয়ে যায়। নাসা বর্তমানে বলছে, ২০৩৩ সাল মানুষের মঙ্গল প্রদক্ষিণের জন্য একটি 'সম্ভাব্য' সময়, আর পৃষ্ঠে অবতরণের ক্ষেত্রে তারা

২০৩৯ সালকে লক্ষ্য করছে। চীন ২০৪০ থেকে ২০৬০ সালের মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত সময়রেখা নির্ধারণ করেছে—দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় তারা বরাবরই স্বচ্ছন্দ।

এরই মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক রোভারগুলো মঙ্গলের পৃষ্ঠ অনুসন্ধান ও মানচিত্রায়নের কাজ শুরু করেছে। নাসার কিউরিসিটি রোভার ২০১২ সালে পৌঁছানোর পর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। পারসেভারেন্স কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও, ২০২১ সালে অবতরণের পর থেকে এটি প্রায় ১৫ কিলোমিটার অগ্রসর হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে চীনের ঝুরং রোভার। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ) ২০২৮ সালে নিজেদের রোভার পাঠানোর আশা করছে। ব্রিটিশ ডিএনএ গবেষণার পথিকৃৎ রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনের নামে নামকরণ করা ব্রিটিশ-নির্মিত 'রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন' রোভারটি ২০২২ সালে একটি রুশ রকেটে উৎক্ষেপণের কথা ছিল, কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

প্রথম মানুষ মঙ্গলে পৌঁছানোর আগেই সম্ভবত সেখানে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে যাবে। রোবোটিক মহাকাশযানগুলো ভারী কাজগুলো সম্পন্ন করবে—অবতরণ করবে, অবকাঠামো গড়ে তুলবে—যাতে নভোচারীরা নিজেদের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও রসদ বেশি করে বহন করতে পারে। পাশাপাশি, কক্ষপথে বা পৃষ্ঠে পর্যাপ্ত জ্বালানি-সহ একটি যান রেখে দেওয়া যেতে পারে, যাতে ফিরতি যাত্রা নিশ্চিত হয় এবং নভোচারীদের শুরুতেই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি বহন করতে না হয়।

মঙ্গলে প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা যে বড়ো সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হবে, তার একটি হলো তীব্র শীত। রাতের বেলায় তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে মাইনাস ৬৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। আরেকটি বড়ো সমস্যা হলো শ্বাস নেওয়ার মতো অক্সিজেনের ভয়াবহ অভাব। অবশ্যই অক্সিজেন তৈরির প্রযুক্তি আমাদের জানা আছে—যেমনটি আমরা চাঁদে প্রয়োগ করার পরিকল্পনা করছি—but তা আমাদের ছোটো ও সীমিত আশ্রয়ের মধ্যেই আটকে রাখবে, পূর্ণাঙ্গ গ্রহবাসের সুযোগ দেবে না। তাই আসে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধারণা : গ্রহটিকে বাসযোগ্য করে তোলা, অর্থাৎ টেরাফর্মিং।

'মঙ্গলে পারমাণবিক বোমা ফেলো!'—২০১৯ সালে মাস্ক এমনটাই টুইট করেছিলেন। ধারণাটি হলো, মাটিতে ও মেরু অঞ্চলে জমে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে মুক্ত করে একটি গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টি করা, যাতে গ্রহটি উষ্ণ হয়—এখানে জলবায়ু পরিবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে সব বিজ্ঞানী এতে একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন, পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডল উষ্ণ

করার মতো পর্যাপ্ত কার্বন ডাই অক্সাইড সেখানে নেই, বরং এতে উলটো একটি পারমাণবিক শীত সৃষ্টি হতে পারে। তবুও এটি একটি ধারণা। আর মাস্কের ভাষায়, "ব্যর্থতা একটি বিকল্প।"

মাস্ক একজন চির আশাবাদী মানুষ। তিনি ২০৫০ সালের মধ্যে মঙ্গলে এক মিলিয়ন—হ্যাঁ, দশ লক্ষ—মানুষের একটি শহর গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির করেছেন। এটি কোনো ছাপার ভুল নয়। এক মিলিয়ন মানুষ।

পরিকল্পনাটি হলো এমন : ইলন মাস্ক তার পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্টারশিপ রকেটের এক হাজারটি তৈরি করবেন। প্রথম অগ্রগামীরা সেখানে গিয়ে মৌলিক অবকাঠামো গড়ে তুলবে। এরপর আপনি একটি টিকিট কিনবেন, সেই রাইডে চড়বেন এবং লাল গ্রহে গিয়ে একটি চাকরি নেবেন। মাস্ক প্রকাশ্যেই বলেছেন, তার লক্ষ্য টিকিটের দাম একটি গড় বাড়ির দামের কাছাকাছি নামিয়ে আনা। যাদের নিজস্ব বাড়ি আছে, তারা প্রয়োজনে সেটি বিক্রি করেই খরচ জোগাতে পারবেন। সর্বোপরি, ফিরে আসার সম্ভাবনা আলবুকার্ক থেকে ডেনভারে স্থানান্তরিত হওয়ার চেয়ে সামান্যই কম—এ কথাও মাস্ক স্বীকার করেছেন।

তিনি এমনকি প্রস্তাব দিয়েছেন, টিকিট বিক্রির বিজ্ঞাপনগুলো আর্নেস্ট শ্যাকলটনের অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের ঐতিহাসিক বিজ্ঞাপনের আদলে হতে পারে: "বিপজ্জনক যাত্রার জন্য লোক প্রয়োজন। স্বল্প মজুরি, প্রচণ্ড ঠান্ডা, দীর্ঘ মাস সম্পূর্ণ অন্ধকার, ধ্রুবক বিপদ, নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সন্দেহজনক। সাফল্যের ক্ষেত্রে সম্মান ও স্বীকৃতি।"

মাস্ক আরও বলেছেন, তার জীবদ্দশায় কোনো এক সময় একটি রকেট তাকে মঙ্গলে নিয়ে যাবে—তার কল্পিত স্বয়ংসম্পূর্ণ শহরে—এমন সম্ভাবনা তিনি ৭০ শতাংশ বলে মনে করেন। এটি বিশ্বাস করা কঠিন হলেও, মাস্ককে কৃতিত্ব দিতেই হয়। তার নানা সীমাবদ্ধতা ও বিতর্ক সত্ত্বেও, তিনি স্বপ্ন দেখার সাহস রাখেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, "জীবন শুধু সমস্যা সমাধানের বিষয় হতে পারে না। এমন কিছু থাকতে হবে যা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে, যা আপনার হৃদয়কে নাড়া দেয়।" আর তার বলা একটি বিখ্যাত লাইন হলো, "আমি মঙ্গলে মরতে চাই। তবে আছড়ে পড়ে নয়।"

মাস্ক এবং তার সহযাত্রীদের যাত্রাপথে সুস্থ থাকার একটি উপায়ও প্রয়োজন হবে। দীর্ঘ সময় মাধ্যাকর্ষণহীন পরিবেশে থাকার ফলে অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। স্বল্পমেয়াদে রয়েছে 'স্পেস সিকনেস' বা মহাকাশজনিত অসুস্থতা—যার লক্ষণ হিসেবে

CamScanner

বমি, মাথা ঘোরা, দিশেহারা ভাব এবং এমনকি হ্যালুসিনেশনও দেখা দিতে পারে। সাধারণত কয়েক দিনের মধ্যে এগুলো কমে যায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলো শূন্য মাধ্যাকর্ষণে প্রতি সপ্তাহ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুতর হয়ে ওঠে।

মানবদেহের প্রায় ৬০ শতাংশই তরল এবং মাধ্যাকর্ষণের কারণে এই তরল সাধারণত শরীরের নিচের অংশে জমা থাকে। মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সোজা হয়ে হাঁটার ফলে আমাদের শরীর এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে দাঁড়িয়ে থাকার সময় হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত পৌঁছায়। কিন্তু বিবর্তন কয়েক মাসের মহাকাশযাত্রার জন্য হঠাৎ করে থেমে যায় না। ফলে মাধ্যাকর্ষণ না থাকলেও এই ব্যবস্থাগুলো কাজ করতে থাকে। এর ফল হিসেবে শরীরের ওপরের অংশে তরল জমে যায়, যার কারণে নভোচারীদের মুখ ফোলা দেখায়। আরও গুরুতর সমস্যা হলো, মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে হৃদপিণ্ডকে অতটা জোরে রক্ত পাম্প করতে হয় না, ফলে এটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। একই অবস্থা শরীরের অন্যান্য পেশির ক্ষেত্রেও হয়—সবগুলোই ক্ষয় হতে শুরু করে। দুর্বল হৃদপিণ্ড মানে রক্তচাপ কমে যাওয়া, আর তার ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ হ্রাস পাওয়া। এটি কোনো অবস্থাতেই আদর্শ নয়, বিশেষ করে যদি আপনি রকেট বিজ্ঞানের মতো সূক্ষ্ম কাজে জড়িত থাকেন।

ওজনহীন পরিবেশে আমাদের হাড়ও দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যেসব হাড় সাধারণত ভার বহন করে—যেমন মেরুদণ্ডের নিচের অংশ ও নিতম্বের হাড়। মহাকাশে মাত্র ছয় মাস থাকার পর একজন নভোচারীর হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে তিন বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

এই কারণেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) আমরা নভোচারীদের নিয়মিত ব্যায়ামের যন্ত্র ব্যবহার করতে দেখি। একটি সুইমিং পুল হলে ভালো হতো, যদিও তা বাস্তবায়ন করা বেশ ঝামেলাপূর্ণ—আর পানি হয়তো ততটা সহযোগিতা করত না। একটি জিম তুলনামূলকভাবে ছোটো, কিন্তু সেটিও অতিরিক্ত ওজন যোগ করে। এই সমস্যাগুলো মঙ্গলেও থাকবে, যদিও কিছুটা কম মাত্রায়। কারণ মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর প্রায় ৩৮ শতাংশ।

পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করা আরেক মহাকাশ-স্বপ্নদ্রষ্টা, মাস্কের প্রতিদ্বন্দ্বী জেফ বেজোস, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সমস্যার দিকে নজর দিচ্ছেন—যাকে তিনি বলেন 'দীর্ঘ-পাল্লার সমস্যা'। তার মতে, একদিন পৃথিবী তার শক্তির উৎস নিঃশেষ করে ফেলবে। এর সমাধান হিসেবে তিনি প্রস্তাব করেন মহাকাশে বসতি গড়ে তোলার। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী জেরার্ড ও'নিলের বই *দ্য হাই ফ্রন্টিয়ার* থেকে অনুপ্রাণিত

হয়ে বেজোস পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে মাইল-চওড়া, সিল করা, চাকার মতো ঘূর্ণায়মান শহরের কল্পনা করেন। এসব শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করতে পারবে, আর আলাদা কাঠামোতে থাকবে ভারী শিল্পকারখানা—ফলে পৃথিবী মানুষ ও দূষণ দুটো থেকেই মুক্তি পাবে।

বেজোস স্বীকার করেন, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বাস্তবায়ন হতে এখনো কয়েক দশক সময় লাগবে। তবু তিনি বলেন, তার কোম্পানি এখনই অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করবে। তার মহাকাশ সংস্থা ব্লু অরিজিন জানিয়েছে, তারা এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বাণিজ্যিক স্পেস স্টেশন উৎক্ষেপণের পথে রয়েছে, যেখানে প্রায় ৮৫০ ঘনমিটার জায়গায় সর্বোচ্চ দশজন মানুষ থাকতে পারবে।

এই মহাকাশ শহরগুলোকে ঘূর্ণায়মান হতে হবে, যাতে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করা যায়। এটি দীর্ঘ সময় কম বা শূন্য মাধ্যাকর্ষণে থাকার ফলে সৃষ্ট বহু স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, মহাকাশে একজন নারীর স্বাভাবিক গর্ভধারণ আদৌ সম্ভব কি না—এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ কারণেই মার্স ওয়ান, দেউলিয়া হওয়ার আগে, সম্ভাব্য বসতি স্থাপনকারীদের মঙ্গলে পৌঁছানোর পর গর্ভবতী হওয়ার চেষ্টা না করার পরামর্শ দিয়েছিল। তাই ঘূর্ণায়মান যান অপরিহার্য—এই কারণেই *দ্য মার্সিয়ান* বা *২০০১ : আ স্পেস ওডিসি*-এর মতো চলচ্চিত্রে আমরা এমন কাঠামো দেখতে পাই।

তবে ঘূর্ণন খুব দ্রুত হলে চলবে না। বেশি গতি কানের ভেতরের তরলকে প্রভাবিত করে বমি বমি ভাব ও দিশেহারা ভাব সৃষ্টি করতে পারে। এর মানে হলো মিনিটে মাত্র ১ থেকে ২ বার ঘূর্ণন (১-২ আরপিএম), যার জন্য অন্তত এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি মহাকাশযান প্রয়োজন। কাকতালীয়ভাবে, চীন ও নাসা—দুটিই এমন নকশার সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। তারা জানে, এটি বাস্তবায়ন করতে এখনো কয়েক দশক লেগে যেতে পারে—শেষ পর্যন্ত আইএসএস নির্মাণেই তো দশ বছর লেগেছিল। তবু তাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিগন্তে।

সাম্প্রতিক কিছু অগ্রগতি এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে—যেমন রকেট ইঞ্জিন ও জ্বালানি বাদ দিয়ে আবার 'পালের যুগে' ফিরে যাওয়া। চার শতাধিক বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলার লিখেছিলেন, "স্বর্গীয় বাতাসের জন্য পাল বা জাহাজ তৈরি হলে, কেউ না কেউ সেই বিশাল শূন্যতায় পাড়ি দেবে।" ২০০৪ সালে জাপান অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি (জাক্সা বা JAXA) মহাকাশে দুটি বড়ো সৌর পাল মোতায়েন করেছিল।

CamScanner

এটি ছিল এক ধরনের স্পেস এজ অরিগামি। জাক্সা একটি ছোটো রকেটে অত্যন্ত যত্নসহকারে ভাঁজ করা প্যানেলগুলো প্যাক করেছিল, যা কিউশু দ্বীপের উচিনৌরা স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। পরে রকেটটি দুটি পাল মেলে ধরে—একটি ১০ মিটার চওড়া, ক্রোভার পাতার মতো আকৃতির, আরেকটি ভাঁজ করা পাখার মতো। প্রতিটি পাল কাগজের পাতার চেয়েও দশ গুণ পাতলা। জাপানিরা প্রমাণ করেছে যে বড়ো, অতিহালকা কাঠামো ভাঁজ করে নিরাপদে মহাকাশে পাঠানো এবং অক্ষত অবস্থায় খুলে দেওয়া সম্ভব।

বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশ আরও বড়ো ও পাতলা সৌর পালের প্রোটোটাইপ নিয়ে কাজ করছে। এগুলো প্রতিফলক, তাপ-প্রতিরোধী উপাদানে তৈরি হবে, যা একদিকে সোলার প্যানেল হিসেবে কাজ করবে, অন্যদিকে মহাকাশযানকে অবিশ্বাস্য গতিতে বিশাল দূরত্বে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

আমরা জানি, সূর্যালোক বস্তু সরানোর জন্য যথেষ্ট বল প্রয়োগ করতে পারে। আলোর কণা বা ফোটন যখন পালগুলোর ওপর আঘাত করে, তখন সেগুলোকে সামনে দিকে ঠেলে দেয়। অবিরাম সূর্যালোক মানে অবিরাম প্রপালশন, আর অবিরাম প্রপালশন মানে ধ্রুব ত্বরণ—যা শেষ পর্যন্ত প্রচলিত রকেটের গতির প্রায় পাঁচ গুণ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। নাসার বিজ্ঞানীরা একে 'কচ্ছপ ও খরগোশ'-এর গল্পের সঙ্গে তুলনা করেন। একই সময়ে একটি রকেট ও একটি পাল-যান উৎক্ষেপণ করলে রকেটটি মুহূর্তেই প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যাবে। কিন্তু পাল-যানটি ধীরে ধীরে ত্বরান্বিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি কিলোমিটার গতিতে পৌঁছাতে পারে। তুলনামূলকভাবে, এ পর্যন্ত দ্রুততম রকেটচালিত যান—পার্কার সোলার প্রোব—সর্বোচ্চ প্রায় ৭ লাখ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে পৌঁছেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, একটি যান আলোর গতির মাত্র ০.০৬৪ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে, আর অন্যটির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে ১০ শতাংশ পর্যন্ত আলোর গতি অর্জনের সক্ষমতা থাকা উচিত।

যে দূরত্বগুলো এভাবে অতিক্রম করা সম্ভব, তা বোঝাতে বলা যায়—এই ধরনের গতিতে আপনি পৃথিবী থেকে চাঁদে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারবেন। অবশ্যই, এটি এখনো একটি চলমান গবেষণা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

তাত্ত্বিকভাবে, ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রযুক্তি আমাদেরকে পুরো সৌরজগতজুড়ে মানুষ পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য জটিলতা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে কেউ কেউ যুক্তিসঙ্গত একটি প্রশ্ন তুলেছেন : কেন আমরা কেবল রোবট পাঠানোই চালিয়ে যাব না? এই প্রশ্নটি তুলেছেন, অন্যদের মধ্যে, বিশিষ্ট

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডোনাল্ড গোল্ডস্মিথ এবং মার্টিন রিস। ২০২০ সালে তারা 'ডু উই রিয়েলি নিড টু সেন্ড হিউম্যানস ইনটু স্পেস?' (আমাদের কি সত্যিই মহাকাশে মানুষ পাঠানোর দরকার আছে?) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সাবটাইটেলেই তারা তাদের অবস্থান সংক্ষেপে তুলে ধরেন:

'স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের খরচ অনেক কম; তারা প্রতি বছর আরও দক্ষ ও সক্ষম হচ্ছে; আর যদি তারা ব্যর্থ হয়, কেউ প্রাণ হারায় না।'

খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি বলা হয়েছে। তারা উল্লেখ করেন, প্রথম চাঁদে অবতরণের পর থেকে শত শত প্রোব সৌরজগতজুড়ে পাঠানো হয়েছে, যেগুলো সূর্যের প্রতিটি গ্রহ পরিদর্শন করেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পরিচালিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও মেশিনের মাধ্যমেই করা সম্ভব হতো। তারা মহাকাশে নারী ও পুরুষদের বীরত্বগাথার আবেগঘন আকর্ষণ অস্বীকার করেন না এবং মানুষের জন্য বিকল্প আবাসস্থল অনুসন্ধানের বিরোধিতাও করেন না। তবে নিরাপত্তা ও বাস্তবতার দিক থেকে তারা মনে করেন, এই লক্ষ্য অর্জনে রোবটই যথেষ্ট।

তাদের যুক্তি বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে যখন বিষয়টি মানুষের মহাকাশভ্রমণে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রসঙ্গে আসে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিনিয়োগের তুলনায়। তবে আমি যুক্তি দেব, সরকার ও বেসরকারি কোম্পানি—উভয়েরই এ খাতে অর্থ ব্যয় করা উচিত এবং মানুষের মহাকাশযাত্রা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। একসময় আমাদের পৃথিবীর বাইরে একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন পড়তেই পারে এবং এটি প্রায় নিশ্চিত যে পৃথিবীতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে আমাদের আরও বেশি সম্পদের দরকার হবে। এই অভিযাত্রার পথে আমরা বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মুখোমুখি হব—এমনকি সেগুলো ঠিক কী হবে, তা আজ আমরা জানি না। তাই এখন থামার বা 'পজ' বোতাম চাপার সময় নয়।

নিশ্চয়ই, রোবট এই কাজগুলোর অনেকটাই করতে পারে—এবং করা উচিতও। কিন্তু তারা আমাদের বলতে পারে না, সেখানে থাকতে কেমন লাগে, কিংবা মানসিকভাবে 'মাদার আর্থ' বা ধরণী থেকে এত দূরে অবস্থান করার অভিজ্ঞতা কেমন। মানবিক উপাদান ছাড়া—মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা, ঝেং হে, কলম্বাস, আমুন্ডসেন, গ্যাগারিন, আর্মস্ট্রং এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের ছাড়া—মানুষকে বোঝানো কঠিন হবে যে এটিই আমাদের ভবিষ্যৎ। এখন যে কাজগুলো করা হচ্ছে, সেগুলো সেই পুরোনো প্রবাদটির মতো—আপনি একটি গাছ লাগান, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার ছায়ায় বসতে পারে।

CamScanner

আমাদের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ই বলে দেয়, আমরা অজানার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারি না। আরও দূরে যাওয়া আমাদের নিয়তি—কারণ মার্কিন নভোচারী জিন সারনান যেমন বলেছিলেন, 'কৌতূহলই মানব অস্তিত্বের সারাংশ।'

এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক সুদূর ভবিষ্যতের দিকে—সেখানে বিষয়গুলো কিছুটা অদ্ভুত হয়ে ওঠে। স্পেস সেইল বা মহাকাশ পালের মতো প্রযুক্তি আজ অবাস্তব বা আজগুবি মনে হতে পারে, কিন্তু একসময় টেলিভিশন কিংবা চাঁদে হাঁটাও ঠিক তেমনই কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়েছিল। এমন আরও অনেক ধারণা আছে, যা এখনো সায়েন্স ফিকশনের জগতে অবস্থান করছে, কিন্তু তবুও তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার দাবি রাখে।

সম্ভবত সবচেয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে সুসংহত ধারণাটি হলো স্পেস এলিভেটর বা মহাকাশ লিফট। ১৮৯৫ সালে আমাদের রুশ বন্ধু কনস্ট্যান্টিন সোলকোভস্কি—যার সঙ্গে আমরা অধ্যায় ২-এ পরিচিত হয়েছি—প্রথম এই ধারণাটি দেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন এমন একটি টাওয়ার, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে শুরু করে জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং পৃথিবীর সঙ্গে একই গতিতে ঘুরবে। তখন আপনি লিফটের মাধ্যমে মানুষ ও মালামাল সরাসরি মহাকাশে পাঠাতে পারবেন। বিষয়টি শুনতে সহজই লাগে।

একবিংশ শতাব্দীতে স্পেস এলিভেটরের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রমাণিত হয়েছে। সমস্যা হলো উপযুক্ত উপকরণ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা—এবং পর্যাপ্ত অর্থায়ন। আমরা এখনো এমন কোনো উপাদান আবিষ্কার করতে পারিনি, যা ৩৫,০০০ কিলোমিটার উঁচু একটি টাওয়ারের ওজন বহন করতে সক্ষম। তবুও, এই বাস্তবতা সেই দূরদর্শী প্রতিভার মহিমা কমিয়ে দেয় না—যিনি প্রথম বিমান উড়ার আগেই এমন ধারণা নিয়ে ভাবছিলেন।

আধুনিক ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে—পৃথিবী থেকে ওপরে দিকে টাওয়ার তৈরি করা; চাঁদ থেকে শুরু করে একটি লাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট হয়ে পৃথিবীর দিকে একটি তার ঝুলিয়ে দেওয়া; অথবা পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে লাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট থেকে চাঁদের দিকে একটি তার নির্মাণ করা। প্রথম দুটি পদ্ধতির বড়ো সুবিধা হলো, এতে ভারী রকেট ছাড়াই পে-লোড মহাকাশে তোলা সম্ভব হবে, ফলে মহাকাশযাত্রার খরচ নাটকীয়ভাবে কমে আসবে। কোন প্রতিবেদন পড়ছেন তার ওপর নির্ভর করে, প্রস্তাবিত উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে এক মিটার পুরু স্টিলের তার কিংবা জাইলন (Zylon)-এর মতো কার্বন পলিমার। ব্যক্তিগতভাবে বললে, আমি মাকড়সার সিল্ক—অথবা মানবজাতির জানা

সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তু, চুইংগাম—ব্যবহার করতেই বেশি আগ্রহী। যেভাবেই হোক, যদি এটি বাস্তবে রূপ নেয়—এবং এটি তুলনামূলকভাবে বাস্তবসম্মত ধারণাগুলোর একটি—তবে পৃথিবী, চাঁদ বা লাগ্রাঞ্জ পয়েন্টে অবস্থিত 'টেদার সাইট' বা বাঁধার স্থানগুলো ভবিষ্যতের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর জন্য প্রধান কৌশলগত লক্ষ্য হয়ে উঠবে।

আর যদি মহাকাশযানের কথাই বলি, তবে আমাদের কাছে সবসময়ই রয়েছে পুরোনো ভালো 'ওয়ার্প ফ্যাক্টর ৪.৫'—যা, আর্নেস্ট ফোক কিংবা এমন বিষয় নিয়ে উৎসাহী লোকদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য ওয়েবসাইট আপনাকে জানাবে, *স্টার ট্রেক*-এর স্টারশিপ এন্টারপ্রাইজের গড় ভ্রমণগতির মান। তবে ওয়ার্প ফ্যাক্টরের ধারণার সঙ্গে একটি বড়ো সমস্যা আছে। সেটির নাম আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, যা বলে—আলোর চেয়ে দ্রুত কোনো কিছুর গতি সম্ভব নয়। ওয়ার্প ফ্যাক্টর ১ মানে আলোর গতি, আর ওয়ার্প ফ্যাক্টর ৭ মানে আলোর গতির ৩৪৩ গুণ। এই ধারণা শুনলে আইনস্টাইন হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতেন—যদিও সেটি নিঃসন্দেহে খুব দ্রুত।

সৌভাগ্যক্রমে, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনের চিন্তাধারাকে চূড়ান্ত বাধা হিসেবে মানতে নারাজ। তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী, এন্টারপ্রাইজ আসলে আলোর চেয়ে দ্রুত চলে না। বরং এটি স্থান-কালের একটি সংকুচিত ও বাঁকানো 'ওয়ার্প বুদবুদ'-এর ভেতরে অবস্থান করে, আর সেই বুদবুদটি আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। যখন বুদবুদটি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছায়, তখন আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন—এবং ক্লিংগনদের চমকে দেন।

১০০-মিটার স্প্রিন্টারদের জন্য এই ধারণাটি দারুণ কার্যকর হতো। আপনার সামনে থাকা ১০০-মিটার ট্র্যাকটিকে যদি ১০ মিটারে সংকুচিত করা যায়, তবে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেক আগেই ফিনিশিং লাইনে পৌঁছে যাবেন।

তাহলে চলো, যাত্রা শুরু করা যাক। যদিও দ্রুতই বোঝা যায়—বিষয়টি আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে একটি বড়ো সমস্যা হলো, এসব ধারণায় বিপুল পরিমাণ অ্যান্টি-ম্যাটার বা প্রতিপদার্থের প্রয়োজন হয়। অ্যান্টি-ম্যাটার আসলে সাধারণ পদার্থেরই প্রতিরূপ, শুধু এর বৈদ্যুতিক চার্জ বিপরীত। যেমন, ইলেকট্রন হলো সাধারণ পদার্থের কণা এবং এর চার্জ ঋণাত্মক। এর প্রতিপক্ষ হলো পজিট্রন, যার চার্জ ধনাত্মক।

অ্যান্টি-ম্যাটার যখন সাধারণ পদার্থের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন ঘটে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ। এতে বিশুদ্ধ বিকিরণ নির্গত হয়, যা বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে আলোর গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রকৃতিতে অ্যান্টি-ম্যাটারের প্রাচুর্য

নেই। তবে সৌভাগ্যক্রমে, আমরা এটি কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে পারি। উচ্চ শক্তির পার্টিকেল কোলাইডার—যেমন সিইআরএন (CERN)-এর 'অ্যাটম স্মাশার'—অ্যান্টি-ম্যাটার উৎপাদন করতে সক্ষম। কিন্তু সমস্যাটা হলো উৎপাদনের পরিমাণ। সিইআরএন বছরে মাত্র এক থেকে দুই পিকোগ্রাম অ্যান্টি-ম্যাটার তৈরি করতে পারে। এক পিকোগ্রাম মানে এক গ্রামের এক ট্রিলিয়ন ভাগ, অর্থাৎ এক লাখ কোটি ভাগের এক ভাগ। এই পরিমাণ শক্তি দিয়ে একটি ১০০-ওয়াটের বাল্ব মাত্র তিন সেকেন্ড জ্বালানো যায়। নক্ষত্রমণ্ডলীয় ভ্রমণের জন্য সেখানে টনের পর টন প্রয়োজন, সেখানে বৈজ্ঞানিক ভাষায় এটিকে বলা যায়—'নগণ্য'।

তবে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য হয়তো মাত্র এক গ্রামের এক মিলিয়ন ভাগ অ্যান্টি-ম্যাটারই যথেষ্ট হতে পারে। নাসার ধারণা, এই পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের হয়তো আর কয়েক দশক সময় লাগবে।

অবশ্যই, সবসময়ই থাকে ওয়ার্মহোল বা কীটগহ্বরের ধারণা। তাত্ত্বিকভাবে, এর মাধ্যমে বিশাল দূরত্ব প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে অতিক্রম করা সম্ভব—রওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পৌঁছে যাওয়া। এই তত্ত্বটি বোঝাতে একটি জনপ্রিয় উপমা আছে। ধরুন, দুজন মানুষ একটি ভাঁজ করা চাদরের দুই প্রান্ত ধরে রেখেছে, মাঝখানে সামান্য ফাঁক রেখে। এখন চাদরের ওপরের স্তরে একটি বোলিং বল রাখলে সেটি মাঝখানের দিকে গড়িয়ে গিয়ে চাদরটিকে নিচের দিকে বাঁকিয়ে দেবে। এবার কল্পনা করুন, চাদরের নিচের স্তরের নিচে আরেকটি সমান বল রাখা হয়েছে, যা ওই দিকটিকে ওপরে দিকে বাঁকাচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে, যদি দুই দিক থেকেই যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে এই দুটি আলাদা স্থানকে যুক্ত করে একটি পথ তৈরি হতে পারে—যা হয়তো আলোকবর্ষ দূরে থাকা দুটি বিন্দুর মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত যাত্রা সম্ভব করে তুলবে।

এটা কি যথেষ্ট অদ্ভুত মনে হচ্ছে? তাহলে শেষ বিকল্প—টেলিপোর্টেশন। ১৯৯৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ক্যালটেক)-এর কয়েকজন অত্যন্ত মেধাবী বিজ্ঞানী একটি ফোটনের—আলো বহনকারী কণার—গঠন স্ক্যান করেন এবং সেই তথ্য এক মিটার দীর্ঘ কোক্সিয়াল কেবলের মাধ্যমে পাঠান। কেবলের অপর প্রান্তে ফোটনটির একটি নিখুঁত প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। একই সঙ্গে তারা প্রমাণ করেন যে এই প্রক্রিয়ায় আসল ফোটনটি ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ স্ক্যান করার সময় মূল ফোটনটিকে এতটাই ব্যাহত করা হয় যে সেটি আর অস্তিত্বে থাকে না—শুধু কপিটিই টিকে থাকে।

এর মানে দাঁড়ায়, যদি কোনো দিন আমরা মানুষকে টেলিপোর্ট করতে সক্ষম হই, তবে প্রতিবারই আমরা আসল মানুষটিকে ধ্বংস করব এবং অন্য জায়গায় তার একটি প্রতিলিপি তৈরি করব। বারবার। প্রতিবার।

কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ পদার্থবিজ্ঞানীরা ক্যালটেকের এই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে আরও কাজ এগিয়ে নিয়েছেন। ২০১২ সালে চীনের গবেষকরা ৯৭ কিলোমিটার দূরে একটি ফোটন টেলিপোর্ট করতে সক্ষম হন। কিন্তু একটি মানবদেহে থাকা অকল্পনীয় সংখ্যক—অক্টোকিলিয়ন পরমাণু—হুবহু কপি করা এবং সেই তথ্য অন্য গ্রহে পাঠানো, আপাতত কল্পনার অনেক বাইরে। গবেষণা বলছে, এমনকি যদি আমরা কাউকে টেলিপোর্ট করতে পারিও, তবুও সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যুক্তরাজ্যের পুরো বিদ্যুৎ সরবরাহ টানা এক মিলিয়ন বছর ধরে লাগবে। বিদ্যুতের বর্তমান দামের কথা ভাবলে—কে-ই বা শুরু করবে?

তবুও, হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্বে কোয়ান্টাম তথ্য প্যাকেট পাঠানোর কাজ ইতোমধ্যেই চলছে। চীন মহাকাশে তার স্যাটেলাইটে এই ধরনের তথ্য বিম করতে সফল হয়েছে। এর সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার হলো—একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা হ্যাক করা প্রায় অসম্ভব। আর যদি কেউ হ্যাক করার চেষ্টা করেও, প্রেরণকারী তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে। কারণ কোয়ান্টাম জগতে কোনো কিছুকে 'পর্যবেক্ষণ' করলেই সেটি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এসব উদাহরণ দেখায়, যাকে একসময় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, তা কীভাবে ধীরে ধীরে বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। অন্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা নিয়েও ভাবা যাক। লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য রূপের প্রাণের অস্তিত্ব কি থাকতে পারে না? আমাদের সৌরজগতের বাইরের অসংখ্য গ্রহ—এক্সোপ্ল্যানেট—ইতোমধ্যেই প্রাণ ধারণের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী নীল ডিগ্রাস টাইসন আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে দারুণ একটি তুলনা দিয়েছেন : "মহাবিশ্বে অন্য কোনো প্রাণ নেই—এমন দাবি করা অনেকটা মহাসাগর থেকে এক কাপ পানি তুলে, সেই কাপের দিকে তাকিয়ে বলা যে সাগরে কোনো তিমি নেই।"

আমরা চাইলে আমাদের দিন কাটাতে পারি অজানা জগৎ, বিস্ময় আর কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভাবনা নিয়ে কল্পনা করে। কিন্তু সব স্বপ্ন, ধারণা আর তত্ত্বের মাঝখানে একটি কঠিন বাস্তবতা আমাদের আগে মোকাবিলা করতেই হবে—যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা ইতোমধ্যেই প্রত্যক্ষ করছি। অস্ত্র প্রতিযোগিতা, অঞ্চল ও সম্পদের জন্য লড়াই, কার্যকর আইনের অভাব এবং এই নতুন যুগ ও নতুন

ডোমেইনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আরও বহু নেতিবাচক দিক—এসবই আজ আমাদের সামনে উপস্থিত।

বিশাল বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান মরগান স্ট্যানলির মহাকাশ বিষয়ক দল দেখিয়েছে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কীভাবে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তারা ১৮৫৪ সালে নিরাপত্তা লিফটের প্রথম প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করে। তখন খুব কম মানুষই অনুমান করতে পেরেছিল যে এই আবিষ্কার শহরের নকশা ও স্থাপত্যে কী বিপুল প্রভাব ফেলবে। কিন্তু মাত্র দুই দশকের মধ্যেই নিউ ইয়র্কের প্রায় সব বহুতল ভবন একটি কেন্দ্রীয় লিফট শ্যাফটকে ঘিরে নির্মিত হতে শুরু করে, আর স্থাপত্যের উচ্চতা দ্রুত বাড়তে থাকে। মরগান স্ট্যানলির মতে, পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেটের বিকাশ মহাকাশ শিল্পে ঠিক এমনই একটি টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠতে পারে।

মহাকাশে প্রবেশের খরচ কমে যাওয়া—বিশেষ করে স্পেসএক্সের চালু করা পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেটের কারণে—বিনিয়োগকে আরও ত্বরান্বিত করবে। মরগান স্ট্যানলির পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই শিল্পটি ২০৪০ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি রাজস্ব সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে ২০২২ সালে এর আকার ছিল আনুমানিক ৪৫০ বিলিয়ন ডলার।

এই অগ্রগতি মানবতাকে পৃথিবীতে নেট-জিরো বা শূন্য কার্বন নিঃসরণ লক্ষ্যে পৌঁছাতেও সহায়তা করতে পারে। প্রযুক্তিগতভাবে মহাকাশে বিশাল সোলার প্যানেলের 'ক্ষেত্র' স্থাপন করা ইতোমধ্যেই সম্ভব। এসব প্যানেল সূর্য থেকে বর্তমান বৈশ্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারে এবং তা পৃথিবীতে বিম করে পাঠাতে সক্ষম। মহাকাশে কারখানা স্থাপনও বাস্তবসম্ভব হয়ে উঠছে এবং যেমন আগে আলোচনা করা হয়েছে, চাঁদ ও গ্রহাণু থেকে বিরল মৃত্তিকা উপাদানসহ নানা মূল্যবান সম্পদ আহরণ করাও ধীরে ধীরে আমাদের নাগালের মধ্যে চলে আসছে।

তবে নথিভুক্ত মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা আশা করা কঠিন যে আমরা হঠাৎ করে আমাদের সামষ্টিক মানবতাকে সর্বাগ্রে রেখে মহাকাশের সম্পদ আহরণে একসঙ্গে কাজ করব এবং সেগুলো সমানভাবে বণ্টন করব। বরং সম্ভবত জাতিরাষ্ট্র ও বিভিন্ন ব্লক একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে। তবুও, এই প্রতিযোগিতার মধ্যেও এমন সুবিধা তৈরি হবে যা শেষ পর্যন্ত সবার জন্যই উপকারী হবে। সম্ভাবনা আছে যে আমরা আমাদের বর্তমান সার্বভৌমত্বের ধারণাগুলো মহাকাশেও প্রয়োগ করব—যেখানে জাতিরাষ্ট্রগুলো পারস্পরিকভাবে স্বীকৃত অঞ্চলের

CamScanner

ওপর কর্তৃত্ব করবে। কিন্তু সেগুলো যেন মানুষ হিসেবে আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক গতি থামিয়ে না দেয়।

প্রায় অনুরূপ কথাটি বলে গেছেন স্টিফেন হকিং। তাঁর ভাষায়, "ছড়িয়ে পড়াই হয়তো একমাত্র উপায় যা আমাদের নিজেদের হাত থেকেই আমাদের রক্ষা করতে পারে। আমি নিশ্চিত, মানুষকে একদিন পৃথিবী ছাড়তেই হবে।"

যাত্রাটা উপভোগ করুন।

CamScanner

চাঁদের চারদিকে স্পাই স্যাটেলাইট। বিলিয়ন ডলারের মহাকা
সম্পদ। আমাদের জীবদ্দশাতেই মঙ্গলে মানুষ। এটা
ফিকশন নয়-এটাই মহাকাশ রাজনীতি।

যোগাযোগ, সামরিক কৌশল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
এখন ইতিমধ্যেই আমাদের জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন
এখন এটি মানুষের নতুন অনুসন্ধান, ব্যবহার, এবং সম্ভাব্য বিজ
মাঠে পরিণত হচ্ছে। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া এই
নেতৃত্ব দিচ্ছে; আমরা মহাকাশের অসীমে পাড়ি জমাচ্ছি, আর সা
করে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

আপনি যদি কখনও ভেবে থাকেন মানুষ কেন চাঁদে ফিরে যাচ্ছে,
মহাকাশ অভিযান থেকে কোন দেশ গুলো সবচেয়ে বেশি লাভবান
হবে কিংবা উপগ্রহে লেজার বসালে তা মহাকাশ যুদ্ধের দিকে
গড়াবে কি নাড়তবে সব উত্তর এই বইতেই পাবেন। মহাকাশ
দৌড়ের এক নতুন যুগে প্রবেশের এই সময়ে, রোমাঞ্চকর এই বইটি
আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কীভাবে মহাকাশের
পৃথিবীর বৈশ্বিক রাজনীতির ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।

'এটি এক মহাজাগতিক আবিষ্কারের যাত্রা।'
– মেইল অন সানডে 'অসাধারণ গতিময় এবং
স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ... গভীরভাবে ভাবিয়ে
তোলার মতো একটি বই।' –বিবিসি স্কাই
অ্যাট নাইট



আমির বুক হাউজ
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৬৭৪০৬৮৫৮৪, ০১৭৭০৪০৩০৪৭
Email: mdamirh296@gmail.com
9 789849 457718